স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৪৭–২০১১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে
'পিএইচ.ডি' উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

ইয়াসমিন রেজা

রেজিস্ট্রেশন নং : AOOHI0401817 (2017-2018)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ দেবজিৎ দত্ত

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪

<u>**Certified that the Thesis entitled**</u>

স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০১১) Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of DR. DEBAJIT DUTTA, ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF HISTORY, JADAVPUR UNIVERSITY and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Debajit Dutta
Countersigned by the Supervisor:
Dated: 6/9/2024
Assistant Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Candidate: Yasmin Reza
Dated: 6/9/2024

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই জন্মস্থানের প্রতি বিশেষ সংবেদনশীলতা কাজ করে, আমার ক্ষেত্রেও তার ভিন্নতা হয়নি। শৈশব থেকেই মালদা জেলা নিবাসী হওয়ায় মালদহের অতীত, ঐতিহ্য, গৌরব, সংস্কৃতি, জনমানস সম্পর্কে সর্বদা এক অদম্য কৌতুহল কাজ করেছে আমার মনের মধ্যে। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে বেড়ে ওঠায় মুসলিমদের জীবনযাপন, শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খেত, আশেপাশের মুসলিম নারীর আর্থসামাজিক দূরাবস্থা, শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা ব্যথিত করে এবং এর কারণ অনুসন্ধান করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। অল্প বয়সে বিবাহ ও পরে তালাক এবং তার সাথে ইসলামিক বিধি-বিধান যেন শুধু মেয়েদের ওপরেই চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা চলতে থাকে, নারীরা এইভাবে যুগের পর যুগ ধরে লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত হয়ে দিনযাপন করে চলেছে। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সমাজ কোরআন ও হাদিসকে মেনে চললেও, কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত নারীর অধিকার গুলিকে মান্যতা দিতে চায় না, বরং বিভিন্ন ফতোয়া জারি করে নারীদের আরও বেশি কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নারীর উন্নতির জন্য ঘোষিত হলেও বাস্তবে কতটা কার্যকরী হচ্ছে ও তার দ্বারা নারীর কতটা উপকৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান কিরূপ ছিল এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কালে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখার জন্যই বর্তমান গবেষণার অবতারণা। মালদহের প্রায় অর্ধেক জনগণ মুসলমান হওয়ায় এবং আমি নিজে মালদা নিবাসী হওয়ায় গবেষণার সুবিধার্থে মালদা জেলাকে বেছে নিয়েছি।

আমার এই আগ্রহের কথা সর্বপ্রথম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক দেবজিৎ দত্ত মহাশয়কে জানায় এবং তিনি বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধান দিয়ে আমাকে সাহায্য ও সাহস জুগিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে যাওয়ার জন্য। তিনি সবসময় পথপ্রদর্শক ও দিকনির্দেশক হয়ে পাশে থেকে গবেষণার কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন। আমার জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি, সুবিধা ও অসুবিধা গুলি উপলব্ধি করে সর্বদাই সাহস জুগিয়েছেন। তিনি সাহায্য না করলে আমার গবেষণা কাজটি অসমাপ্তই থেকে যেত। এজন্য তাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানায়। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার উপদেষ্টা কমিটির সদস্যাবৃন্দ ডঃ মেরুনা মুর্মু মহাশয়া ও ডঃ চন্দ্রানী ব্যানার্জি মুখার্জি মহাশয়াকে, যারা বিভিন্ন সময় নিজেদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন আমার গবেষণাকার্যটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে। এছাড়া যাদবপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যবিকাদের আমার সশ্রদ্ধেয় প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার উপাদান ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি। এ প্রসঙ্গে আমি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, যাদবপুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, মালদা জেলা গ্রন্থাগার, মানিকচক ব্লক গ্রন্থাগার রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তর, বিকাশ ভবন ইত্যাদির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, যারা বিভিন্ন সময় আমাকে তথ্যানুসন্ধান ও তত্ত্ব সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন।

এছাড়া আমার গবেষণাকার্যটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যিনি সর্বদা প্রেরণা জুগিয়েছেন, তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা, যিনি সর্বদা পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছেন, আমার সন্তানকে সামলেছেন যাতে আমার গবেষণা কাজে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। এছাড়া আমার পরিবারের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, তাদের সাহায্য ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না।

ইয়াসমিন রেজা
গবেষিকা
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা

সারণি

পৃষ্ঠা নং

১.	ভারতের সম্প্রদায়ভেদে জনসংখ্যার পরিসংখ্যায়ন (১৯৫১-২০১১)	৫৪
২.	অবিভক্ত বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যার পরিসংখ্যায়ন (১৮৭২-২০১১)	৫৫
৩.	পশ্চিমবঙ্গের লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার	৬২
৪.	পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভেদে লিঙ্গভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার	৬২
৫.	পশ্চিমবঙ্গের ধর্মভিত্তিক লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার ২০০১	৬৩
৬.	পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার ২০০১	৬৪
৭.	ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের নারীর কর্মে যোগদানের হার	৬৫
৮.	মালদা জেলার ভূতাত্ত্বিক বিন্যাস ২০০১	৬৯
৯.	সম্প্রদায়ভেদে মালদা জেলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ১৯৫১ – ২০১১	৭০
১০.	ব্লক অনুযায়ী মালদা জেলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যায়ন ২০০১	৭২
১১.	ব্লক অনুযায়ী মালদা জেলার মুসলিম জনগণের পরিসংখ্যান	৭৫
১২.	শিক্ষার হারের অগ্রগতি ১৯৫১ – ২০১১	৮১
১৩.	মালদা জেলার ধর্ম ও লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার ২০০১	৮৪
১৪.	ব্লক অনুযায়ী লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার	৮৬
১৫.	মালদা জেলার ব্লক অনুযায়ী মুসলিমদের কর্মে যোগদানের হার	৮৮
১৬.	মালদা জেলার মুসলিম নারীর বিভিন্ন ধরনের কর্মে যোগদানের হার	৯১
১৭.	স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি	১১৫
১৮.	ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষার হার ২০১১	১১৯
১৯.	পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যা (১৯৫১-২০১১)	১৩১
২০.	পশ্চিমবঙ্গের মোট সাক্ষরতার হার	১৩২
২১.	পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম জনগণের নারী পুরুষের মধ্যেও শিক্ষাগত বৈষম্য	১৩৩
২২.	২০০১ ও ২০১১ সালের জেলাভিত্তিক নারী-পুরুষের শিক্ষাগত হারের পরিসংখ্যায়ন	১৩৪
২৩.	১৯৪৭-২০১৬ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩৯
২৪.	পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক মাদ্রাসার সংখ্যা	১৪১
২৫.	জেলাভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র এম এস কে পরিসংখ্যান	১৪২
২৬.	মালদা জেলার শিক্ষার হারের অগ্রগতি	১৫৩
২৭.	ব্লক অনুযায়ী লিঙ্গ ভেদে মালদা জেলার শিক্ষার হার ২০০৯	১৫৫
২৮.	২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মালদা জেলার লিঙ্গভেদে শিক্ষার হার	১৫৭
২৯.	মালদা জেলার সামীক্ষা ক্ষেত্রগুলির মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান	১৬০

৩০. লোকসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যার নিরিখে নারী প্রতিনিধির পরিসংখ্যান (১৯৫২-২০১৪) ২০২
৩১. লোকসভা নির্বাচনে নারী পুরুষ ভোটদাতার পরিসংখ্যায়ন ১৯৫২-২০১৪ ২০৩
৩২. লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মহিলা প্রতিনিধিদের পরিসংখ্যায়ন (১৯৫২-২০১৪) ২০৫
৩৩. পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধির পরিসংখ্যায়ন (১৯৭১-২০১১) ২০৬
৩৪. পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় মহিলা মন্ত্রীর পরিসংখ্যান (১৯৫২- ২০১১) ২০৭
৩৫. পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধির পরিসংখ্যায়ন ২০৮
৩৬. বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম মহিলা প্রতিনিধির পরিসংখ্যায়ন (১৯৫২-২০১৬) ২২৩
৩৭. লোকসভা নির্বাচনে মালদা জেলার মুসলিম মহিলা প্রতিনিধির পরিসংখ্যায়ন (১৯৫২-২০১৯) ২২৫
৩৮. সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিত মুসলিম মহিলা প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অবস্থান ২২৯
৩৯. মালদা জেলার মুসলিম নারীর বৈবাহিক অবস্থান ২৫৮
৪০. মালদা জেলার মুসলিম নারীর বিবাহ নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত তথ্য ২৫৯
৪১. মালদা জেলায় মুসলিম নারীর যৌতুক প্রদান ২৬০
৪২. মালদা জেলার মুসলিম নারীর মেহের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির পরিসংখ্যায়ন ২৬৩
৪৩. মালদা জেলার মুসলিম নারীর মেহের প্রাপ্তির ধরন ২৬৪
৪৪. মুসলিম পার্সোনাল ল’ ও শরিয়তী অধিকার সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীর সচেতনতাবোধ ২৮৬
৪৫. মালদা জেলার মুসলিম নারীর ইসলামিক আইন থেকে সুবিধা প্রাপ্তি ২৮৭
৪৬. মালদা জেলার মুসলিম নারী ইসলামিক আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চনার স্বরূপ ২৮৭
৪৭. ইসলামিক আইন সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ২৮৮
৪৮. শরিয়তী আইনের বৈষম্যমূলক আচরণের স্বরূপ ২৮৯
৪৯. মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর বাস্তবে কি পরিবর্তন প্রয়োজন ? ২৯০
৫০. মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর পরিবর্তনের সপক্ষে মতামত ২৯১

ব্লক অনুযায়ী মালদা জেলার মানচিত্র

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকাঃ	**১-৩৪**
প্রথম অধ্যায়ঃ	
মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান	**৩৫-৯৮**
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	
মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান	**৯৯-১৭৬**
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	
মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অবস্থান	**১৭৭-২৩৪**
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	
ইসলামিক অনুশাসনের প্রেক্ষিতে মালদা জেলার মুসলিম নারী	**২৩৯-২৯৯**
উপসংহার	**৩০০-৩১২**
পরিশিষ্ট ১	**৩১৩-৩১৪**
পরিশিষ্ট ২	**৩১৫-৩১৭**
গ্রন্থপঞ্জী	**৩১৮-৩৪০**

ভূমিকা

ভূমিকা

নারীবাদ বা নারী সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা একটি গবেষণাত্মক বিষয়। এই বিষয়ে আলোচনা করার মৌলিক উদ্দেশ্য হল নারীদের অধিকার ও সম্মান বিষয়ে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা। নারীবাদের উদ্ভবের একটি গভীর ইতিহাস রয়েছে, যা নারীদের সম্পর্কে নতুন ধারণা ও মানবিক সম্পর্ক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীবাদের উদ্ভবের ইতিহাস বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে প্রকাশ পায়। নারীবাদের উদ্ভব নারীদের অধিকার ও সম্মান এবং সামাজিক অবস্থার স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীবাদের উদ্ভব একটি প্রগতিশীল ধারণা এই উদ্ভবের প্রাথমিক ধারণা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

নারীবাদের প্রথম ঢেউয়ের (First Wave Feminism) সময়, যা ১৮৪৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত চলেছিল, নারীরা মূলত ভোটাধিকার এবং আইনি সমতার জন্য সংগ্রাম করেছিল। এই সময়কালে বিভিন্ন দেশে নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়। এরপর, ১৯৬০-এর দশকে শুরু হয় নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ (Second Wave Feminism), যা আরও বিস্তৃত ছিল। এই আন্দোলনে নারীরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সমতার জন্য লড়াই করেছিল। নারীবাদের তৃতীয় ঢেউ (Third Wave Feminism) শুরু হয় ১৯৯০-এর দশকে, যেখানে লিঙ্গ পরিচয়, যৌনতা এবং জাতিগত বৈষম্যের মতো বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্তমান দিনে নারীবাদ তথা নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখিও যথেষ্ট হচ্ছে। কিন্তু 'নারীবাদ' বলতে ঠিক কী বোঝায় এ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, নারীবাদ হল এমন একটি শক্তি যা নারীজাতিকে একটি আত্মসচেতন সামাজিক শ্রেণিতে

পরিণত করেছে। বাসবী চক্রবর্তীর মতে, "নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীমুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একই সঙ্গে তার প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে"। অপর এক নারীবাদী লেখিকা রাজশ্রী বসুর মতে, নারীবাদ হল তত্ত্ব ও বাস্তবের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্নতর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে এবং 'নারী' হওয়ার কারণেই একজন মহিলা সমাজে যে অসাম্যের শিকার হয়, তার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। শ্রীমতী বসু আরও বলেন, নারীবাদীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা, মূল্যবোধ, অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেন যাতে নারীর লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটে। সমাজকে বোঝা, সমাজে নারী পুরুষের অবস্থাগত বৈষম্যকে বোঝা, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার অসম বণ্টন ও বিন্যাসকে অনুধাবন করা এবং কীভাবে এর সমাধানসূত্র খুঁজে বার করা যায়-এই সমস্ত কিছু নিয়েই নারীবাদ চর্চা করে।

এই নারীবাদ নারীকে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাতে চায় যেখানে সে নিজের সত্তাকে খুঁজে নিতে পারে। নারীবাদ একাধারে রাজনৈতিক দর্শন এবং সামাজিক আন্দোলন, যা লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চায়। এককথায় বলা যায়, নারীবাদ হল এমন একটি প্রত্যয় যেখানে নর অথবা নারী যে-কোনো মানুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা বিচারে লিঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই।

নারী আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সাবেকি রাজনৈতিক তত্ত্ব বা আলোচনায় লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। সরকারিভাবে নারী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ, বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু নারীবাদী প্রবন্ধ ও রচনা পাওয়া গেলেও ফরাসি বিপ্লবকেই (১৭৮৯) নারীবাদী আন্দোলনের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও

স্বাধীনতার বাণী সেখানকার মহিলাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নিজেদের পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টিকে তাঁরা আন্দোলনের সামগ্রিক 'স্বাধীনতা'র স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মহিলারা শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা পিতৃতন্ত্রের অবসান ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরব হন।

ফরাসি বিপ্লব সফল হল, কিন্তু মহিলাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। ১৭৯১ সালের নতুন সংবিধানে পুরুষদের সীমিত ভোটাধিকার স্বীকার করা হল, কিন্তু মহিলাদের বঞ্চিত করা হল। নবগঠিত ফরাসি সংসদে ‘পুরুষদের অধিকারের ঘোষণাপত্র’ (Declaration of the Rights of Man) গৃহীত হল। এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফরাসি মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকার কড়া হাতে এই আন্দোলনকে দমন করে। প্রসঙ্গত, মাদাম গুৎজ নামক এক মহিলা বিপ্লবী দাবি করেন, নারীদের যদি ফাঁসিতে যাওয়ার অধিকার থাকে, তাহলে তাদের সংসদে যাওয়ার অধিকার থাকবে না কেন? এই প্রতিবাদের পরিণতিতে মাদামকে সংসদের পরিবর্তে ফাঁসি কাঠেই যেতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো, মন্তেস্কু প্রমুখ এই সময়ের বিখ্যাত দার্শনিকদের দর্শন ও রচনায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। নারীকে তাঁরা ভাবাবেগের আধার হিসেবে, মাতা, কন্যা, স্ত্রী-র সার্থক ভূমিকা পালনকারী হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু তারাও যে পুরুষের মতো যুক্তিবাদী চিন্তা করতে সক্ষম, তাদেরও যে যুক্তিবাদী মনন আছে, একথা এইসব দার্শনিক মনে করতেন না। এই প্রেক্ষাপটে মেরি উলস্টোনক্র্যাফট (Mary Wollstonecraft) নামক এক ফরাসি মহিলা Vindication of the Rights of Women নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, সমসাময়িক তথা উত্তরকালের নারীবাদীদের তা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়েই উদারপন্থী নারীবাদের সূত্রপাত ঘটে।

১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহাগেন-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৭টি দেশের একশত নারী প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং বিশ্ববরেণ্য নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদ্যাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নারী সংগঠনগুলি এই দাবিকে সমর্থন জানায়। অবশেষে ১৯১৪ সালের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্বত্র শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটতে থাকে। বিশের দশকে নারীদের আইনগত অধিকার দাবি করে অনেক নারীবাদী লেখিকার লেখনী গর্জে উঠেছিল। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভার্জিনিয়া উলফ, সুজান সায়লেন্টস প্রমুখ।

প্রথম পর্বের নারীবাদী আন্দোলনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বর্তমান দিনের কোনো কোনো নারীবাদী ওই পর্বের আন্দোলনগুলির কিছু সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের মতে ওইসব আন্দোলনের প্রত্যেকটি ছিল ইস্যু-ভিত্তিক এবং সীমিত প্রকৃতির। কখনও নারী-পুরুষের সম-মজুরির দাবিতে, কখনও নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে, কখনও নিরাপদে গর্ভপাতের দাবিতে, কখনও বা বিবাহ-বিচ্ছেদকে আইনসঙ্গত করার দাবিতে এইসব আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানের নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, একটি বা কয়েকটি বিশেষ দাবি মিটে গেলেই নারী নির্যাতন বা লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটবে না। এরজন্য দরকার প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, নারীর প্রকৃতি সম্পর্কিত সাবেকি ধ্যানধারণার পরিবর্তন, প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। এই ধরনের মৌলিক পরিবর্তনকে লক্ষ্য রেখে বিশ শতকের ৬০-এর দশক থেকে নারী আন্দোলন এক নতুন মোড় নেয়; শুরু হয় নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব।

নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেটি ফ্রায়ডান-এর Feminist Mystique নামক গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই পর্বে নারী আন্দোলন জটিলতর রূপ ধারণ করে। আগের আন্দোলনগুলি যেখানে মূলত সংস্কারপন্থী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক

ছিল, দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলনগুলি সেখানে যৌথ ও বৈপ্লবিক প্রকৃতির ছিল। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে শীলা রোবথাম বলেন, এই পর্বের নারী আন্দোলনে পুরনো নারীবাদের সমানাধিকারের দাবি তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও অনেক কিছু। এই পর্বের আন্দোলন হল পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি এবং এই পর্বের আন্দোলনে নারী সচেতনতা ছিল অনেক বেশি তীব্র ও বৈপ্লবিক।

১৯৯০ এর দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব বা ঢেউ (Third wave of Feminism) শুরু হয়। নারীবাদের দ্বিতীয় পর্ব নারীর অধিকার ও লিঙ্গজনিত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। তাই নারীবাদের তৃতীয় পর্ব বা ঢেউ গড়ে ওঠে। এই তৃতীয় পর্বকে অনেক সময় উত্তর-নারীবাদ (Post feminism) বলেও চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বের নারীবাদ যে সমস্ত রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয় সেগুলি হল : নাওমি উলফ-এর “The Beauty Myth: Images of Beauty are Used Against Women” (1991), সুসান ফালুডি-র “Backlash: The Undeclared War Against American Women” (1991) ইত্যাদি। তৃতীয় পর্যায়ের নারীবাদ উত্তর-কাঠামোবাদী আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষুদ্র রাজনীতির (Micro- politics) ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই পর্যায়ের নারীবাদে যৌনতা, মনস্তাত্ত্বিক শোষণ, কর্মক্ষেত্রে যৌন উৎপীড়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তৃতীয় পর্বের নারীবাদের সূত্রপাত ঘটে ১৯৯১ সালে রেবেকা ওয়াকার কর্তৃক প্রণীত Becoming the Third Wave নামক প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে। এই পর্যায়ের নারীবাদ যে সমস্ত তাত্ত্বিকের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হলেন শেলা স্যান্ডোভাল, বেল হুকস, গ্লোরিয়া আনজালডুয়া, চেরি মোরাগা ইত্যাদি। এই পর্বের নারীবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল অল্পবয়সী মহিলাদের অংশগ্রহণ। সাম্প্রতিককালে নারীবাদের একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে ধর্মসম্পর্কিত নারীবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ধরনের নারীবাদে ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় প্রথা, রীতিনীতি বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং লিঙ্গজনিত সাম্যের প্রেক্ষিতে বিষয়গুলিকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পামেলা অ্যান্ডারসন-এর A Feminist Philosophy of Religion, The Rationality and Myths of Religious Belief (1998) এবং গ্রেস জান্টজেন-এর Becoming Divine:

Towards a Feminist Philosophy of Religion (1999) বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এইসব নারীবাদীর বক্তব্য হল, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আসলে পুরুষের কণ্ঠস্বর যা নারীকে বন্ধ ও বন্দি রাখতে সাহায্য করে। তাঁরা দেখিয়েছেন, বিশ্বের সব ধর্মের মধ্যে কমবেশি পুরুষকেন্দ্রিকতা ও পিতৃতান্ত্রিকতার উপাদান নিহিত রয়েছে।

নারীবাদ একটি বহুমাত্রিক আন্দোলন, এবং এর বিভিন্ন ধারা রয়েছে। প্রতিটি ধারা নারীর অধিকার ও সমতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশল নিয়ে কাজ করে। নিচে নারীবাদের প্রধান কয়েকটি ধারা তুলে ধরা হল:

উদার নারীবাদ (Liberal Feminism):

উদার নারীবাদী ধারা আইনি এবং রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে নারীর সমান অধিকার এবং সুযোগ নিশ্চিত করতে চায়। এই ধারার নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা আনার জন্য বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। উদার নারীবাদীরা ভোটাধিকার, শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগের জন্য কাজ করে।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism):

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা মনে করেন যে সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোই নারীর উপর অত্যাচার এবং শোষণের মূল কারণ। তারা সমাজের ভিত্তিমূলক পরিবর্তনের মাধ্যমে পুরুষতন্ত্রকে ধ্বংস করার কথা বলে। এই ধারা যৌনতা, লিঙ্গ বৈষম্য এবং নারীর দেহের উপর নিয়ন্ত্রণের মত বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়।

মার্কসবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Marxist and Socialist Feminism):

এই ধারা মূলত শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে নারীর মুক্তির জন্য কাজ করে। মার্কসবাদী নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে পুঁজিবাদই নারীর শোষণ এবং দমন করার প্রধান কারণ।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা অর্থনৈতিক সাম্যের মাধ্যমে নারীর সমান অধিকার এবং মুক্তি অর্জনের জন্য কাজ করে।

কালো নারীবাদ (Black Feminism):

কালো নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে নারীবাদের মূলধারার আন্দোলনগুলি সাধারণত শ্বেতাঙ্গ নারীদের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয় এবং কালো নারীদের সমস্যা এবং অভিজ্ঞতা অবহেলিত হয়। এই ধারা বর্ণ, লিঙ্গ এবং শ্রেণীর ভিত্তিতে নারীর অভিজ্ঞতার মধ্যেকার সংযোগ নিয়ে কাজ করে।

ইকোফেমিনিজম (Ecofeminism):

ইকোফেমিনিজম নারীবাদ হল পরিবেশবাদী মতাদর্শের সংমিশ্রণ। ইকোফেমিনিস্টরা মনে করেন যে নারীর উপর যে শোষণ এবং অত্যাচার করা হয়, তা পরিবেশের শোষণ এবং ধ্বংসের সাথে সম্পর্কিত। তারা বিশ্বাস করেন যে পিতৃতন্ত্র এবং পরিবেশ ধ্বংসের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

কুইয়ার নারীবাদ (Queer Feminism):

কুইয়ার নারীবাদীরা লিঙ্গ এবং যৌনতার উপর প্রচলিত ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা লিঙ্গ এবং যৌনতার উপর ফিক্সড বা নির্দিষ্ট ধারনা থেকে সরে এসে অধিকতর ফ্লুয়িড এবং সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার পক্ষে মত দেয়।

তৃতীয় বিশ্ব নারীবাদ (Third World Feminism):

এই ধারা তৃতীয় বিশ্বের নারীদের অধিকার এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করে। এটি বিশ্বাস করে যে তৃতীয় বিশ্বের নারীদের সমস্যাগুলো পশ্চিমা নারীবাদের সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলিত নয়, এবং তাদের জন্য আলাদা আন্দোলন এবং কৌশল প্রয়োজন।

এই বিভিন্ন ধারার নারীবাদ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অধিকার এবং মুক্তির জন্য কাজ করে। তবে তাদের সবার মূল লক্ষ্য হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীর সমানাধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে, নারীবাদ আরও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর অধিকার এবং ক্ষমতায়নের জন্য আন্দোলন করা হচ্ছে। নারীবাদের এই ক্রমাগত বিকাশ এবং এর বিভিন্ন ধাপগুলি সমাজে নারীর অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

খ

বর্তমান যুগের সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় নারীবাদ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। নতুন তথ্য ও চিন্তাধারা সমাবেশের ফলে নারীবাদী চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রারম্ভ কাল থেকেই নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ন্যায় বিচার এমন কি সাংবিধানিক অধিকার থেকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে এসেছে এবং সমাজে তারা দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় রেডিক্যাল পন্থী সাইমন ডি ব্যুয়েভিয়ার এর লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’ গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি নারীকে অপর other দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন নারী জৈবিক দিক থেকে পুরুষের তুলনায় ভিন্ন। এই অপরত্ব বা other নারীর স্বাধীনতা সীমিত করে এবং তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিকরা মনে করেন সমাজে নারীর অসম অবস্থানের কারণ জৈবিক নয় বরং অর্থনৈতিক। আবার উদারনীতিবাদীদের দাবি ছিল সমাজে নারীর ভোটাধিকার, আইনি অধিকার, শিক্ষার অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। উদারনৈতিক নারীবাদী মেরি উইলস্টোন ক্রাফট মনে করেন নারী যত বাইরের কাজের সাথে যুক্ত হবে, শিক্ষার সুযোগ পাবে ততই নারীর মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে নারী মুক্তি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং এটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার অসম বন্টনের পরিবর্তন ঘটায়। ঐতিহাসিক গবেষণাও এর থেকে মুক্তি পায়নি। গবেষকরা

বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী মুক্তি আন্দোলন, নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন গবেষকরা তাদের গবেষণায় নারীদের বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, তাদের পুরুষদের সমান অধিকার দানে সরব হয়েছেন।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী অঞ্চল গুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। একদিকে রাজনৈতিক পালাবদল অপরদিকে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে জনগণের আগমনের চাপ। এই রকমই একটি রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ ভারতে আসায় উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক পালা বদলের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতিবাহিত হয়, যার প্রভাব জেলাগুলিতেও পড়তে থাকে। এছাড়া ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন তৃণমূল স্তরের সাধারণ জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। ১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীতে পঞ্চায়েত স্তরে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, নারীকে প্রথম স্তরের রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ দেয়। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বৃহত্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হল মুসলিম। তাই মুসলিম জনগণকে বাদ দিয়ে সমগ্র দেশ বা জাতির উন্নতি হতে পারে না। ২০১১ সালে প্রকাশিত শেষ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনগণের প্রায় ২৭.০১ শতাংশ মুসলিম জনগণ। এই মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্ধেক প্রায় নারী। তাই নারী জাতির উন্নতি ব্যতীত সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নতি অসম্ভব। এই মুসলিম সম্প্রদায় একটি বিশেষ মতাদর্শ ও ইসলামিক ঐতিহ্য দ্বারা পরিচালিত। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল গুলির মধ্যে মালদা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর অন্যতম। আমি আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে মালদা জেলাকে নির্বাচন করার মন স্থির করি কারণ মালদা জেলার প্রায় অর্ধেক জনজাতি মুসলিম। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম মহিলাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান কেমন ছিল, বিশেষত মালদা জেলার মুসলিম মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত অবস্থান ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কেমন তা আলোচনা করা হবে আলোচ্য গবেষণায়। এছাড়া মুসলিম পারিবারিক আইন, ইসলামিক

সামাজিক প্রথা প্রভৃতি মুসলিম নারীর জীবনে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, এ বিষয়ে মালদা জেলার মুসলিম নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বা কি? এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে বর্তমান গবেষণার উন্মেষ।

ষষ্ঠ শতকে আরব দেশে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে এবং ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে সপ্তম শতক নাগাদ। ইসলাম ধর্মের সমস্ত আইন, ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুমোদন গুলি শরীয়ত নামে পরিচিত। কোরআন ও হাদিস থেকে শরীয়ত নির্গত। ইসলামিক আইন কানুন ও অনুশাসন গুলির ব্যাখ্যার দায়িত্ব পুরুষ ধর্মীয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের হাতে ন্যাস্ত। ফলে তারা ইসলামের অপব্যাখ্যার দ্বারা সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কোরআন ও হাদিসে লিঙ্গ সমতার উল্লেখ রয়েছে। কোরানের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় ইসলাম কখনোই নারী পুরুষের বৈষম্য করে না। ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উত্তরসূরী হিসেবে নিজস্ব ব্যাখ্যার দ্বারা সমাজের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। ইসলাম ধর্ম নারীকে বহু দিক থেকেই মর্যাদাপূর্ণ আসনে স্থান দিয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও সীমা নির্ধারণ করেছেন। কোরআনে বহুবিবাহকে মান্যতা দিলেও কঠোরভাবে উল্লেখ আছে যে যদি কোন পুরুষ বহুবিবাহে লিপ্ত হয় তবে তাকে সমস্ত স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে। বহুবিবাহ ন্যায় এর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলাম ধর্ম নারীকে বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী নির্ধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, কর্মে যোগদানের অধিকার দান করেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মতামত প্রদর্শনকে ইসলাম ধর্ম অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। বিবাহের সময় পাত্রপক্ষের প্রদেয় মেহর একমাত্র নারী (স্ত্রীর) সম্পত্তি। সে বিবাহের পরেও নিজস্ব নাম অপরিবর্তিত রাখতে পারে। স্ত্রী হিসেবে নারী তার স্বামীর কাছে সব সময় সমর্থন প্রাপ্য। ইসলামিক আইন অনুযায়ী নারীর তালাক (খুলা) দাবি করার অধিকার আছে এবং নাবালক সন্তানের অধিকার দাবি করতে পারে। কিন্তু প্রাক ইসলাম পর্বে নারী তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলাম ধর্মে নারীর গৃহের বাইরে কর্মের যোগদানের ক্ষেত্রেও কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। নারী তার পছন্দ অনুযায়ী প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোন কর্মে যোগ দিতে পারে।

পারিবারিক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত নারীর অংশ ছিল পুরুষ সদস্যের অংশের তুলনায় অর্ধেক। এতেও ইসলাম ধর্ম কোন বৈষম্য করেনি বরং এই পার্থক্য ছিল উভয়ের (নারী-পুরুষ) আর্থিক দায়-দায়িত্বের পার্থক্যের জন্য। ইসলামিক আইন অনুযায়ী একজন পুরুষ তার স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সকলের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে, বিশেষ করে পরিবারের নারী সদস্যের। শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা যায় নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কখনোই নারীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। এমনকি পরিবারে একজন কন্যার শিক্ষার তুলনায় পুত্রের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখানো হয়ে থাকে, অথচ ইসলাম ধর্মের পূত্র কন্যা উভয়ের শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, শহীদের রক্ত অপেক্ষা আলিমের কালির দাম অধিক। এছাড়াও তিনি পিতামাতার উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা তোমাদের কন্যা সন্তানদের শিক্ষিত কর, যাতে তারা ঠিক-ভুল, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলামের কোনো বাধা নেই। প্রাক ইসলাম পর্বে আরব সাম্রাজ্যে নারীর কোনরূপ স্বাধীনতা ছিল না। তারা পণ্য হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু ইসলাম আবির্ভাবের পর নারীর এই শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটে। ইসলামীয় যুগে বহু বিদূষী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়, যারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ছিলেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষম ছিলেন অথচ পরবর্তীকালে বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, পর্দা প্রথা, বহুবিবাহ, তিনতালাক এর মত বিষয়গুলি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মর্যাদা ক্ষীণ করে। এছাড়াও অশিক্ষা, বেকারত্ব, আর্থিক নির্ভরতা, সিদ্ধান্ত গ্রহনের অক্ষমতা প্রভৃতি সমাজে নারীর অবস্থানকে আরো দুর্বল করে। তাই বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটিতে ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার ও বাস্তবে নারীর অবস্থান, সামাজিক সমস্যা ও অসুবিধা গুলি তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ সদস্যরা সাধারণত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতীয় মুসলিম সমাজও প্রকৃতিগত দিক থেকে

পিতৃতান্ত্রিক। এই পিতৃতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় পিতা স্বামী প্রমুখ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে ও নারী তার আজ্ঞা বাহক হিসেবে সমস্ত মেনে চলে। পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি, পরিকাঠামোগত সমস্ত দায়িত্ব পুরুষ সদস্যরাই নিয়ন্ত্রণ করে, ধর্মের ব্যাখ্যাকারীরা সকলে পুরুষ হওয়ায় তারা ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার গুলিকে মান্যতা দেয় না। ভারত ইসলাম ধর্মে প্রবেশের পর থেকে বহু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসতে শুরু করে ফলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। ভারতীয় মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা যতনা আর্থিক দুর্বলতা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির শিকার তার থেকেও বেশি তারা পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা ভুক্তভোগী। তারা নারীকে আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে পুরানো হাদিস কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষায় কেন্দ্রীভূত রাখে। শিক্ষা হল অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যায়নের চাবিকাঠি। দেশ ও জাতির উন্নতি অগ্রগতি শিক্ষার দ্বারাই ঠিক করা হয়। অথচ বর্তমানে দেখা যায় মুসলিম নারীরা সেই সমস্ত কিছু থেকেই বঞ্চিত। ভারতের মুসলিম মেয়েদের গৃহের বাইরে কর্মের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। এটি মনে করা হয় যে বাইরের কঠোর কাজকর্ম মেয়েদের জন্য নয়। মেয়েরা শারীরিকভাবে বাইরের কাজে জন্য অনুপযুক্ত এবং গৃহই তাদের একমাত্র স্থান। এই ভাবনাচিন্তা ও মানসিকতা ভারতের সর্বত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান। ফলে গৃহের বাইরে মুসলিম নারীর কর্মের যোগদানের পরিমাণ খুব কম। এই একই চিত্র পশ্চিমবঙ্গ ও মালদা জেলাতেও দেখা যায়। কেন মুসলিম নারীরা গৃহের বাইরে কর্মে যোগ দিতে অস্বস্তি বোধ করে, তা খতিয়ে রাখা হবে গবেষণা প্রকল্পে। এছাড়াও পর্দা প্রথা ও একত্রে তিন তিন তালাক এর মত সামাজিক ব্যাধি মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদা ক্ষীণ করছে এবং নারী ধীরে ধীরে নিজেকে আরো বেশি আবদ্ধ করে ফেলছে। মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ড, ওয়াকফ বোর্ড মুসলিম সম্প্রদায় ও নারীর উন্নতির জন্য গঠন করা হলেও বাস্তবে তা কতটা কার্যকর তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে এই গবেষণায়।

একটি দেশের অগ্রগতি এবং সর্বাত্বক উন্নয়ন নির্ভর করে সবার দক্ষতা ও যোগ্যতা কে কাজে লাগানোর ওপর। জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে নারী যুগে যুগে বৈষম্যের শিকার হয়েছে এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি। কোন জাতিগোষ্ঠীর অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ সূচক হল সেই জাতির নারীর মর্যাদা। ভারতের মতো বহু জাতির দেশে অঞ্চল ভেদে মুসলিম জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্ন। সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকা সত্বেও দেশে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান বেকার বা স্বল্প বেতনের সাথে যুক্ত। বিগত দুই দশক থেকে মুসলিম নারীর অবস্থা বিশেষ করে সামাজিক অবস্থা শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের আলোচনার বিষয় হয়েছে। মুসলিম নারীরা হলো সমাজের সব থেকে বঞ্চিত অংশ। মুসলিম পরিবারের সুস্থতা ও জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অথচ তারাই লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার। ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণ খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছে। ১৯৮৩ সালে ভারত সরকার দ্বারা গোপাল সিংহ কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং এই কমিটি ঘোষণা করেছিল যে মুসলমানরা ভারতের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ একটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। সাচার কমিটির মতে দারিদ্র্য হল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দুর্বল শিক্ষার প্রধান কারন। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন বলেছে যে মুসলিমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক ভাবে সুবিধা বঞ্চিত এবং ভারতের মূল স্রোত থেকে অনেক পিছিয়ে।

ভারতবর্ষের চতুর্থ মুসলিম জনবহুল রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২১.৫১%, ২৩.৬১%, ২৫.২৫%, ২৭.০১% হল মুসলিম জনগন। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে উত্তরে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, দিনাজপুর, পশ্চিমে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং সুন্দরবন বিস্তৃত দুই ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে

পশ্চাৎপদ। উপরিউক্ত জেলাগুলির মধ্যে মালদা, মুর্শিদাবাদে বেশি সংখ্যক মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস। এই জেলাগুলিতে মুসলিম জনঘনত্বের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় জনঘনত্ব গড়ের থেকে বেশি।

সূক্ষ্মভাবে গবেষণার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত জেলা হিসেবে মালদা জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। মালদা ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হিসেবে সমাধিক প্রসিদ্ধ ও উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিশেষ পরিচিত। প্রাচীন ভারতে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ কিছুকাল উজ্জ্বলিত হলেও দেশ হিসেবে বঙ্গের নাম গৌড় দেশ রূপেই চিহ্নিত হত, তাই শশাঙ্ককে গৌড়াধিপতি বলা হয়। সুলতানি ও মুঘল যুগেও মালদহ জেলার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হয়েছিল ও ব্রিটিশ শাসনাধীন মালদহ নীল উৎপাদনের জন্য পরিচিত ছিল। ইংরেজবাজার থানাকে কেন্দ্র করে মালদা জেলার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৮১৩ এর চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী মালদা জেলা গঠিত হলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জেলার রূপে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৫৯ সালে। এর আগে দিনাজপুর জেলার কিয়োদংশ, বামনগোলা থানা এবং রাজশাহীর রোহানাপুর ও চাপাই থানা সহ মোট আটটি থানা নিয়ে মালদহ জেলা গঠিত ছিল। এই নতুন প্রকাশিত মালদহ জেলার নতুন সদর হল ইংরেজবাজার। ১৮৭৬ থেকে ১৯০৫ সাল অব্ধি মালদহ জেলা ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালে বাংলা বিভক্ত হলে মালদা জেলাও তখন রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বঙ্গভঙ্গ রোধ হলেও বাংলা রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থেকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশভাগের সময় মালদাহের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ভারতবর্ষের বিভাজন হলে বাংলা তথা মালদা জেলাও বিভাজনের শিকার হয়। এই সময় উত্তরবঙ্গসহ মালদা জেলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের লোকজন মালদাহের হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার মত প্রকাশ করেন। স্যার যদুনাথ সরকার মালদা ও রাজশাহীকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার আবেদন জানিয়ে সীমানা নির্ধারক কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি জমা করেন। ইংরেজবাজার বাদে সমগ্র মালদা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাই দেশ ভাগের সময়ে

লর্ড মাউন্টব্যাটেন মালদা জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই খবর জনসম্মুখে আসতে সমগ্র মালদা জেলা জুড়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক উৎকণ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ মুসলিম লীগ সহ মালদহের মুসলিম লোকজন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে থাকায় ভীষণ আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু প্রধান অঞ্চলের লোকজন মালদাহের ভারতভুক্তির পক্ষে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড ঘোষণার দ্বারা মালদা জেলাকে ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই দিনই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক আদেশ জারি করে মালদা জেলার ১৫টি থানার মধ্যে দশটি থানাকে কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, মালদা, মানিকচক, হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল, রতুয়া, খরবা (বর্তমান মালতিপুর), হরিশ্চন্দ্রপুর নিয়ে গঠিত মালদা জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হল। আর পূর্বের মালদহের ৫টি থানা নবাবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর অন্তর্ভুক্ত করা হল। ১৯৪৭ এর ১৮ আগস্ট মালদার কালেক্টরেট ভবনে স্বাধীন ভারতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হল। মালদাবাসী আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতা পেল। বর্তমানে মালদা জেলার দুটি মহাকুমা (মালদা সদর ও চাচোল), ১৪ টি থানা, ১৫টি ব্লক, ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতি, ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, একটি জেলা পরিষদ, ও দুটি পৌরসভা, ১২টি বিধানসভা কেন্দ্র ও দুটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে।

মালদা জেলায় বসবাসকারী মানুষদের সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষাপটে মালদা জেলার ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। ৩৭৩৩ স্কয়ার কিমি জুড়ে বিস্তৃত মালদহ জেলার উত্তর-পশ্চিমে বিহার, পশ্চিমে ঝাড়খন্ড, উত্তরের উত্তর দিনাজপুর, উত্তর পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণে গঙ্গা, দক্ষিণ পূর্বে মুর্শিদাবাদ। মালদা জেলার সীমানা অঞ্চলটি যেমন বৈচিত্রপূর্ণ, তেমনি এর ভূতাত্বিক চরিত্রও বিচিত্র। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিক মহানন্দা নদী মালদা জেলাকে পূর্ব পশ্চিমে ভাগ করেছে আবার কালেন্দ্রী নদী পশ্চিম দিকটিকে উত্তর দক্ষিণে ভাগ করেছে। মালদা জেলার এই ভৌগোলিক বিন্যাসের জন্যই বারিন্দ, দিয়ারা ও তাল ভাগে ভাগ করা হয়।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকে বাংলায় মুসলমান বহিরাগতদের আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়। ফলে বরেন্দ্রের জাতিতাত্ত্বিক, গঠনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশ্রণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে সমগ্র মালদা জেলাতেই জাতিগত চালচিত্রটি অনেকটাই পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা বিভিন্ন সময়ে বাংলায় প্রবেশ করে কখনো শাসক, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী হিসেবে। এইভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় মুসলিম সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাংলার মুসলিম জনগণের জাতিতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস খতিয়ে দেখলে দেখা যায় বেশিরভাগ মুসলিম জনগনই ধর্মান্তরিত। এই ধর্মান্তরনের পেছনে কারণ হিসেবে বলা যায় হিন্দু ধর্মের কঠোর জাতিভেদ প্রথা, জটিলতা সর্বস্ব পূজার্চনা, নিচু তলার মানুষদের প্রতি বিমুখ মনোভাব প্রভৃতি। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পর মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক রাজধানী গৌড়কে কেন্দ্র করে মালদহ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মুসলমান শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল। এই শ্রেণীটি আশরাফ বা অভিজাত সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আর নিচু তলার ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আজলাফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। মালদহের সর্বত্রই এই শ্রেণিগুলির মুসলিম জনগণের বাস দেখা যায়। সৈয়দ, সুফি, শেখ, পাঠান, মোঘল, আফগান, তুর্কি প্রভৃতি আশরাফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষজন ইংরেজবাজার, মানিকচক, রতুয়া, পুরাতন মালদহ প্রকৃতির জায়গায় বাস করে। এরা নিজেদের অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত বলে মনে করত। আজলাফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানগণ জোলা, তেলি, পাজরা, উজরা, ধোবি, কুমোর, খন্দকার প্রমুখ। জোলা সম্প্রদায়ের লোকজন মালদা জেলার কালিয়াচক অঞ্চলে বসবাস করে, এরা শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, তোয়ালে ইত্যাদি তৈরির কাজের সাথে যুক্ত। আরজলরা হল নিম্ন বর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানগন। এই নিম্ন বর্ণের ধর্মান্তরিত মুসলমানগন বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত এবং মালদা জেলার সর্বত্রেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এছাড়াও শেরশাবাদিয়া, নদেগুষ্টি, চামকাটিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিচয় মালদা জেলায় পাওয়া যায়। মুসলিম সম্প্রদায় শরীয়ত মোতাবেক ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী জীবন

যাপন করে থাকে এবং এই সম্প্রদায়ের নারীর জীবনযাত্রা কিভাবে পরিচালিত হয় তাই খতিয়ে দেখা হবে বর্তমান গবেষণায়।

মালদা জেলার দুটি বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় হল হিন্দু ও মুসলিম এবং এই দুই সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণে বৃহৎ পার্থক্য বিদ্যমান। ২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মালদা জেলার মোট জনসংখ্যা হল ৩৯,৮৮,৮৪৫ এর মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা হল ৪৭.৯৯% ও মুসলিম জনসংখ্যা হল ৫১.২৭ শতাংশ। উক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। সারণীতে স্পষ্ট যে মালদা জেলার বৃহৎ সংখ্যক জনগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের হওয়া সত্ত্বেও এই সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থা সবচেয়ে করুন। সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের বিধি নিষেদের জন্য নারী স্বাধীনতা হারিয়ে একটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত। মালদা জেলার মুসলিম নারীর পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করা ও বাস্তব চিত্র অনুধাবন করা করাই হলো আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ব্লক, থানা গুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা বিভিন্ন ধরনের। মালদা জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ গ্রাম অঞ্চলে বাস করে এবং শহরাঞ্চলে মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাস। নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত মালদা জেলার ভৌগলিক পরিবেশ তাল ও দিয়ারা অঞ্চলে বেশিরভাগ মুসলিম জনগণ বাস করে বারিন্দ এলাকায় খুব কম সংখ্যক মুসলিম জনগণের বাসস্থান। সংখ্যায় প্রায় অর্ধেক হয়েও ভৌগলিক এলাকার জন্য মুসলিম জনগণ শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক সুবিধা গুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পিছিয়ে রয়েছে।

একটি জেলার মানব সভ্যতার সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে সেই জেলার জাতি বা জনসমষ্টির শিক্ষার হারের ওপর। সমাজের প্রায় অর্ধেক নারী জাতি স্বাভাবিকভাবেই নারীজাতি শিক্ষিত না হলে কোন সম্প্রদায় বা জনসমষ্টি উন্নত হতে পারে না। ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারত, পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার শিক্ষার হার পর্যালোচনা করলে নারী শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা পাওয়া যাবে। ১৯৫১ সালে সারা ভারতের মোট জনসংখ্যা শিক্ষার্থীদের হার ১৮.৩১ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২৪.৯০ শতাংশ এবং মালদা জেলায় ১১.৩৮ শতাংশ। মালদা জেলার

শিক্ষিতের হার ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতের হারের থেকে অনেক কম। আবার ১৯৮১ সালে সেন্সাস রিপোর্ট এর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মোট শিক্ষার হার ৪৬.৪৮ শতাংশ এবং মালদা জেলা শিক্ষার হার ২৬.৫২ শতাংশ, যা অনেক কম। আবার ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের নারী শিক্ষার আর ৩৪.৪০ শতাংশ, মালদায় নারী শিক্ষার হার ১৬.৩০ শতাংশ। বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হলেও মালদা জেলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব কম ও ধীরগতিতে হচ্ছে। তবে ১৯৯১ থেকে ২০১১ সেন্সাস রিপোর্টের দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই সময়কালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মালদা জেলার নারী শিক্ষার হার যথাক্রমে ২৪.৯২%, ৪১.২৫% এবং ৫৬.৯৬% যা পশ্চিমবঙ্গের নারী শিক্ষার হার (৪৬.৬০%, ৫৯.৯৬%, ৭০.৫৪%) এবং ভারতের নারী শিক্ষার হার (৩৯.৩০%, ৫৪.২০%, ৬৫.৪৬%) থেকে কম। বিগত তিন দশক থেকে মালদা জেলার নারী শিক্ষার হার খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও লিঙ্গ ব্যবধান নজরে আসে। ১৯৫১ সালে মালদা শহরে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৬.৯৭ শতাংশ, পুরুষ শিক্ষিতের হার ১৮.১০% এবং নারী শিক্ষার হার ৫.০০ শতাংশ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম দিকে নারী শিক্ষার খুব কম ছিল। ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত সময়কালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব ধীরগতিতে হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সরকারি কমিশন ও কমিটির গুলি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যেসব সুপারিশ করেছে এবং সরকার কর্তৃক তা প্রয়োগের ফলে সমাজের নারী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠে যার। ফলস্বরূপ আমরা ১৯৯১-২০১১ পর্যন্ত মালদা জেলার নারী শিক্ষার হারে বৃদ্ধি দেখতে পায়। সামগ্রিকভাবে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটলেও মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে হয়নি। ২০০১ এর সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় মালদা জেলায় মুসলিম স্ত্রী শিক্ষার হার ছিল ৩৮.৬৮ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ছিল ৫১.৫৬ শতাংশ। আবার ২০১১ রিপোর্টে মালদা জেলার মুসলিম নারী শিক্ষার

হার ৫৭.২০ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ৬৬.৮০%। ২০০১ সালের স্ত্রী- পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান প্রায় ১৩% এবং ২০১১ সালে শিক্ষার হারের ব্যবধান প্রায় ১০%। এর থেকে বোঝা যায় মুসলিম নারীরা শিক্ষাগত দিক থেকে পুরুষদের সদস্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

নারী ক্ষমতায়ন তার আর্থিক স্বনির্ভরতা দ্বারা চিহ্নিত হয়। মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা যথেষ্ট কম। তারা জীবন নির্বাহের জন্য পরিবারের পুরুষ সদস্যের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন তথ্য থেকে যে প্রতিচ্ছবি আমরা পাই তাতে স্পষ্ট যে, মালদা জেলার মুসলিম নারীর মাত্র ৪.৮৮ শতাংশ কৃষিকাজ, ১৪.১৬ শতাংশ কৃষিশ্রমিক, ৭৪.১৩ শতাংশ গৃহস্থালির কাজকর্ম ও ১৮.১১ শতাংশ অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত। বিভিন্ন পরিসংখ্যায়ন থেকে পরিষ্কার মুসলিম সমাজের নারী বেশিরভাগ গৃহকর্মের সাথে যুক্ত (মুর্শিদাবাদ বাদে), অন্যান্য জেলার চাইতে অনেক বেশি। মালদা জেলার অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে মুসলিম নারীর গৃহকর্মে অংশগ্রহণ বেশি। মূলত সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় মুসলিম নারীকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। মালদা জেলার মুসলিম নারী অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে রেশম গুটি শিল্প ও বিড়ি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ২০০১ এর আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ১.৮২ লাখ মুসলিম নারী বিড়ি শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। খুব কম সংখ্যক নারীই বেতনভুক্ত কাজে যুক্ত। আর্থিক স্বনির্ভরতা না থাকায় পরিবারের কোনো রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। পরিবারে হেয় হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায় থেকেও বঞ্চিত। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও তালাক প্রথা নারীকে আরও কুক্ষিগত করেছে। আসগার আলী ইন্জিনিয়ার বলেছেন সমাজে নারীর উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি। মুসলিম নারীর অবস্থার উন্নতি ব্যতীত মুসলিম সমাজ উন্নতি হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অধিকারের মত আরেকটি সাংবিধানিক অধিকার হলো ভোট প্রদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার। আপাতদৃষ্টিতে বর্তমানে দেখা যায় নারী রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিশেষ করে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ খুব সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কারণ হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় এবং সামাজিক বাধা। ভারতের মুসলিম নারীও তার ঊর্ধ্বে নয়। পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার রাজনৈতিক আঙিনায় মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ে স্বাধীনতার পূর্বে বিদেশ বিরোধী আন্দোলনের সময়। মালদা জেলার মহিলাদের মধ্যে সুধারানী দেবী, তরুবালা সেন, সুরেন্দ্রবালা রায়, কমলা মৈত্র, হেনা চক্রবর্তী, সাবিত্রী গোস্বামী প্রমুখের নাম বিষয় উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী পর্বে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ আণুবীক্ষণিক। এই সময়কালের মুসলিম লীগের প্ররোচনায় বেশির ভাগ মুসলিম জনগণ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখত এবং ব্রিটিশদেরকে নিজেদের সহযোগী বলে মনে করত। স্বাধীনোত্তর মালদহের ভারতভুক্তির পরও মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক আঙিনায় খুব কম দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবার থেকে আগত নারীদের রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে দেখা যায়। এবিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গনি খান চৌধুরীর ভগিনী রুবি নুর ও তার কন্যা মৌসুম বেনজির নূর এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সাবিনা ইয়াসমিনের নাম প্রথম স্থানে রাজনীতিতে উঠে আসে। ১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা নির্বাচন ব্যবস্থার তৃণমূলের স্তর পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণ করার ফলে গ্রাম্য এলাকা থেকে বহু নারী রাজনীতি সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনীতির মূল স্রোতে নারীদের উপস্থিতি আণুবীক্ষণিক, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কেন আণুবীক্ষণিক এর অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করার প্রয়াস করা হবে আলোচ্য গবেষণায়।

গ

মুসলিম নারী সম্পর্কিত বহু গবেষণা পূর্বে হয়েছে কিন্তু মালদা জেলার মুসলিম নারী বিষয়ক তেমন ঐতিহাসিক গবেষণা না হওয়ায় সেই সম্পর্কিত গবেষণায় লিপ্ত হয়েছি এবং সেই

সম্পর্কিত মুসলিম সমাজ মুসলিম, নারী ক্ষমতায়ন, রাজনীতিতে নারী প্রভৃতি গবেষণালব্ধ গ্রন্থ গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হল।

শেখ রহিম মন্ডল তার *Rural Muslim Women: Role and Status* গ্রন্থে ইসলাম ও মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, তাদের অধিকার আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধ কিভাবে মুসলিম নারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ইসলাম ধর্ম ও কুরআন ও হাদিসের আলোকে চালিত মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ তিনি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার কাউয়াখালী গ্রামের মুসলিম নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য গুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে নারী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেছেন মুসলিম নারীদের এই পিছিয়ে পড়ার পেছনে সামাজিক সাংস্কৃতির কারণে সাথে ধর্মীয় কারণও দায়ী।

শেখ রহিম মন্ডল এর লেখা আরেকটি গ্রন্থ *Educational Status of Muslim: Problem, Prospects and Priorities* পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম শিক্ষার হার, শিক্ষার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্কুলছুট সমস্যা, স্ত্রীশিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি গ্রামের ওপর সমীক্ষা করে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি মুসলিমদের শিক্ষার প্রতি অবহেলার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সমস্যা ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। ধর্মের ব্যাখ্যাকারীরা মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করায় তারা আধুনিক শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। পর্দাপ্রথা মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেছেন মুসলিম সমাজ নারী শিক্ষার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করে তাদের চার দেওয়ালে আবদ্ধ করে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় নিয়োজিত রাখতে চাই। অপরদিকে লক্ষণীয় যে পরিবারের কন্যার তুলনায় পুত্রদের শিক্ষার প্রতি অধিক নজর দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই নারী শিক্ষার প্রতি

অবহেলার কারণ হিসেবে তিনি ঐতিহ্যগত ধর্মীয় অনুশাসন ও পারিবারিক অনুশাসনকেই দায়ী করেছেন।

এস. এ. এইচ. মইনুদ্দিন তার *Divorce and Muslim Women* শীর্ষক গ্রন্থে মুসলিম নারীর বিবাহ, তালাক ও ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কিত তথ্যাবলীর আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) কর্তৃক ইসলামের আবির্ভাবের পরে নারীর উন্নতির জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করেছেন কিন্তু বর্তমানে ইসলামের ব্যাখ্যা কর্তা মৌলানা ও মৌলবিগণ ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদেরকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তিনি আরো দেখিয়েছেন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ তুলনামূলকভাবে কম। যেসব পরিবারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল, অশিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধ প্রভৃতি জন্য। ইসলাম ধর্মের তালাক হল সব থেকে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য হালাল বস্তু। ইসলামে তালাকের অনুমতি রয়েছে কিন্তু অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যতীত তালাকের ধারেকাছে যেতেও বারণ করা হয়েছে। মুসলিম নারীরা তিন তালাকের ভয়ে সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে কখন তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেয়। ইসলামে তিন তালাক এর উল্লেখ থাকলেও একত্রে তিন তালাক কখনও প্রচলিত ছিল না। তিনটি ইদ্দতপর্ব পরবর্তী তিন তালাক দেওয়া হয়। ইসলামে নারীদেরও তালাক গ্রহনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে নারীদের প্রদেয় তালাককে খুলা তালাক বলা হয়। এছাড়াও দুজনের (স্বামী ও স্ত্রী) সম্মতিতে মোবারত তালাক হয়ে থাকে। মইনুদ্দিন তার গ্রন্থে তালাক সম্পর্কিত শরীয়তি নির্দেশ নামার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বাস্তবে সমাজে চলতে থাকা তিন তালাকের অপব্যবহার সম্পর্কেও আমাদের অবহিত করেছেন।

মহম্মদ মইনুদ্দিন *Understanding Muslim Situation in West Bengal: Some Refflection and Fertility in Malda District*, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে মুসলিমরা হল ভারতবর্ষের দ্বিতীয়

বৃহত্তম সম্প্রদায়। সংখ্যায় এত বৃহৎ হয়েও বর্তমানে তারা পিছিয়ে রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মইনুদ্দিন ভারতবর্ষ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি জনসম্মুখে তুলে ধরেছেন। এই বিশেষ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি তথ্যের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করেছেন। তার উক্ত গ্রন্থটি সহায়ক উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত। এই গ্রন্থে তিনি একটি বিশেষ পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কতটা বৈষম্যের শিকার তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগন একটি বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে চলাফেরা করে এবং নিজেদের সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তিনি আরো বলেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়ার জন্য এই সম্প্রদায়ের নারীদের অবস্থা আরো করুন, তারা নিজের আর্থিক ব্যয় বহনে অক্ষম। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রেও তাদের কোনো মূল্য থাকে না। মুসলিম নারীরা বরাবরই নিজেদের রাজনৈতিক আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এর কারণ হিসেবে তিনি প্রচলিত শরীয়তী বিধান ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কঠোর বিধি নিষেধকেই দায়ী করছেন।

নাজমুল হোসেন *Muslim and Non-Muslim Differential in Education, Employment and fertility in Malda District* গ্রন্থে মালদা জেলার মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাগত, চাকুরীগত ও উৎপাদনগত পার্থক্যের একটি রূপরেখা টানার চেষ্টা করেছেন। তার উক্ত গ্রন্থে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান, পরিবার, শিক্ষা, জীবিকা, প্রাচুর্যতা ও ধর্মীয় প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতবর্ষের দুই মূল সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলিম ভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে জীবন যাপন করে। নাজমুল হোসেন তার উক্ত গ্রন্থে মালদা জেলার প্রত্যেকটি ব্লকের মুসলিম সম্প্রদায়ের জনঘনত্ব, শিক্ষার হার, কর্মে যোগদানের হার এর উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মালদা জেলার মুসলিম সম্প্রদায় অমুসলিম সম্প্রদায় অপেক্ষা সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে

রয়েছে। এই পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তিনি দারিদ্রতা, অশিক্ষা, ধর্মীয়ভাবাবেগকে দায়ী করেছেন।

কেশব চন্দ্র মন্ডল তার *Empowerment of Women and Panchayati Raj: Experiences from West Bengal* শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইন চালু হওয়ার পর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রাম্য এলাকায় জনসাধারণের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক এরকম নারীকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীতে মোট আসন সংখ্যার ৩৩ শতাংশ আসনে তপশিলি জাতি উপজাতিসহ নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে নির্বাচন ব্যবস্থার তৃণমূল স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় বাংলার পঞ্চায়েত রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ খুব কম। এর কারণ হিসেবে কেশবচন্দ্র মন্ডল মহিলাদের রাজনীতিজ্ঞ জ্ঞানের অভাব ও ঐতিহ্যবাহী পুরাতন তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন। তিনি বলছেন মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও বহুমাত্রায় তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কথা মতই চলতে হয়। মন্ডল তার গ্রন্থে মেদনীপুর জেলার ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ১ ও দাসপুর ১ এর তপশিলি জাতি উপজাতিসহ সমস্ত গ্রামীণ মহিলাকে নিয়ে সমীক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন মহিলা সংরক্ষিত আসন হওয়ায় নারীরা নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য হয় কিন্তু বাস্তবে তার পেছনে কোন পুরুষ সদস্যই মাথা কাজ করে।

জয়শ্রী ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ শীর্ষক গ্রন্থে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনীতির প্রতি মহিলা ও পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তার সমীক্ষা ক্ষেত্র হল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার পূর্ব বেলগাছিয়া বিধানসভা ক্ষেত্রের অন্তর্গত দক্ষিণ দমদম পৌরসভা। ১৯৯২ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত রাজনীতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভাব

পরিলক্ষিত হয়। সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কম থাকার কারণ হল শিক্ষার অভাব, স্বাধীনতার অভাব, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা প্রভৃতিকে এই দায়ী করছেন।

Evelin Hust, *Women's Political Representation an Empowerment in India: A Million Indiras Now* গ্রন্থে ভারতের নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বের কথা বলেছেন। তিনি রাজনীতিতে নারী পুরুষের ভাবাবেগ নথিভূক্ত করেছেন। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল উড়িষ্যায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন আঞ্চলিক স্তরে নারীদের উপস্থিতি খানিকটা দেখা গেলেও রাজনীতির উচ্চপদগুলিতে নারীদের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য। এজন্য তিনি বলছেন যতদিন পর্যন্ত মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষন না হচ্ছে ততদিন মহিলারা উচ্চপদে আসীন হতে পারবে না। ১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা আসন সংরক্ষণের আগে পর্যন্ত আঞ্চলিক রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিলই না বললেই চলে। কিন্তু সংরক্ষণের পর মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবারের পুরুষ সদস্য দ্বারা পরিচালিত মহিলারা সংরক্ষিত আসনে অংশগ্রহণ করে ফলে আসল উদ্দেশ্যই অবহেলিত হয়। তাই বলা যায় নারী ক্ষমতায়ন ব্যতীত নারীর সমাজে তার আসল জায়গা করে নিতে পারবে না।

নাসিম আহমেদ তার *Liberation of Muslim Women* বইতে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে মুসলিম মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ও ইসলামিক রীতি-নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলামে বর্ণিত আছে পৃথিবীতে নারী পুরুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন বিধি নিষেধ শুধুমাত্র নারীর উপরেই বর্ষিত হয়। বহু বিবাহ ইসলামে মান্যতা দেওয়া হলেও তা শুধুমাত্র প্রয়োজন ভিত্তিক। কিন্তু তার অপব্যবহার করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইরাক, ইরান, তুর্কি প্রভৃতি ইসলামিক দেশগুলির মহিলারা অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামিক রীতি-নীতির কিছু সরলীকরণের কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন ইসলাম ধর্ম পোশাক

পরিধানের ওপর বা পর্দা প্রথার ওপর নির্ভর করে না ইসলামের আসল অর্থ বুঝতে পারলে জীবন ধারণের ক্ষেত্র আরও সহজ হয়ে যাবে।

আল আশারি তার *Purdah and the Status of Women in Islam* গ্রন্থে দুটি বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেছেন একটি হল ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা ও পর্দা প্রথার প্রয়োজনীয়তা, দ্বিতীয়টি হল পশ্চিমী জীবনযাত্রার সঙ্গে কোরআন ও হাদিসের তুলনামূলক । মানুষের উচিত যেকোন একটিকে জীবন ধারণের উপায় হিসেবে বেছে নেওয়া। তিনি বলেছেন জীবনের চলার পথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য পর্দা প্রথার কঠোরতা কমানো উচিত। পর্দা প্রথার কঠোরতার জন্যই নারী যাবতীয় পার্থীব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ইসলামী আইনে শুধুমাত্র নারীদের উপরেই পর্দার বিধান নেই পুরুষদেরকেও তাদের দৃষ্টি সংযত করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শুধুমাত্র নারীদের উপরেই পর্দার কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। লেখক বলেছেন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত এবং প্রয়োজনে ইসলামিক বিধি-বিধান গুলির পরিবর্তন করা উচিত। তিনি বলছেন ইসলাম আমাদের দুর্বল করে না বরং বর্তমানের অরাজকতা থেকে আত্মরক্ষার উপায়।

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় তার *Education of Muslim Women in West Bengal* প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীদের শিক্ষাগত অবস্থান পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখেছেন ১৯৩২-৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নমানের। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা একটি নির্দিষ্ট ইসলামিক গণ্ডির মধ্যেই চলাফেরা করে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালীন সময়ে তিনি ডায়মন্ডহারবার ১ ব্লকের তিনটি গ্রাম পাঁচগ্রাম, বাদল, চাঁদুয়া সমীক্ষা করে দেখেছেন মহিলাদের সেখানে শিক্ষার বা কারিগরি শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই, তারা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা কোরআন পড়ে। আরবি অক্ষর জানে কিন্তু সেটা বোঝে না। এক কথায় অর্থ না জেনেই তারা কোরআন পরে। তারা বাংলা লিখতে বা পড়তে জানে না। লেখিকা এখানে বলেছেন

নারী মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষা কারণ নারী শিক্ষিত না হলে নিজের অবস্থান পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম।

শিবানী রায় *Status of Muslim Women in India* বইতে ভারতে মুসলিম নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখেছেন যে ভারতের মুসলিম নারীরা শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থানে পিছিয়ে রয়েছে।তিনি দিল্লি ও লক্ষনৌ দুটি শহর থেকে মুসলিম নারীদের সমীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন দুটো শহরেই মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামিক শরীয়ত অনুযায়ী ও নির্দিষ্ট বিধিবিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেন। তারা নারী শিক্ষার প্রতি খুব একটা উৎসাহ দেখায় না। তবে শিবানী রায় এটিও স্বীকার করেছেন যে গত দিন পর্যন্ত থেকে যে পরিবর্তনগুলি হয়েছে তা মুসলিম পরিবার ও মুসলিম নারীর মর্যাদাকে প্রভাবিত করছে, আসল উদ্দেশ্য ছিল যেসব বিষয় গুলি নারীর ভূমিকা কে প্রভাবিত করে তা খুঁজে বার করা। তা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থান গত দিক থেকে মুসলিম নারীরা পিছিয়ে রয়েছে এবং তিন তালাকের দ্বারা তারা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

ইন্দু মেনন তার এই গবেষণামূলক *Status of Muslim Women in India* গ্রন্থে ভারতের মুসলিম নারীর মর্যাদা ও অবস্থান জানার জন্য কেরল রাজ্যের চারটি জেলা মালাপুরাম কালিকট পানাঘাট ও কন্নোর জেলার মুসলিম নারীর ওপর সমীক্ষা করেছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন শিক্ষা কিভাবে মুসলিম নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেছেন বর্তমানে পরিবর্তীত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিম নারীরা ধর্মীয় ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠানগুলিকে দূর করার সর্বত্তভাবে চেষ্টা করছে। তারা নিজেদের শিক্ষিত করে, সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের দ্বারা, বেতন ভিত্তিক কর্মের যোগদানের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দাবি করে সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাগুলিকে দূর করার চেষ্টা করছে। এছাড়াও যে সব বিষয়গুলি নারীর সামাজিক মর্যাদায় অন্তরায় সৃষ্টি করছে তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন তার উক্ত গ্রন্থে।

জয়া হাসান ও ঋতু মেনন তাদের, *Unequal Citizens: A study of Muslim women in India* গ্রন্থে বলেছেন মুসলিম নারীরা হল তুলনামূলকভাবে ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের নারীদের থেকে সবচেয়ে হীন ও সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রেণী। এমনকি মুসলিম নারীরা নিজ সম্প্রদায়েও নিচের সারিতে অবস্থিত। মুসলিম মেয়েরা একত্রে তিন তালাক, বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা দ্বারা এমনভাবে বেষ্টিত যে তারা অন্যের কাছে রক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। যার সমাজে নিজস্ব কোন স্থান নেই। সেজন্য বিভিন্ন অভিযান ও প্রতিযোগিতা মূলক স্থানে মুসলিম নারীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং প্রশ্ন তোলা হয় মুসলিম পার্সোনাল ল ও নারীর অধিকার গুলি সংকোচের প্রতি পার্সোনাল ল এর আইনি অধিকার এর প্রতি এবং আর্থ-সামাজিক ও স্থানীয় স্তরে সমনাগরিক হিসেবে প্রাপ্ত সাংবিধানিক অধিকার গুলি দাবি করা হয়। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় কাল পর্যন্ত নারীরা সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নে অবস্থিত ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, যা বরাবরই সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শ্রেণী, জাতি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে চিন্তার বিষয়। মধ্যযুগ থেকে বর্তমানে নারী সমতার বিষয়টি আমাদের সমাজে অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার প্রতিষ্ঠিত করতে বহু সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও তিক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, যা বর্তমানের মহান আদর্শগত চিন্তাধারার প্রতিফলন। হাসান ও মেনন তাদের গ্রন্থে বলেছেন সনাতনী পন্থা থেকে আধুনিকতাই উত্তরণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন।

সাবিহা হোসেন তার *The Changing Half: A Study of Indian Muslim Women* গ্রন্থে বলেছেন ধর্মীয় কারণে সাথে সাথে সামাজিক পরিকাঠামগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় যেমন বিভিন্ন প্রথা ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ, পিতৃতান্ত্রিক শাসনকাঠামো, ইসলামিক আইনের অপব্যাখ্যা, নারীর নিজস্ব উদ্যোগের অভাব, পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা ইত্যাদি মুসলিম নারীকে কুক্ষিগত করে ও নতুন মূল্যবোধ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু অশিক্ষা, দারিদ্রতা, পরনির্ভরতার ব্যাপকতা থাকায় নারীরা নতুন সংস্কারগুলিকে খুব ধীর গতিতে গ্রহণ করে।সাবিহা

হোসেন দেখিয়েছেন শিক্ষা, বয়স, পারিবারিক কাঠামো, আয়, শহরে অবস্থান, গণমাধ্যমের প্রভাব ইত্যাদি মুসলিম নারীর আধুনিকতা ও সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মোহিনী আঞ্জুম *Muslim Women in India* বইতে বলেছেন ভারতে শরীয়তী শিক্ষা প্রত্যেক দিনের মুসলিম নারীর জীবন চালিত করে। বাস্তব জীবনে দেখা যায় সামাজিক শ্রেণী, স্থানীয় উপসংস্কৃতি, পরিবার ইত্যাদি ইসলামিক অনুশাসন ও বাস্তবে মুসলিম নারীর অবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। শ্রেণীবিন্যাসের ভূমিকা সমাজে এতটাই প্রবল ও গুরুত্বপূর্ণ যে কখনো কখনো তা ইসলামিক সমাজ কেউ পরিচালিত করে। ভারতের মুসলিম সময়কালে শরীয়তী আইন সর্বত্র প্রতিফলিত হয়নি। আঞ্জুম বলেছেন শরিয়ত ছিল শুধুমাত্র শ্রদ্ধার বিষয় কোন আইন নয়, যে নারীর অধিকার কর্তব্যের মত বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আইনের প্রতি মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন।

ফৈজি *Outlines of Mohammedan Law* গ্রন্থে বলছেন বর্তমানের সমগ্র ভারতবর্ষে মোহামেডান ল বা শরীয়ত অ্যাক্ট ১৯৩৭ গ্রহণযোগ্য ও প্রযোজ্য। এটাতে ছয়টি অধ্যায় আছে এবং ভারতে অবস্থিত সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের এর জন্য প্রযোজ্য এবং শরীয়ত বিরোধী প্রথা গুলিকে সমাজ থেকে দূর করে। এটি শ্রেণীভেদে ও প্রতিষ্ঠান ভেদে প্রত্যেক মুসলিম সদস্যের জন্য প্রযোজ্য। শরীয়ত আইন ১৯৩৭ বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তির আইন (নারীর সম্পদের অধিকার, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার অথবা কোন উপহার) এমনকি কোন প্রকার পারিবারিক আইন যেমন- বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণ পোষণ, মেহর, অভিভাবকত্ব, উপহার, ট্রাস্ট এর সম্পত্তি, ওয়াকা আইন ইত্যাদি আইন সম্বলিত লিখিত বিধান যা মুসলিম আইন হিসেবে প্রত্যেক মুসলিম সদস্য মান্য করে।

আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার তার *Islam Women and Gender Justice* গ্রন্থে যুক্তি দেখাচ্ছেন নারীদের সমাজে প্রচলিত গোড়ামী ও নিষ্ঠুর সাংস্কৃতিক নিয়ম গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, যা নারীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দমন করে। পণপ্রথা, স্ত্রীহত্যা, অসম্মানের

বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নারীরা ইসলাম নির্দিষ্ট অধিকার থেকে বঞ্চিত। ইসলাম হল বিশ্বের সর্বপ্রথম ধর্ম যা নারীদের প্রথম এক আইনী সত্তা হিসেবে বিবেচিত করে এবং পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা আরোপিত সমস্ত বাধা দূর না করা পর্যন্ত নারী ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন নারীদের আধুনিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে, যাতে তারা সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরে সরিয়ে নিজের অধিকারগুলি যা ইসলাম ধর্ম বহু পূর্বেই তাকে দিয়েছে এবং আধুনিক সমাজ নতুন রূপে দিচ্ছে অর্জন করতে হবে এবং এটি নারীকে নিজস্ব ক্ষমতা প্রদান করবে ও ইসলামিক আইনেরও উন্নতি ঘটবে।

ইমতিয়াজ আহমেদ সম্পাদিত *Kinship, Marriage among Muslims in India* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত মুসলিমদের পরিবার, জ্ঞাতিত্ব, বিবাহ সম্পর্কিত তথ্যাবলী। জ্ঞাতিত্ব ও বিবাহ সম্পর্কিত ইসলামিক আইন উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের মূল চর্চা ও ব্যাখ্যার বিষয় হল পরিবারের পরিকাঠামো ও কার্যকলাপ। বিভিন্ন প্রবন্ধের পণপ্রথা, মেহের বর্তমান ভারতে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার কিভাবে প্রচলিত ও প্রভাব বিস্তার করছে তা বর্ণিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থে।

গোলাম মুর্শিদ তার *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী,* গ্রন্থে উপনিবেশিক আমলে বাঙালি মহিলাদের আধুনিকতার আঙিনায় আসার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন বাঙালি মহিলাদের জন্য মুক্তির আন্দোলন শুরু করে পুরুষরা। তবে পুরুষরা নারীদের পুরোপুরি স্বাধীন করার জন্য আন্দোলন করেননি বরং নিজেদের জীবনযাত্রাকে আধুনিক করে তোলার জন্যই এই প্রচেষ্টা শুরু করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুরুষরা নারীদের কষ্ট, সতীদাহ প্রথা, কুলিন বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্ত্রী পুরুষ সম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। মহিলারা যখন কিঞ্চিত শিক্ষিত হয়ে ওঠে জীবনের নতুন মূল্যবোধ নিয়ে ভাবতে শেখেন তখন থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিশ্বাসী ব্রাহ্মদের একাংশ নারীদের ও অরক্ষণশীল ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ মহিলারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন

হয়ে ওঠ। স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবনী দাস, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সরলা দেবী প্রমুখ এর শিক্ষা দান বিষয়ে প্রযত্ন করেন তা থেকে মহিলাদের এ বিষয়ে সচেতনতা প্রকাশ পায়। **১৯৭১** সালের দেশভাগের পর মুসলিম মহিলারা উচ্চশিক্ষা ও চাকরি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও নারীদের কর্মমুখী জীবনযাত্রার ফলে সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে মহিলাদের ভূমিকা পুনঃনির্ধারিত হয়। তারা পরিবারের আয়তন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু এতদ সত্বেও লেখক বলেছেন পুরুষরা নারীদের সমান বলে মনে করেন কিনা সন্দেহ আছে কারণ নারীর আধুনিকতার শুভারম্ভ শুরু হয় পুরুষ সদস্যের হাত ধরে।

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য গুলি হল-

১. পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার মুসলিম নারীর মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক অবস্থান অবস্থান ও মর্যাদা খতিয়ে দেখা।
২. স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি মুসলিম নারীর আধুনিকীকরণের পথে অন্তরায় সেগুলি খুঁজে বের করা।
৩. মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান ও কর্মে যোগদানের অবস্থান খতিয়ে দেখা।
৪. রাজনীতিতে মালদা জেলার মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ কতখানি এবং তা কিভাবে নারীর স্বনির্ভরতার সহায়ক তা খতিয়ে দেখা।
৫. পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামো এবং ইসলামীয় ধর্মীয় সংস্কৃতিক বিষয়গুলি নারীর শিক্ষা, স্বনির্ভরতা, সম্পত্তির অধিকার, ভরণপোষণ এবং সর্বোপরি পরিবারে তার মর্যাদা কে কতখানি প্রভাবিত করে তা খুঁজে বের করা।
৬. মুসলিম পার্সোনাল ল’ তিন তালাক, পর্দাপ্রথা মুসলিম নারীর জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেই সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীর দৃষ্টিভঙ্গি বা কি তা খতিয়ে দেখা হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়।

গবেষণামূলক প্রশ্নঃ

উপরে উক্ত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য এবং বর্তমান গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি উঠে এসেছে-

১. নারীর বর্তমান অবস্থানের জন্য ইসলামিক বিধান কতখানি দায়ী তা ব্যাখ্যা করা?

২. মুসলিম সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান কেমন ছিল ও বর্তমানের সাথে তার পার্থক্য কোথায়?

৩. শিক্ষাগত দিক থেকে মুসলিম নারী কতটা পিছিয়ে?

৩. শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিম নারীর উন্নতির জন্য কি ভূমিকা পালন করেছিল?

৪. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নারী উন্নতিতে কতখানি ভূমিকা পালন করেছিল?

৫. সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সম্পর্কে ইসলামিক বিধান কি?

৬. শরীয়তে মুসলিম নারীর অধিকার গুলি কি?

৭. কিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সমাজে মুসলিম নারীর অবস্থান পরিবর্তনের সহায়ক?

৮. মুসলিম পার্সোনাল ল' কিভাবে নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রভাবিত করছে?

ঘ

বর্তমান গবেষণাটি ভূমিকা ও উপসংহার সহ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়েছে। অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে দেওয়া হলঃ

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম '***মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান***, এখানে মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে মুসলিম নারীর অধিকার গুলি ও বাস্তবে মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি কিভাবে সম্পর্কিত এবং পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থানকে কিভাবে প্রভাবিত করে সেই সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মালদা জেলার মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ও মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর কর্মের যোগদানের হার, বৈতনিক কর্মে

যোগদানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার হার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য, বিভিন্ন প্রাথমিক উৎস ও সহায়ক উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচ্য অধ্যায়টি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ***'মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান'***, এই অধ্যায়ে ইসলাম ধর্মে নারী শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করা হবে। স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনোত্তর কালে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত মালদা জেলার মুসলিম নারী শিক্ষা, নারী শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও আধুনিক আধুনিক শিক্ষার মধ্যে তারতম্য কোথায় তা খতিয়ে দেখা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। স্বাধীনোত্তর কালের মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নারী শিক্ষার প্রতি কতটা সহায়ক হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। নারী শিক্ষা নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ও কর্মের যোগদানের ক্ষেত্রে কিরূপ ভূমিকা পালন করে তা আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান ও সহায়ক উপাদানের সাহায্যে নির্মিত।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ***'মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অবস্থান'***, এই অধ্যায়ে আমরা মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের বিধানগুলি, ভারতের রাজনীতিতে নারীর যোগাযোগ কিভাবে ঘটল, স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ, বাংলার মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার নির্বাচনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ, সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কতখানি সহায়ক তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা মালদা জেলার মুসলিম নারীদের রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নারী ক্ষমতায়নের কতখানি সহায়ক হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। এই অধ্যায়টি প্রাথমিক ও সহায়ক উপাদানের সম্বলিত প্রয়াসে নির্মিত।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ***‘ইসলামিক অনুশাসনের প্রেক্ষিতে মালদা জেলার মুসলিম নারী’***, এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামিক অনুশাসন গুলি মুসলিম নারীর জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করছে, পর্দাপ্রথা, বিবাহ ও তালাক মুসলিম নারীর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলি কিভাবে নারীর জীবনকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এছাড়াও মুসলিম পার্সোনাল ল’ বা মুসলিম পারিবারিক আইন তিন তালাক ও তার পরবর্তী ভরণপোষণ, মেহের প্রভৃতি সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

উপরোক্ত অধ্যায় গুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী, সমাজে মুসলিম নারী কি কি সমস্যা গুলি সম্মুখীন হচ্ছে ও মুসলিম নারীদের উন্নতির জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে উপসংহার হিসেবে।

প্রথম অধ্যায়

মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান

প্রথম অধ্যায়

মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি এবং অগ্রগতি নির্ভর করে সেই সমাজে অবস্থিত মানব সম্পদের ওপর। মানুষ নিজস্ব ক্ষমতা, শিক্ষা, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সভ্যতাকে সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সভ্যতার এই অগ্রগতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও যথেষ্ট স্বীকার্য। তথাপি লক্ষণীয় যে নারী তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সমাজে তারা অবহেলিত ও দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত। বিশেষতঃ মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারী বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আবহে আবদ্ধ, নিজের আর্থ-সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে পৃথিবীর সর্বত্র নারী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ও নারী সমাজে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু নারীর অধিকার আন্দোলন বাস্তবে কতটা কার্যকরী হয়েছে বিশেষতঃ মালদা জেলার মুসলিম নারীর মর্যাদা সমাজে কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। ধর্ম মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মৌলানা মৌলবীগণ কর্তৃক ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।[১] তাই ইসলাম ধর্মকে বাদ দিয়ে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ও নারীর অধিকার সমূহ আলোচনা প্রায় নিরর্থক। প্রাক ইসলাম যুগে নারীর অবস্থা ও ইসলাম আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ে নারীর অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে এবং সমাজ ব্যবস্থায় তার বাস্তবায়নের রূপ আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সংজ্ঞার অবতারণা করেছেন। কোন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান বলতে বোঝায় সে সমাজে কতটা

জায়গা দখল করে আছে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ম্যাক্সও ওয়েবারের মতে কোন ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হল শ্রেণী, মর্যাদা ও ক্ষমতা। কোন ব্যক্তির আর্থিক সক্ষমতার দ্বারা এই তিনটি বিষয় নির্ধারিত হয়ে থাকে।[২] অপরদিকে সমাজবিদ ও অর্থনীতিবিদ সাসাকিয়া স্যাসেনও একই মত পোষণ করে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারক কতগুলি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন, যথা সম্পত্তি, আয়, ক্ষমতা, শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি। এই সমস্ত সামাজিক মর্যাদা নির্ধারক সূত্র গুলির পরিপ্রেক্ষিতে নারী একই সমাজে বসবাসকারী পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সামাজিক মর্যাদার অধিকারী।[৩] নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক *'টুওয়ার্ডস ইকুয়ালিটি'* শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে, status refers to a position in a social system or subsystem which is distinguishable from and at the same time related to other position through its delighted rights and obligations.[৪] স্যাসেন আরও বলেছেন নারী তার জৈবিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই পুরুষদের তুলনায় কম মর্যাদার অধিকারী এবং সুযোগ সুবিধা গুলি পুরুষের তুলনায় সীমিত।[৫] সমাজে নারীর সামাজিক মর্যাদা স্থাপনে বড় প্রতিবন্ধকতা হল নারী পুরুষের অসমতা। বিভিন্ন দেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের অধীনস্থ অবস্থানে অবস্থিত, বিশেষ করে ভারতে এই দৃশ্য আরও প্রকট। ভারতীয় নারী আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সমমর্যাদা ও সম অধিকার থেকে বঞ্চিত। ঐতিহ্যগত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পিছিয়ে পড়া অবস্থানের কারণ তা নিজস্ব ক্ষমতা বা দক্ষতা নয়, বরং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তার সামাজিক অবস্থান।[৬] নারী পরিবারে শুধুমাত্র একজন কন্যা হিসেবে, মা হিসেবে ও স্ত্রী হিসেবে ভূমিকা পালন করে, কিন্তু একজন ব্যক্তি হিসেবে নিজস্ব পরিচয়, অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে তথা মালদা জেলাতেও মুসলিম ঐতিহ্যগত সমাজ ব্যবস্থায় একই চিত্র দেখা যায়। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ও বৃহত্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হল মুসলিম। এই মুসলিম সমাজের প্রায় অর্ধেক নারী। তাই এই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে বা নারীর উন্নতি ব্যতীত মুসলিম সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ে

আমরা ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ বিশেষতঃ মালদা জেলার মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান আলোচনা প্রসঙ্গে ইসলামিক নিয়ম-নীতি ও অনুশাসন অনুযায়ী নারীর অধিকার গুলি আলোচনা প্রয়োজন। ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী মুসলিম নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান জানার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল কোরআন ও হাদিস। যে কোন ধর্মই তার অনুগামীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতির সহায়ক, কিন্তু বাস্তব সামাজিক স্থবির অবস্থায় সেই উন্নতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। ভারতের মুসলিমরা শুধুমাত্র সংখ্যালঘু নয়, তারা ধর্মীয় ঐতিহ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকেও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। মুসলিম নারীরা কখনো ধর্মের নামে, কখনো আবার সামাজিক প্রথার কারনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার।[৭] ফলে নারী তার সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ, যা কিছু মাত্রায় সম্প্রদায়গত সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে।[৮] ভারতবর্ষ তথা মালদা জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য মুসলিম নারীর ক্ষমতায়ন খুব প্রয়োজন। তাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার ওপর ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। সমাজবিদ শশী জৈন বলেছেন, মুসলিম নারী সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে তা শুধুমাত্র যে সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ও আধুনিকীকরণের সহায়ক হবে তাই নয়, তা সমগ্র দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির পথপ্রদর্শক হবে।[৯]

ইসলাম ধর্মে নারীর অবস্থানঃ

সমগ্র বিশ্বের মুসলিমরা একই সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা বহন করে। গবেষক শিবানী রায় তার গবেষণামূলক গ্রন্থে বলেছেন মুসলিম সমাজে ধর্ম একটি পবিত্র ও নিরপেক্ষতার বার্তা বহন করে। সমগ্র বিশ্বের মুসলিমরা তাদের ধর্মকে অপরিবর্তনশীল ও কোন নতুন সংস্করণের নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করে। মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখিত অনুশাসন

অনুযায়ী পরিবারে নারী-পুরুষের সম্পর্ক চালিত হয়, এমনকি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী চালানোর চেষ্টা করে। ইসলামের অনুগামীরা পবিত্র গ্রন্থে উল্লেখিত অনুশাসন অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে।[১০] ভারত সরকার দ্বারা গঠিত সাচার কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিম নারীরা বাস্তবে সামাজিক অসাম্যের শিকার, এমনকি নিজস্ব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও অসাম্যের শিকার হয়েছে।[১১] নারীবাদী লেখিকা সীমা কাজির মতে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সমাজে নারী পুরুষের সমতা বজায় রাখে এবং মুসলিম নারীর প্রতি হওয়া অবজ্ঞার মূল কারণ হল পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন সমাজে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা।[১২] অপর এক নারীবাদী লেখিকা হাফিয়া জাওয়াদ বলেছেন ইসলাম নারী পুরুষের সাম্যের উপর জোর দেয়। তিনি আরও বলেছেন কুরআন ও হাদিসে নারীদের উন্নতিকল্পে বহু বিধানের উল্লেখ আছে, যা নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে মত প্রকাশ করে।[১৩]

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে সুদূর আরব দেশে ষষ্ঠ শতকে এবং ভারতের ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে দ্বাদশ শতকে তুর্কি আক্রমণের মধ্য দিয়ে ও বাংলায় ইসলামের প্রবেশ ঘটে আরও পরে। বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের তত্ত্বাবধানে ভারত হয়ে ওঠে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বহু পীর আউলিয়া ও সুফি সাধকদের তত্ত্বাবধানে ভারত ইসলামিক সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভারতের সর্বত্র ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হতে শুরু করে। ফলে ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে মুসলিম জনসংখ্যার দিক থেকে ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পর ভারতের স্থান এবং ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হল মুসলিম। অথচ সংখ্যায় এত বৃহৎ হয়েও মুসলিম সম্প্রদায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে। মুসলিম সম্প্রদায় যত পিছিয়ে এই সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থা আরো করুণ। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হয়েও মুসলিম নারী তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। নারীর এই বিচ্ছিন্নতা ও বঞ্চিত হওয়ার কারণ হিসেবে গবেষক আনোয়ার হোসেন যুগ

যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী পুরুষ শাসিত সমাজে নারীজাতির প্রতি অবিচার ও ইসলামিক আচার আচরণের নিগূঢ় বন্ধনকে দায়ী করেছেন।[১৪] এক্ষেত্রে প্রাক ইসলাম ও ইসলাম আবির্ভাবের পরবর্তী সময় কালে নারীর অবস্থান জানা প্রয়োজন।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে নারীর অবস্থান জানার পূর্বে আমাদের প্রাক ইসলাম যুগের নারীর অবস্থান জানা প্রয়োজন, কারণ অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানকে জানা ও বোঝা প্রায় অসম্পূর্ণ। জাহেলিয়া যুগে[১৫] নারী মূলতঃ বস্তু হিসেবে গণ্য হত। তার কোনরূপ সামাজিক অধিকার ছিল না। নারী ছিল দাসত্বের প্রতিরূপ অধিকারহীন সম্প্রদায়। যৌবনে তারা ছিল পণ্য ও পিতার অস্থাবর সম্পত্তি, বিবাহের পর স্বামী তার মালিক ও প্রভু।[১৬] জাহিলিয়া যুগে নারীকে পণ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি করা হত,[১৭] তার কোন সামাজিক মূল্য ছিল না। বহুগামীতা ছিল সর্বত্র এবং তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদ ছিল বহুল প্রচলিত। বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত আরব সাম্রাজ্যের এক গোষ্ঠীর নেতা রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের জন্য বহু গোষ্ঠীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হত। একজন পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারত, এমননকি অপহরণ ও বলপূর্বক বিবাহ, ক্রয় পূর্বক বিবাহ এবং চুক্তির মাধ্যমে বিবাহ আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। [১৮]

আরব দেশে একটি বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল তা হল কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া। গবেষক মোহাম্মদ আসাদ মনে করেন, আরব দেশের সর্বত্র কন্যা সন্তানের জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা প্রচলনের দুটি কারণ ছিল, প্রথমতঃ কন্যা সন্তান অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে উঠবে তার ভয় ও দ্বিতীয়তঃ শত্রু গোষ্ঠীর দ্বারা অপহরণের ভয়।[১৯] আরব দেশে বহু বিদ্যজন এই বর্বর প্রথার বিরোধিতা করলেও হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে কন্যা সন্তান হত্যা বন্ধ করেন, তিনি আরববাসীদের প্রতি বলেন কন্যা সন্তানের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।[২০] কোরআনে নির্দেশ আছে ‘kill not your children for fear of want, we shall provide sustenance for them as for you, verily the killing of them is a grave sin’.[২১]

মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) আবির্ভাবের পর নারীর শোচনীয় অবস্থায় অবসান ঘটে। মহানবীর প্রচেষ্টায় নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কতগুলি বিধিবিধান ঘোষণা করেন, যেমন- শর্তসাপেক্ষা বিবাহ ও অস্থায়ী বিবাহ নিষিদ্ধকরণ, আইনের চোখে নারী পুরুষের সমানাধিকার, পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দান, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তথা উপার্জনের অধিকার প্রদান ও শিক্ষার অধিকার দান প্রভৃতি।[২২] বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ, শিশুকন্যা হত্যা নিষিদ্ধ, বিবাহে মেহের প্রবর্তন, নারীর তালাকের অধিকার দান, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটান।[২৩] তা সত্ত্বেও কিছু সমালোচকগন ইসলামে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদেয় বিধানের সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে মুসলিম সমাজ প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক, উত্তরসূরী হিসেবে পুত্র সন্তানেরই প্রাধান্য রয়েছে। ইসলামের চোখে নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন ও শারীরিকভাবে দুর্বল, ধর্মীয় ক্ষেত্রে অপরিপক্ক নৈতিক অনাচারগ্রস্থ,[২৪] নারী জীবনধারণের জন্য সর্বদা পুরুষের উপর নির্ভরশীল।[২৫] ইসলামপূর্ব আরবে এই অবস্থা বর্তমান ছিল, কোন লিঙ্গ সমতা ছিল না, সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। সমাজের সমস্ত প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার কুক্ষিগত ছিল পুরুষের হাতে এবং সমস্ত রকম প্রথা ও ব্যবস্থার দ্বারা নারীর উপর প্রভুত্ব কায়েম করত এমনকি নারীর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারও একমাত্র পুরুষের ছিল। নারীর অবস্থা ছিল ঠিক গবাদি পশুর মত, সে শুধুমাত্র প্রভূর ইচ্ছে পূরণে ব্যস্ত। বিপরীতে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত অবহেলিত হয়ে সারা জীবন অতিবাহিত করত। পিতা ও স্বামীর মৃত্যুর পর যে কেউ তাকে অধিগ্রহণ করতে পারত, প্রভূর বিরাগ ভাজন হলেই অশেষ দুঃখ দুর্দশা তার ভাগ্যে জুটত। এ বিষয়ে ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীগণের বক্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, তাদের মতে নারী শয়তানের উদর হতে সৃষ্ট নিকৃষ্ট জীব, নারীর কাজকর্ম ও প্রার্থনা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তাদের মতে মৃত্যু, আগুন, এমন কি সর্পও নারী অপেক্ষা কম ক্ষতিকর, নারী হল সমাজের মর্যাদাহীন ক্ষত, যাকে জীবন্ত কবর দেওয়া উচিত। তারা আরও বলেছেন নারীর সৃষ্টি পুরুষের সেবা করার জন্য।[২৬] নারীর মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ক এই সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটে

কোরআনের ব্যাখ্যা দ্বারা। ইসলাম তার অনুরাগী নারীদের দুঃখ দুর্দশা সামাজিক, অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করে তাকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান করেছে।[২৭] সূরা আল ইমরানের বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মে নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। Their lord hath accepted their prayer and answered; Never will I suffer the work of any one of you, male or female, to be lost, ye are complementary to each other.[২৮]

ঈশ্বর সৃষ্ট সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মানুষ এবং প্রকৃতির ধারাকে পরিচালিত করার জন্য ঈশ্বর নারী পুরুষ দুজনকেই একই বীজ থেকে সৃষ্টি করেছেন। কোরআনেও একই কথা উল্লেখিত রয়েছে, O Mankind; Fear your Gurdian Lord, Who Created you from a single person, Created of like nature his mate and from the twain scattered (like seeds) countless men and women.[২৯] গবেষক নাসিম আহমেদ মনে করেন বিশ্বে নারী পুরুষের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে তা আসলে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। সমগ্র মনুষ্যজাতি একই মানব আত্মা হতে উদ্বুদ্ধ, উভয়ই সমান, কেউ উচ্চ বা নীচ নয়, সকলেই সমান ও সমমর্যাদা সম্পন্ন অবস্থান দখল করে আছে। পরিবার, শ্রেণী, জাতি, বর্ণ, পেশাগত, বাসস্থান ভেদে, যে নারী পুরুষের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে তা ভিত্তিহীন, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান।[৩০] পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অধিকার মৌলবী উলেমাদের হাতে ন্যস্ত। তারা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ইসলামিক গবেষক পিকথাল বলেছেন, Islam brought with it a message of equality and liberty to the entire women of the world.[৩১] সমাজের পুরুষরা একতরফা তালাক, সম্পত্তির অসম বন্টনের দ্বারা নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সমাজে ভিন্নতা সৃষ্টি করে, যা ইসলাম মান্যতা দেয় না। কোরআনে উল্লেখ রয়েছে Women have the rights similar to the rights against them, according to what is equitable.[৩২] ইসলামিক গবেষক জালালুদ্দিন উমারি বলেছেন নারী পুরুষের ভিন্নতা সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, কেউ উচ্চ বা নীচ নয়, উভয়েই সমান ও সমমর্যাদা সম্পন্ন।[৩৩] আল কুরআনের একটি আয়াতে নারী

পুরুষের সমতা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে, They (Women) are vestment (garments) for you (men) are a vestment (garments) for them.[৩৪]

নারীর অবস্থার উন্নতি কল্পে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রাক ইসলাম পর্বে প্রচলিত বহু সামাজিক প্রথার অবসান ঘটান। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। আমরা মনে করি যে নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে বিংশ শতকে, আসলে ইসলামিক মতে নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে সপ্তম শতকে হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর হাত ধরে কোরআন ও হাদিসের আলোকে মুসলিম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্ম নারীকে তার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে, সে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক যেকোনো বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, এমনকি নারীকে তার বিবাহের পাত্র নির্বাচনের স্বাধীনতাও ইসলাম প্রদান করেছে। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলাম ধর্ম নারী পুরুষ উভয়কেই সমান অধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক পুরুষতান্ত্রিক হয়ে ওঠে এবং নারী তার অধিকার গুলি হারাতে শুরু করে। কোরআন দ্বারা নির্দেশিত অধিকার গুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে নারী চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেকে ভালো স্ত্রী, ভালো কন্যা হিসেবে প্রকাশ করে পরিবারে নিজের স্থান করে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। সমাজবিদ আসগার আলী ইঞ্জিনিয়ার এর মতে ধর্মীয় ঐতিহ্য গুলি যা নারীকে আবদ্ধ করে তা কোরআন থেকে উদ্বুদ্ধ এবং এই ধর্মীয় ঐতিহ্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সমতা প্রদান করেছে, যা প্রকৃতপক্ষে নারী মুক্তি আন্দোলনের সহায়ক।[৩৫]

বহির্জগতে নারীর চলাফেরায় ইসলাম কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। পর্দা প্রথার দ্বারা ইসলাম ধর্ম নারীর বহির্জগতে মেলামেশায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই সমাজ ও পরিবারের উন্নতির জন্য নারীর বহির্জগতে গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় নারীর শিক্ষা গ্রহণ, কাজে যোগদান বা কোনো প্রতিষ্ঠানের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে

রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করে। সেই জন্যই মুসলিম নারীর মধ্যে অশিক্ষা, দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিদ্যালয় স্তরে কম নাম নথিভুক্তকরণ দেখা যায়।[৩৬]

ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার সমূহঃ

ইসলাম ধর্ম নারীদের বহু অধিকার প্রদান করেছে, যার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো সম্পত্তির অধিকার ও মেহের প্রাপ্তির অধিকার, যা অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না। এই অধিকারসমূহ নারী বহু বছর আগেই পেয়েছে, বর্তমানে কোন আইন দ্বারা তা কার্যকরী হয়নি। কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ধর্মীয় চিন্তাবিদগণ ইসলাম প্রদত্ত অধিকার গুলি থেকে নারীকে বঞ্চিত করেছে। ইসলাম ধর্ম নারীর অধিকার গুলিকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেছে শরীয়ত দ্বারা, কোন মনুষ্য সৃষ্ট আইন দ্বারা সেগুলি প্রযোজ্য হয়নি।[৩৭] তবে বর্তমানে নারী তার অধিকার গুলি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সংগঠন গঠন করেছে। বিশ্বের সর্বত্র নারীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পূর্বে ইসলামিক সাম্রাজ্যে নারীরা কোন সমস্যায় পড়লে হযরত মুহাম্মদ(সা;) কাছে গিয়ে তারা আবেদন করতে পারত, কিন্তু এখন নারী নিজেদের সমস্যার সমাধান, নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করেছে।

ইসলাম ধর্ম নারীর শিক্ষা গ্রহণ এবং চাকরিতে যোগদান বা ব্যবসা-বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে যোগদান এর অধিকার দিয়েছে। ইসলামিক সভ্যতার প্রাক্কালে নারী পুরুষের সাথে গৃহের বাইরে কাজকর্মে যোগদান করত এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত। মুসলিম নারীর নিজেদের স্বামী নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। বিবাহে নারীর মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামিক আইন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। বিবাহের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে মেহের প্রদান করে যা শুধুমাত্র স্ত্রীর সম্পত্তি। বিবাহের পরও নারী নিজের নাম অপরিবর্তিত রাখে, ইসলাম নারীকে বিবাহ বিচ্ছেদেরও (খুলা) অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম নারীদের উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার প্রদান করেছে, যা শরীয়ত দ্বারা নির্ধারিত। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে মুসলিম

নারী পুরুষের প্রাপ্ত অংশের অর্ধেক অংশ পাবে, যেহেতু নারী অর্থনৈতিক দায় দায়িত্ব পুরুষ অপেক্ষা কম, ইসলামিক আইন অনুযায়ী স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন পুরুষের।[৩৮] গবেষক আহমেদ বলেছেন ইসলাম গৃহ ও গৃহের বাইরে নারী ও পুরুষের কাজের পৃথকীকরণ করেছে। ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে না বরং ইসলাম নারীকে কাজের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধের সহিত মান্যতা দিয়েছে।[৩৯] তবে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় পারিবারিক দায়-দায়িত্ব নারীর অর্থনৈতিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। তাই ইসলাম এই সমস্যার সমাধান করে নারীর যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করেছে। ইসলামে নারীকে গৃহের রানী বলে উল্লেখ করেছে এবং নিজের ভরণ পোষণের জন্য কোনরকম চিন্তাভাবনার অবকাশ রাখতে বারণ করেছে। মুসলিম নারী নিজের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের সাথে সাথে নারী যে কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে। ইসলাম অনুমতি দিয়েছে স্বামী যদি অক্ষম হয়, তাহলে নারী পরিবার সন্তানের ভরণপোষণের জন্য গৃহের বাইরে বেরিয়ে যেকোনো কাজে যোগ দিতে পারবে।

ইসলাম ধর্ম নারীকে পিতার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার স্বীকৃতি দিয়েছে। কুরআনে উল্লেখিত আছে একজন নারী সম্পত্তির ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা অর্ধেক অংশ ভোগ করবে। প্রাক ইসলাম যুগের আরবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী সমস্ত রকম অধিকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। নারীরা শুধুমাত্র উত্তরাধিকার শর্ত থেকে বঞ্চিত হত তাই নয় অন্যান্য সামাজিক আইন ও আদেশ থেকেও বঞ্চিত হত। ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভের সাথে সাথে পুরানো প্রথা গুলি বদলে যেতে থাকে। কোরআনে ঘোষিত আছে পিতা-মাতা দ্বারা রক্ষিত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী পুত্র কন্যা উভয়েই। লেডি ডক কলেজের অধ্যক্ষ নির্মলা জয়রাজ তার এক বক্তৃতায় একই মত পোষণ করে বলেছেন, ইসলামিক শরীয়ত বিবাহ পূর্ব বা পরবর্তী উভয় অবস্থাতেই নারীকে সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।[৪০] মুসলিম নারীদের উপার্জনের, সম্পত্তির অধিকার, নিজের সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার জন্য সব রকমের আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার পেয়েছে। কিন্তু

ইসলাম ধর্ম নারীর সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য এতসব অধিকার প্রদান করলেও পরবর্তীকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চাপে নারী ধীরে ধীরে তার সব অধিকার গুলি থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কমতে শুরু করে, পর্দা প্রথার কঠোরতা, কাজের যোগদানের সুযোগ কমতে থাকার ফলে সামাজিক কাজকর্মে নারীর উপস্থিতি কম হতে থাকে। হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পরবর্তীকালে কোরআনের ব্যাখ্যা বিভিন্ন হওয়ার ফলে, বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলিম জনগণের আবির্ভাব ঘটে যার ফলে মুসলিম নারীর জীবনেও বহু মতামত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। মধ্যযুগে ভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সামাজিক আইনের প্রভাবে মুসলিম নারীরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষার অধিকার, উপার্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নারী শরীয়ত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয় এবং সামাজিক প্রথা ও পুরুষদের দ্বারা তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ভারতের মুসলিম মেয়েরা এমনভাবে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার শিকার, কখনো নিজের সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেতে বা নিজের জায়গা সুস্থির করার জন্য সংগ্রাম করারও সাহস দেখায়নি। কোরানে নারীর অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা গুলির উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তার রূপায়ণ দেখা যায় না। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা করে নারীদের বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে।

ভারত তথা বাংলার মুসলিম সমাজ ও নারীর অবস্থানঃ

৭১২ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাসেমের হাত ধরে ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রবেশের পর থেকে ভারতের সর্বত্র ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়তে থাকে, কিন্তু বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে অনেক পরে ত্রয়োদশ শতকে এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির হাত ধরে। ধীরে ধীরে নবদ্বীপ সহ সমগ্র নদীয়া, কর্ণসুবর্ণ, দেবকোট, বর্ধনকোট, তিব্বত বখতিয়ার খলজির হস্তগত হয়। পরবর্তী মুসলিম শাসকদের শাসনকালে বাংলা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, স্থাপত্য, ভাস্কর্য সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধি লাভ করে। এই সময় জনসাধারণ কখনও তরবারির জোরে, কখনও শাসন ক্ষমতা লাভের আশায় আবার কখনো নিজ ধর্মে

বৈষম্যের শিকার হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। মুসলিম শাসনকালে ইসলাম ধর্ম গৌরব অর্জন করলেও ব্রিটিশদের আগমনের সাথে সাথেই তার জৌলুস হারাতে থাকে, শাসন ক্ষমতা ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রসারিত হতে থাকে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে মুসলিম জনসাধারণ অবজ্ঞা ও বঞ্চনার শিকার হয়। ব্রিটিশদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতির সাথে তাল মিলাতে না পেরে মুসলিমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। মুসলিম সমাজের এই পশ্চাৎপদতার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় নারীর জীবনে। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারী যেখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে রাস্ট্রচলনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বুদ্ধিমত্তার শীর্ষে পৌঁছে ছিল সেখানে মধ্যযুগের শেষের দিকে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের চার দেয়ালে কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের আগমনের পর ভারত তথা বাংলার মুসলিম সমাজ ধর্মকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে শুরু করে, আধুনিক শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে নারী হয়ে যায় অন্দরমহলের বাসিন্দা। [৪১]

বাংলা বা বঙ্গ প্রদেশের মুসলিমরা মূলত ধর্মান্তরিত ও অভিবাসী মুসলিম। ঐতিহাসিক মহঃ মোহর আলী মন্তব্য করেছেন অধিকাংশ মুসলিম ভিনদেশ যেমন আরব, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, এশিয়া মাইনর, তুর্কি থেকে আগত খাজা, হানি, মির্জা, সৈয়দ পদাধিকারী মুসলমান।[৪২] ১৩ শতকের প্রথম থেকে বাংলায় দুশতক ব্যাপী সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে যেমন উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, কুচবিহার প্রভৃতি এলাকায় সুফি উলেমা কাজী মুফতি ইসলাম ধর্ম প্রচার করে এবং এগুলি পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে বিশেষ পরিচিত। কাজী, মুফতি, সুফি, সাধক, উলেমাদের দ্বারা সহজ সরল ভাষায় প্রচারিত ধর্মীয় বাণী হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্মের লোকেদের আকৃষ্ট করে। গবেষক আব্দুল করিম বাংলায় হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম ধর্মের দীক্ষিত হওয়ার পেছনে বহিরাগতদের পাশাপাশি মুসলিম শাসক উলেমা ও সুফি সাধকদের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[৪৩] নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা যেমন বৈশ্য, কোচ, ম্লেচ্ছ প্রমুখ ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিভেদ প্রথার

কঠোরতায় অতিষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, আবার কেউ কেউ মুসলিম শাসকদের অধীনে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এই ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া মূলত সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই বিদ্যমান ছিল। বাংলায় মুসলিমরা সাধারণত আশরাফ ও আতরাফ এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আশরাফরা সাধারণত উচ্চ বংশজাত যেমন সৈয়দ শেখ মুঘল পাঠান প্রমুখ এবং আতরাফ হল নিম্ন বংশজাত যেমন দর্জি, জেলে, জোলা, তাঁতি ইত্যাদি শ্রমজীবী শ্রেণীভুক্ত, মুসলিম সমাজের এই শ্রেনী বিভাজন মালদা জেলাতেও দেখতে পাওয়া যায়। এই আশরাফরা সর্বদাই আতরাফদের অবজ্ঞার চোখে দেখত, ফলে মুসলিম সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়।

ব্রিটিশদের আগমনের ফলে ভারত তথা বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে ধর্মীয় শিক্ষাকে কার্যত বেশি আপন করে। ফলে ইসলাম ধর্মের মধ্যে প্রচুর কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সামাজিক কুসংস্কার গুলি থেকে ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণের জন্য ওয়াহাবি ও ফরাজী এবং আলীগড় আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে বলে চন্ডীপ্রসাদ সরকার মনে করেন।[৪৪] তিনি আরও বলেন সে সময় মুসলিম সমাজের উন্নতি, রুজি রোজগার ও অর্থনৈতিক দাক্ষিণের জন্য যেমন ইংরেজি শিক্ষা অনিবার্য ছিল তেমনি ইংরেজি শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষাকে তুচ্ছ করবে এই আশঙ্কায় আশরাফ সম্প্রদায়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক সৃষ্টি হয়।[৪৫] যার ফলশ্রুতি হল সমসাময়িক পত্রপত্রিকা যেমন সুধাকর, কহিনুর, হাফেজ, হিতকারি, ইসলাম লহোরী, ইসলাম প্রচারক প্রমুখ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে। ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের পশ্চাৎবর্তিতা জন্য মুসলিম পরিবারগুলির প্রধানদের চন্ডীপ্রসাদ সরকার দায়ী করেছেন। তাদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও দূরদর্শিতার অভাব এর জন্য মুসলিম সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনাই পিছিয়ে রয়েছে।[৪৬] ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার এ বিষয়ে লিখেছেন the existing education system to be unsuited to the requirements and

hateful to the religion of the muslim.[৪৭] সেই সময় এমনকি বাংলা ভাষার প্রতিও পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের প্রবল অনীহা ছিল, যদিও বা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায়ই ৯৫ ভাগ মুসলমান বাংলা ভাষায় কথা বলত আর অবশিষ্ট মুসলমানরা উর্দু ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তথাপি বাংলার মুসলমানদের বাঙালি মুসলমান হতে অনেক দিন সময় লেগে যায়।[৪৮] উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানরা (আশরাফ, আতরাফ, শিয়া, সুন্নি, হানাফী, মুহাম্মদী প্রভৃতি) ধর্মীয় অন্তর বিরোধের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতাদর্শ ও আচরণের সাথে ইসলামের বাইরের বিরোধ দেখা দিয়েছিল।[৪৯] এরূপ ধর্মীয় সামাজিক পরিবেশে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের নারী ও বিশেষত মুসলিম নারীর অবস্থা কেমন ছিল তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থা মোটেই সুখকর ছিল না। কন্যা সন্তান অনভিপ্রেত ছিল, পুত্র সন্তান সর্বদাই কাম্য ছিল। গৃহই ছিল নারীর একমাত্র জগৎ, অন্তঃপুরের বন্দিনী নারীর অধিকাংশ সময় পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততীর সেবায় নিয়োজিত ছিল। তার আর্থ- সামাজিক অবস্থা, ব্যক্তিগত অনুভূতি সবটাই পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, পর্দাপ্রথার কঠোরতা ও গৃহে অবরুদ্ধ থাকার ফলে নারী বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হত। প্রাক বিবাহ পর্ব থেকেই মেয়েদের কঠোর পর্দার অনুশাসন মেনে চলতে হত। অভিজাত পরিবারগুলিতে পর্দা প্রথার কঠোরতা ছিল অত্যধিক। ধনী পরিবারের মেয়েদের অন্তঃপুরে অবসর সময় কাটত গল্প গুজব করে, গান-বাজনা শুনে, সেলাই ফর করে, ধর্মগ্রন্থ বা পুঁথি পাঠ করে।[৫০] তবে দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়েদের গৃহের বাইরে জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠোরভাবে পর্দা প্রথা পালন করা সম্ভব ছিল না। গবেষক গোলাম মুর্শিদ লিখেছেন অভিজাত পরিবারের মেয়েরা কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলতে বাধ্য হত, ফলে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে থাকত।[৫১] নারীরা ছিল নিজ গৃহেই পরবাসী।

তৎকালীন মুসলিম সমাজে বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, তালাক ইত্যাদি ছিল ইসলাম ধর্ম কেন্দ্রিক প্রচলিত। মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ঠিক না থাকায় বাল্য অবস্থাতে তাদের

বিবাহের ব্যবস্থা করা হত, যা কার্যত অভিভাবকদের অনুমতি ও সিদ্ধান্তে সংঘটিত হত। এই বিষয়ে ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার লিখেছেন Both among Mohammadans and Hindus, both are generally married at 10 and have no choice. The parents arrange the match if possible in their own villege.[৫২] প্রাক ইসলাম যুগ থেকেই বাল্যবিবাহের মতো বহুবিবাহ মুসলিম সমাজে বিদ্যমান। একটি পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করতে পারে। ১৯৩৭ সালের মুসলিম পার্সোনাল ল' বা শরীয়ত আইন কার্যকর হলে কোন ব্যক্তি সর্বাধিক চারটি বিবাহকে স্বীকৃতি দেয়। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আছে একজন ব্যক্তি তার রুচিসম্মতভাবে সর্বাধিক চারটি নারীর পানি গ্রহণ করতে পারবে, তবে প্রত্যেকের প্রতি সমদৃষ্টি ও ন্যায় বিচার করতে হবে।[৫৩] উপনিবেশিক সময়কালে বহুবিবাহ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই এক রকম প্রথা রয়েছে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাঙালি মুসলিম সমাজে বিধবাদের পুনরায় বিবাহের জন্য কোন আন্দোলন দেখা দেয়নি কারন ইসলাম ধর্মে বিধবাদের পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় বাধা নেই। তথাপি উপনিবেশিক সময়কালে অভিজাত ধনী মুসলিম পরিবার গুলিতে বিধবা বিবাহ লজ্জাজনক ও ঘৃণ্য কাজ বলে প্রতিপন্ন হত। বিধবা বিবাহ মুসলিম সমাজে খুব বেশি প্রচলিত না হলেও বাল্যবিবাহ ছিল বহুল প্রচলিত, যা বর্তমানেও বিদ্যমান। কম বয়সী মেয়েদের সাথে একজন বয়স্ক লোকের বিবাহ দেওয়া হত, ফলে বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম সমাজে মেয়েদের বোঝা রূপে মনে করা হত, তারা অন্যের সম্পদ রূপে পিতার গৃহে বসবাস করত, বিবাহের সম্বন্ধ এলে তা সে যে বয়স্ক পাত্রই হোক না কেন তার বিবাহ দেওয়া হত। সাধারণত ৫-৬ বছর বয়স থেকে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। কম বয়সে মা হওয়ার ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্যহানীর আশঙ্খা থাকে, এর সাথে যুক্ত হয় তিন তালাক প্রথা যা একজন মুসলিম নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। একজন পুরুষ নির্দ্বিধায় যে কোন তুচ্ছ কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, যা ইসলাম,

কোরআন ও হাদীস বিরোধী।[৫৪] তালাকের ফলে একজন নারী তার স্বামী গৃহে কুক্ষিগত হয়ে থাকে, নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলি প্রকাশ করার সাহস পায় না।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি হিন্দু সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে, নারীমুক্তি ও কল্যাণের জন্য আন্দোলন শুরু হলেও বাঙালি মুসলিম সমাজকে তখনও ধর্মীয় গোড়ামী ও অন্ধকারের বেড়াজালে নারীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন বিধি নিষেধ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কতিপয় বাঙালি মুসলিম ভদ্রলোকেরা নারী শিক্ষার প্রতি অনিহা প্রকাশ করে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য কোন প্রচেষ্টা করেনি। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে কিছু মুসলিম ভদ্রলোক ও বুদ্ধিজীবীরা নারী মুক্তির কথা ভাবতে শুরু করে তার মধ্যে অন্যতম হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তার প্রকাশিত মতিচুর, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন পত্রিকা মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার ও সামাজিক অবস্থান আদায়ের দলিল।[৫৫] সমাজে প্রচলিত পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ শুরু করেন বেকম রোকেয়া। পর্দা প্রথার পাশাপাশি স্ত্রীর শিক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেন, এই উদ্দেশ্যে শাখাওয়াত গার্লস মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপন করেন। অপরদিকে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা গুলি দূর করার জন্য আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ইসলাম নামে মুসলিম মহিলা সমিতির স্থাপন করেন ১৯১৫ সালে। নারী শিক্ষা সমিতির ভাষনে তিনি সমাজের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরেন যে, সমাজের অর্ধেক হচ্ছে নারী, সেই নারী যদি পশ্চাৎপদ হয় সেক্ষেত্রে সমাজ কি অগ্রসর হতে পারে?[৫৬] বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন মুসলমান সমাজে দৈন দুর্দশার জন্য দায়ী স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অবহেলা। গবেষক আব্দুর রফিকও মনে করেন ইসলামিক ধর্মীয় নির্দেশ অমান্য করে মুসলিম নারীকে অবহেলা ও ঘৃণা করার জন্য এদেশে ইসলামের এরূপ অবস্থা।[৫৭]

স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও নারীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, পুরুষ শাসিত সমাজে তারা সর্ব ক্ষেত্রেই বঞ্চিত। মুসলিম মহিলারা হলেন সমগ্র ভারতের সবথেকে অনগ্রসর শ্রেণী।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম মহিলারা ইসলাম ধর্ম নির্ধারিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক সমতা থেকে বঞ্চিত। স্বাধীনোত্তর ভারতের সংবিধানে প্রত্যেক জনগণকে সমতা প্রদান করলেও কার্যক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। তাই গবেষক কে এন জাহাঙ্গীর বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্যদের তুলনায় মুসলিম মহিলারা সাংবিধানিক নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ।[৫৮] একজন নারীর সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, গৃহের বাইরে কাজে অংশগ্রহণ, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দ্বারা, কিন্তু মুসলিম নারী অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিবারের পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। মুসলিম সম্প্রদায় পুরুষের বহুবিবাহ, বারংবার নারীর সন্তান প্রসবের ফলে সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাস্থ্যহানীও ঘটছে। স্বাধীনোত্তর অন্যান্য সম্প্রদায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলেও মুসলিম জনগণের ধর্মীয় গোঁড়ামি, অশিক্ষা ও বাল্য বিবাহের কারণে তা অসম্ভব। সাধারণ মুসলিম নারী সম্প্রদায় নারী আন্দোলনের ধারা থেকে দূরে অবস্থান করায় রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা, শিক্ষার অভাব, পর্দা প্রথা, জাতীয় আন্দোলনে হিন্দুত্ববাদী প্রভাব, মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি, নারী সমাজকে সংগঠিত করতে উদার ও যুক্তিবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা, উপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের নীতি প্রভৃতি বাঙালি মুসলিম সমাজের সংগঠিত নারী আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে অন্তরায় ছিল।

মুসলিম নারীরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীদের মতোই একই ভারতীয় সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবেশে বিভিন্ন উপসম্প্রদায়, সামাজিক গোষ্ঠী, ভাষাগত ও সংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও শিক্ষাগত স্তরে এবং লিঙ্গ পরিবার ও সমাজে ক্রীড়া প্রতিক্রিয়া করে অবস্থান করে। গবেষক হাসান ও মেনন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থে দেখিয়েছেন বহুবিবাহ, তিন তালাক, পর্দাপ্রথা মুসলিম নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, যার থেকে উদ্ধার পাওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা ভারতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর তুলনায় দরিদ্র ও সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত একশ্রেণী। মুসলিম নারীরা একাধারে নিজ সম্প্রদায়ের সবথেকে নিম্নে অবস্থিত আবার অপরদিকে শরীয়ত মতে নিজের অধিকার, সম্পত্তি ও লিঙ্গ ভেদে সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত এক স্বাধীন শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত।[৫৯] কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় মুসলিম নারীদের জন্য

অভিযান সংগ্রাম করা হচ্ছে এবং মুসলিম নারীর সমস্যার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে, বিশেষ করে মুসলিম পার্সোনাল ল' ও তার নারীর অধিকারের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্য প্রশ্ন তোলা হয়। নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্থানীয় বিষয়গুলি অপেক্ষা যে বিষয়গুলি নিয়ে আরও প্রশ্ন ওঠে তা হল নাগরিক হিসেবে নারীর আইনি অধিকারসমূহ কিভাবে মুসলিম পার্সোনাল ল' রক্ষা করছে? তাই সনাতনী থেকে আধুনিকতাই উত্তরণের পথে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমতার প্রশ্নটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধর্মীয় কারণে মুসলিম নারীরা নতুন সংস্কারগুলিকে খুব ধীরে গ্রহণ করেছে। ভারতে মুসলিম নারীদের জীবন বিভিন্ন সমাজবিদ ও নারীবাদী কর্তৃক বিভিন্ন ঘটনাবলী ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন ইসলামিক আইন বিধি যা মাঝে মাঝে ভুল বর্ণিত ও পরিবেশিত হয় মুসলিম সমাজে অমুসলিম কার্যকলাপের সংমিশ্রণ, ধর্মীয় আধুনিক শিক্ষার অভাব, সংস্কৃতি প্রভৃতি।[৬০] ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা হলো পিতৃতান্ত্রিক যেখানে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি সাংস্কৃতিক জীবনও পুরুষ সদস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মুসলিম সমাজ ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সম্পদের সম্পূর্ণ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র থাকে পুরুষ সদস্যদের হাতে, সেখানে নারীর মতামতের কোন মূল্য থাকে না। এ বিষয়ে সমাজবিদ আসগার আলী ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থার উন্নতি হলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থা তেমন কোন উন্নতি হয়নি, তারা এখনো জীবন নির্বাহের জন্য পুরুষ সদস্যের উপর নির্ভরশীল।[৬১] ধর্মীয় ব্যাখ্যা কর্তাকারীরা নারীর ধর্মীয় অধিকার গুলিকে মান্যতা দেয় না, অথচ ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ কুরআনের ৩৩:৩৫ আয়াতে (শ্লোক) নারী পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।[৬২] ধর্মীয় নেতারা কোরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে ভুল তথ্য পরিবেশন করেন এবং সমাজে পুরুষের মহত্ব জাহির করেন। ইঞ্জিনিয়ার আরও বলেছেন ধর্মীয় আইনের দ্বারা নারীরা যতনা লাঞ্ছিত বঞ্চিত হয়েছে তার থেকে বেশি মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মের ব্যাখ্যাকারীদের ভুল ব্যাখ্যার দ্বারা বঞ্চিত

হয়েছে, তাই সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন।[৬৩]

নারীর উন্নয়নের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আইনত বহু উদ্যোগ স্বাধীন ভারত সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা এই নারীর উন্নতি ব্যতীত দেশের স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ভারতের সংবিধানে নারীকে কতগুলি মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আর্টিকেল ১৪ তে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে, আর্টিকেল ১৫তে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ জন্মস্থান ভেদে সকলকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে, একই চাকরিতে সমবেতনের দাবিতে ইকুয়াল রেমুনারেশন অ্যাক্ট ১৯৭৬ পাশ করা হয়, গৃহ নির্যাতন থেকে নারীকে রক্ষার জন্য প্রটেকশন অফ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট ২০০5 পাশ করা হয়। নারীর নিরাপত্তা রক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য বহু আইন পাস করা হয় যেমন- দ্য চাইল্ড ম্যারেজ রিস্তেইন অ্যাক্ট কমন টু অল ১৯২৯, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড বা শরীয়তী আইন ১৯৩৯, দ্য ডিসসলিউশন অফ মুসলিম মেরেজ অ্যাক্ট ১৯৩৯, দ্যা মুসলিম উইমেন প্রটেকশন অফ রাইটস অন ডিভোর্স অ্যাক্ট ১৯৮৬। কিন্তু আইন ও বাস্তবের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে, এর কারণ হলো অশিক্ষা ও অসচেতনতা। মোট নারী জনসংখ্যা ২০০১ সালে ৪৫.৮৪ শতাংশ ও ২০১১ জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৪ শতাংশ নারী অশিক্ষিত এবং অধিকাংশ নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই বলা যায় প্রকৃত নারী মুক্তি বা নারী সমাজের উন্নতির জন্য পুরুষদের এগিয়ে আসতে হবে তা না হলে সমগ্র সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।

ভারত তথা বাংলার মুসলিম জনঘনত্বঃ

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রথম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হলো মুসলিম, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পরেই এর অবস্থান। ২০১১ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের মোট

জনসংখ্যার ১৪.৯ শতাংশ হল মুসলিম জনগন। তবে এই মুসলিম জনসংখ্যা বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে যা নিম্নের সারণিতে পরিলক্ষিত হয়।

সারণি ১

ভারতের সম্প্রদায়ভেদে জনসংখ্যার পরিসংখ্যায়ন (১৯৫১-২০১১)

ধর্মীয় সম্প্রদায়	জনসংখ্যা						
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিন্দু	৮৪.১	৮৩.৪৫	৮২.৭৩	৮২.৩০	৮১.৫৩	৮০.৪৬	৭৮.৩৫
মুসলিম	৯.৮০	১০.৬৯	১১.২১	১১.৭৫	১২.৬১	১৩.৪৩	১৪.২
খ্রিস্টান	২.০০	২.৪৪	২.৬০	২.৪৪	২.৩২	২.৩৪	২.৩৪
শিখ	১.৮৯	১.৭৯	১.৮৯	১.৯২	১.৯৪	১.৮৭	১.৮৭
বৌদ্ধ	০.৭৪	০.৭৪	০.৭০	০.৭০	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭
জৈন	০.৪৬	০.৪৬	০.৪৮	০.৪৭	০.৪০	০.৪১	০.৪১
পার্শি	০.১৩	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৮	০.০৬	০.০৬
অন্যান্য	০.৪৩	০.৪৩	০.৪১	০.৪২	০.৪৪	০.৭২	০.৭২

উৎসঃ আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় সেন্সাস রিপোর্ট, ভারত, ২০১১।

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত বিভাজনের সাথে সাথে বাংলা প্রদেশের বিভাজন মুসলিম নারীর জনঘনত্বের ধারাকে প্রভাবিত করে। মুসলিম নারীর জনসংখ্যা উচ্চে থাকলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তারা পশ্চিমবঙ্গে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে ও পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এ স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অবিভক্ত ভারতের প্রথম সেনসাস ১৮৭২ অনুযায়ী অবিভক্ত বাংলার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১,৭৬,০৯,১৩৫ জন ও হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১,৮১,০০,৪৩৮ জন, কিন্তু তার পরবর্তীকালে মুসলিম জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট

অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৩,৩৩,৭১,৬৮৮ ও হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২,৫৮,০১,৭২৪ জন। অতএব এটি প্রমাণিত যে প্রথম সেনসাসের পরবর্তীকালে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যাকেও ঝাঁপিয়ে যাচ্ছে এবং অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা থেকে বহু গুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি বৃহৎ সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।

সারণি ২

অবিভক্ত বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যার পরিসংখ্যায়ন (১৮৭২-২০১১)

অবিভক্ত বাংলা

সেন্সাস বছর	মুসলিম জনসংখ্যা	হিন্দু জনসংখ্যা
১৮৭২	১,৭৬,০৯,১৩৬	১,৮১,০০,৪৩৮
১৮৮১	১,৭৮,৬৩,৪১১	১,৭২,৫৪,১২০
১৮৯১	১,৯৫,৮২,৩৪৯	১,৮০,৬৮,৬৫৫
১৯০১	২,১৯,৪৭,৯৪১	২,০১,৫০,৫৪১
১৯২১	২,৫৪,৮৬,১২৪	২,০৮,০৯,১৪৮
১৯৩১	২,৭৮,১০,১০০	২,২২,১২,০৬৯
১৯৪১	৩,৩৩,৭১,৬৮৮	২,৫৮,০১,৭২৪

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ

সেন্সাস বছর	মুসলিম জনসংখ্যা	হিন্দু জনসংখ্যা
১৯৫১	৪৯,২৫,৪৯৬	১,৯৪,৬২,৭০৬
১৯৬১	৬৯,৮৫,২৮৭	২,৭৫,২৩,৩৫৮
১৯৭১	৯০,৬৪,৩৩৮	৩,৪৬,১১,৮৬৪
১৯৮১	১,১৭,৪৩,২৫৯	৪,২০,০৭,১৫৯
১৯৯১	১,৬০,৭৫,৮৩৬	৫,০৮,৬৬,৬২৪
২০০১	২,০২,৪০,৫৪৩	৫,৮১,০৪,৮৩৫
২০১১	২,৪৬,৫৪,৮২৫	৬,৫৫,৫৬,১১০

উৎসঃ বাংলার আদমশুমারি রিপোর্ট ১৮৭২-১৯৪১, ভারতের আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৫১-২০১১, ভারত।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম জনগণ জীবনের নিরাপত্তার খাতিরে পার্শ্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশে) চলে যায়। ঠিক সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থিত বৃহৎ সংখ্যক হিন্দু জনগণ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে, ফলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় পরিণত হয় এবং মুসলিম জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় বহু গুণ কমে যায়। উপরোক্ত সারণির দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ১৯৫১ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৯,২৫,৪৯৬ জন, যা ১৯৪১ থেকে বহুগুণ কমে যায়। ২০১১ সালের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২,৪৬,৫৪,৮২৫ (২৭.০১ শতাংশ) জন।

মুসলিম নারী জনসংখ্যাও একই ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ১৮৭২ এর সেন্সাস অনুযায়ী এই সম্প্রদায়ের নারীর সংখ্যা ছিল ৮৭,৩৩,৫৬২ জন, ১৯৪১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী মুসলিম নারীর সংখ্যা ছিল ১৫,৯৯,৬০৪ জন। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অস্বাভাবিক হারে এই পরিসংখ্যান কমতে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালের প্রথম আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী এই মুসলিম নারীর সংখ্যা হয় ২৩,১৫,০৮০ জন এবং প্রায় অর্ধশতক এর মধ্যে এই জনসংখ্যা আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০১ এর সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই পরিসংখ্যান বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, ২০০১ এর সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিম নারী সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মোট নারীর সংখ্যার প্রায় ৪৭.৩৫ শতাংশ হয়ে যায়। ভারত বিভক্তি পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারী পরিসংখ্যান বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাঃ

ভারতবর্ষের মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা অনেক কম ছিল (১৯.৮৫ শতাংশ), কিন্তু জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধি, অশিক্ষা, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতির ফলে মুসলিম

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যা ১৫.৮৫ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে তারা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৭.০১ শতাংশ। যে হারে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুলনায় অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত জেলা গুলি হল মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হাওড়া, বীরভূম। এর মধ্যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ হল সবথেকে বেশি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। এর পেছনে ঐতিহাসিক পটভূমি বিশেষভাবে কার্যকরী, অধিকাংশ মুসলিম রাজরাজনরা মালদা ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করে, সুতরাং তাদের আত্মীয়-স্বজন, সেনাবাহিনী, অনুগামীরা বংশ পরম্পরায় সেই সব জায়গায় বসতি স্থাপন করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে অবস্থিত জেলাগুলিতে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধির আরও একটি কারণ হলো স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বহু মুসলিম জনগণ কাজের সুযোগ, চাকরির সুযোগ, রাজনৈতিক কারণে, ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভের জন্য বাংলায় আসতে থাকে। আলোচ্য গবেষণায় মালদা জেলার মুসলিম নারীর জীবন ও আর্থসামাজিক অবস্থানের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, তার পূর্বে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীর আর্থসামাজিক অবস্থানের প্রতি আলোকপাত করা যাক।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনঃ

সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীরা এক বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। মুসলিম নারীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি সময় শরীয়তী আইন কানুন মেনে চলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম পরিবারগুলিতে দেখা যায় কন্যা সন্তানকে দায়ভার হিসেবে গণ্য করা হয় ও কন্যা সন্তান কোনভাবেই অভিপ্রেত নয়। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে জন্মযাত্রীর মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। এমনকি দরিদ্র পরিবার গুলিতে কন্যা সন্তানের সাথে বিভেদ মূলক আচরণ করা হয় এবং পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়ার ফলে অপুষ্টির ও শিকার হয়। অধিকাংশ মুসলিম পরিবারগুলিতে কন্যা সন্তান অসুস্থ হলে তারা ডাক্তারের কাছে না গিয়ে মৌলানা মৌলভী পীর দরবেশের কাছে ভিড় জমায়, এই প্রক্রিয়া বর্তমানে ও প্রচলিত।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম পরিবারগুলি অবিবাহিত নারীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয় না। এছাড়াও মুসলিম পরিবারগুলি চাই না যে মুসলিম মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হবে বা নারী অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসর হবে। দরিদ্র পরিবারগুলোতে কন্যা সন্তানের বিবাহে তার অনুমতি নেওয়া হয় না এবং বাল্যবিবাহের প্রবণতাও বেশি। মুসলিম পরিবারগুলিতে যেহেতু কন্যা সন্তান অনভিপ্রেত তাই কন্যার আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সূচক গুলি যেমন শিক্ষা, পুষ্টিকর খাবার, গৃহের বাইরে কাজকর্ম, নতুন জামা কাপড় পরিধান প্রভৃতি থেকে তারা বঞ্চিত এবং পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিভাবকরা মনে করেন মেয়েরা তাদের বৃদ্ধ বয়সে দেখবে না এবং উপার্জনে অক্ষম তাই তাদের গৃহের কাজকর্ম ও হাতের কাজকর্ম শেখানো শ্রেয় বলে মনে করে। এই ধরনের মানসিকতা মালদা জেলার মুসলিম পরিবার গুলিতেও লক্ষ্যনীয়। যদিও গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলের মহিলারা বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে এবং কন্যা পুত্র সন্তানের প্রতি সমান ব্যবহার করা হয়।

সংস্কৃতিঃ

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে চলে যা তাকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে পৃথক করে। পোশাক পরিচ্ছেদ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সকল ক্ষেত্রে পৃথকতা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার বাঙালি মুসলিম মহিলারা সাধারণত শাড়ি ব্যবহার করে আবার অবাঙালি মুসলিম নারীরা সালোয়ার কামিজ পরিধান করে। কিন্তু সকলে শাড়ি ও সালোয়ার কামিজের ওপরে এটি বিশেষ ধরনের ওড়না বা শাড়ির আঁচলকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে বা সালোয়ার-কামিজ ও শাড়ির ওপরে পুরো শরীর আবৃত করার জন্য বোরখা পরিধান করে থাকে। বোরখা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন- তুর্কিতে চারসাফ, পশ্চিমী দেশে চাদ্দার, ইরাকে আবা, ইরানে পিছেহ, ভারতে বোরখা বা পর্দা।[৬৪] তা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন বোরকা বা পর্দা দ্বারা মুসলিম নারী তার সৌন্দর্য আবৃত রাখে, যা সমাজে তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে। উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে পর্দার কঠোরতা বেশি। প্রাচীন ও

মধ্যযুগেও পর্দা বা বোরখা পরিধান বাংলার মুসলিম সমাজে অপরিহার্য ছিল। এমনকি পাঁচ বছর উত্তীর্ণ মুসলিম কন্যাকে পর্দার কঠোরতা পালন করতে হত। যে নারী গৃহের চার দেওয়ালে আবদ্ধ থেকে বোরখা পরিধান করে থাকে, সে ততোধিক শুদ্ধ ও পবিত্র। গবেষক আব্দুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া "অবরোধবাসিনী" প্রবন্ধ থেকে দেখতে পাই নারী গৃহের বাইরে কোন আত্মীয়র সাথে দেখা করতে গেলেও পর্দা পরিধান করতে হবে।[৬৫] সম্পূর্ণ **১৯** শতক জুড়েই এই ধরনের প্রবণতা চলেছে এবং সেই সময় কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহিলা ও সমাজ সেবক পর্দা প্রথার কঠোরতার প্রতিবাদ করতে থাকে এবং পর্দা ছিন্ন করে গৃহের বাইরে বেরিয়ে সব কাজ করে। ইসলামিক শরীয়ত অনুযায়ী পর্দা বা বোরখা দুই ধরনের হয় যথা ক) শব্দের পর্দা অর্থাৎ একজন মুসলিম নারী উচ্চস্বরে কথা বলবে না বা সে এমন করে কথা বলবে যা অন্যকে আকৃষ্ট না করে (আওয়াজ কা পর্দা), খ) দৃষ্টির পর্দা অর্থাৎ পর্দা এমনভাবে করতে হবে যাতে অন্য কোন পুরুষের দৃষ্টি না পরে।[৬৬] তবে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীদের মধ্যে দুই ধরনের পর্দা দেখা যায়- (ক) অর্ধেক পর্দা বা হিজাব ও (খ) সম্পূর্ণ বোরখা। সম্পূর্ণ বোরখা পরিধান করে নারী নিজেকে মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত (চোখ দুটি বাঁধে) সম্পূর্ণ আবৃত করে। অর্ধপর্দা বা হিজাব শুধুমাত্র মাথা থেকে উর্ধাঙ্গ আবৃত থাকে, সাধারণত গ্রামাঞ্চলের মহিলারা দেহের উর্ধাঙ্গ চাদর, ওড়না, হিজাব বা ঘোমটা দ্বারা আবৃত রাখে। মালদা জেলার মুসলিম মহিলাদের মধ্যে অর্ধপর্দা অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় বোরখা বা পর্দা প্রথার চরিত্রটি পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বোরখা পরার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কিছু কিছু জেলায় পর্দা প্রথা রয়েছে। কোন কোন জেলার কিছু মুসলিম মেয়েদের স্কুল কলেজ যাওয়ার সময় অথবা গৃহের বাইরে বেরোনোর সময় পর্দা নিতে বা বোরখা পড়তে দেখা যায়। বোরখা বা পর্দা করার চলনটি অধিকাংশই পরিবারের ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণত সম্পূর্ণ বোরখা পরিহিত নারী খুব কম দেখা যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষা চলাকালীন মালদা

জেলার মহিলাদের সাধারণত অর্ধ বোরখা বা ওড়না বা শাড়ির আঁচল দ্বারা আবৃত রাখা বা হিজাব ব্যবহার করার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং সম্পূর্ণ বোরখা অনেকেই বিশেষ করে কম বয়সী মহিলারা অপছন্দ করে। ক্ষেত্র সমীক্ষা সময় দেখা গেছে মালদা জেলার মুসলিম স্কুল ছাত্রীরা অনেকেই পর্দা ব্যবহার করে না, তবে সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্রীদের মধ্যে অর্ধ বোরখার প্রবনতা থাকলেও হাই মাদ্রাসা ছাত্রীদের সকলের মধ্যে এমন প্রবণতা খুব কম দেখতে পাওয়া যায়।

ইসলামিক সংস্কৃতিতে নারী পুরুষের সমান অধিকার থাকলেও মসজিদে প্রবেশ, ঈদ বা জুম্মার নামাজে অংশগ্রহণ বা জানাজার নামাজে অংশগ্রহণের অধিকার নারীদের দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ মুসলিম নারীরা সুন্নি মতাদর্শের অনুসারী এবং তারা কোরআন নির্দেশিত দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ মুসলিম নারী নামাজ প্রতিনিয়ত করতে পারে না এবং দেখা যায় যুবতী মহিলাদের তুলনায় বৃদ্ধা বা বয়স্ক মহিলারা নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত এর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক ধ্যানে মগ্ন থাকে বেশি। কোরানে নির্দেশিত আছে ১২ বছর উত্তীর্ণ মেয়েরা রোজা পালন করবে, তবে সাধারণত দেখা যায় স্কুল কলেজগামী মুসলিম ছাত্রীদের মধ্যে রোজা রাখার প্রবণতা কম বরং একটু বয়স্ক মহিলাদের এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ইসলামে কোরআন পড়া আবশ্যিক করা হলেও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মুসলিম নারী কোরআন পড়তে জানে না, আর জানলেও তার অর্থ বোঝেনা। হজ পালনের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের কোন বিভেদ নেই। তবে নামাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কখনোই একই সারিতে দাঁড়াতে পারবে না, এমনকি নারীরা পুরুষদের মত উচ্চ স্বরে নামাজ পড়তেও পারবে না।[৬৭] এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, মালদা জেলায় সমীক্ষা চলাকালীন জানা যায় ইংরেজ বাজার পৌরসভার অন্তর্গত হায়দারপুর জামে মসজিদে শুক্রবারে জুম্মার নামাযে নারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীর অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও অবস্থা কোন ব্যক্তির সমাজ ও পরিবারে তার মর্যাদার স্তর নির্দেশ করে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীরা ইসলামিক সংস্কৃতি ও রীতিনীতি অনুযায়ী গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে তার জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু বিংশ শতকের শুরু থেকে শিল্পায়ন, নগরায়ন, উষ্ণায়নের প্রভাবে ইসলামিক প্রথা ঐতিহ্য ধারণা প্রভৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে। এছাড়াও দারিদ্রতা ও আধুনিকীকরণের প্রভাবে এই সম্প্রদায়ের নারীরা গৃহের বাইরে কাজকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে, যা তার ক্ষমতায়নের একটি সূচক হিসেবে পরিগণিত হয়। মুসলিম পরিবারের মহিলারা সাধারণত উপার্জনহীন গৃহের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, যার কোন মূল্য পরিবার বা সমাজে নেই। দেখা যায় মুসলিম পরিবারের মহিলাদের এক বৃহৎ অংশ হাতের কাজ, গৃহস্থালির কাজকর্ম, চাষাবাদ প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকে। গৃহকর্মে নিযুক্ত মহিলারা উদয় আস্ত কর্মে নিযুক্ত থাকায় অবসর সময় থেকে বঞ্চিত, এমনকি তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করা হয়।

নারী ক্ষমতায়নেরে মাপকাঠি হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে তার ওপর। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারী প্রতিনিয়ত প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক কাঠামো ও সম্প্রদায়গত বিভিন্ন বিধি-নিষেধে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই বেড়াজাল ছিন্ন করে সমাজে নিজের আলাদা অস্তিত্ব তৈরি করার জন্য নারীর আর্থসামাজিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরী এবং এটি নির্ভর করে নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা ও কর্মে যোগদানের ওপর। তাই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ব্যতীত নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন অসম্ভব।

সারণি ৩

পশ্চিমবঙ্গের লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার (শতকরা হিসেবে)

	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
মোট	২৯.৩৪	৩২.২	৩৬.৭৮	৩৮.০৮
পুরুষ	৪৮.৭১	৫১.৪	৫৪.২৩	৫৭.০৭
মহিলা	৮.০৭	১১.৩	১৮.০৩	১৮.০৮
লিঙ্গ ব্যবধান	৪০.৬৪	৪১	৩৬.১৫	৩৮.৯৯

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৮১-২০১১, ভারত।

উপরোক্ত সারণিতে পরিষ্কার যে ১৯৮১ থেকে ২০১১ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী লিঙ্গ ভেদে কর্মে যোগদানের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষদের কর্মে যোগদানের হার ১৯৯১ সালে যা ছিল ৫১.৪ শতাংশ ২০১১ সালে তার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৭.০৭ শতাংশ, একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের কর্মে যোগদানের হার ১৯৯১ সালে ছিল ১১.৩ শতাংশ, তা ২০১১ সালের বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৮.০৮ শতাংশ, যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে নারী পুরুষের লিঙ্গ ব্যবধান ১৯৮১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত কমলেও ২০১১ সালে তার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৮.৯৯ শতাংশ।

সারণি ৪

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভেদে লিঙ্গভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার (শতকরা হিসেবে)

	গ্রামাঞ্চল				শহরাঞ্চল			
	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
মোট	২৯.৩৫	৩৩.১৮	৩৭.৯৩	৩৮.৭	১৯.৩০	২৯.৫৯	৩৩.৮২	৩৬.৬৯
পুরুষ	৪৮.৭২	৫২.০৯	৫৪.৩০	৫৭.২	৪৮.৭০	৪৯.৬৪	৫৪.০৭	৫৬.৮৪
নারী	৮.৮৯	১৩.০২	২০.৭০	১৯.৪০	৫.৫৯	৬.২১	১১.১৩	১৫.৪০
লিঙ্গ ব্যবধান	৩৯.৮৩	৩৯.০২	৩৩.৬০	৩৭.৮০	৪৩.২১	৪৩.৪৩	৪২.৯৪	৪১.৪৪

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৮১-২০১১, ভারত।

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের কর্মে যোগদানের হার নারীদের অপেক্ষা বেশি, আবার শহরাঞ্চলের নারীদের অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের নারীরা বেশি কর্মে যোগদান করে। গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের কর্মে যোগদানের হার ১৯৮১ সালে ছিল ৪৮.৭২ শতাংশ, তা ২০১১ সালের বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৭.২০ শতাংশ। অপরদিকে শহরাঞ্চলের পুরুষদের কর্মে যোগদানের হার ১৯৮১ সালে ৪৮.৭০ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে তা হয়েছে ৫৬.৪৮ শতাংশ। নারীদের কর্মে যোগদানের হারের দিকে তাকালে এটি দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের কর্মে যোগদানের হার ১৯৮১ সালে ৮.৮৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০১ তে দাঁড়িয়েছে ২০.৭০ শতাংশ, ২০১১ সালে তা আবার হয় ১৯.৪০ শতাংশ। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে মেয়েদের কর্মে যোগদানের হার ১৯৮১ সালে ৫.৫৯ শতাংশ থেকে ২০১১ সালের বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫.৪০ শতাংশ। সারণিতে লক্ষণীয় যে গ্রামাঞ্চল অথবা শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই কর্মে যোগদানের লিঙ্গ ব্যবধান খুব ধীর গতিতে কমেছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যবধান ১৯৮১ সালে ৩৯.৩৮ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩৭.৮০ শতাংশ, আবার শহরাঞ্চলে ১৯৮১ সালে লিঙ্গ ব্যবধান ৪৩.২১ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪১.৪৪ শতাংশ, তবে খুব একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

সারণি ৫

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মভিত্তিক লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার ২০০১ (শতকরা হিসেবে)

	মোট	হিন্দু	মুসলিম	খ্রিস্টান	শিখ	বৌদ্ধ	জৈন	অন্যান্য
পুরুষ	৫৪	৫৫.৩	৫০.৫	৪৮.৬	৫৪.৮	৪৫	৫৬.৫	৫৫.৭
নারী	১৮.৩	১৯.২	১৪	২৯.২	৭.৬	২৫.৮	৭.৫	৫০.৪

উৎসঃ ২০০১ আদমশুমারি রিপোর্ট, পশিমবঙ্গ, ভারত।

উপরোক্ত সারণি থেকে স্পষ্ট যে মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর তুলনায় কম। যেখানে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ নারীরা কর্মে যোগদানের হার যথাক্রমে ১৯.২

শতাংশ, ২৯.২ শতাংশ, ২৫.৮ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মোট মুসলিম জনসংখ্যার মাত্র ১৪ শতাংশ নারী বিভিন্ন উপার্জনকারী কাজের সাথে যুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মুসলিম জনগণ গ্রামে বাস করে, তাই অধিকাংশ মুসলিম নারী কৃষি শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত। তবে মুসলিম নারীর বেশ কিছু অংশ সুচি শিল্প, জরির কাজকর্ম, দর্জি, এমব্রয়ডারি, কারুশিল্প প্রভৃতি কাজের সাথে যুক্ত। মুসলিম নারীরা বেশিরভাগ স্বনিযুক্ত এবং তাদের প্রাত্যহিক আয় খুব কম, সে তুলনায় হিন্দু মহিলারা বেতনভুক্ত কর্মী হিসেবে নিযুক্ত এবং তাদের দৈনিক আয় বেশি। গবেষক এ শরীফ বলেছেন মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার খুব কম।[৬৮] গ্রাম্য এলাকায় মুসলিম নারীর তুলনায় হিন্দু নারী বেশি জমির মালিকানা ভোগ করে এবং শিক্ষাগত দিক থেকেও মুসলিম নারীরা হিন্দু ও খ্রিস্টান নারীর তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে।

সারণি ৬

পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার (শতকরা হিসেবে)

জেলার নাম	কৃষিকাজ	কৃষি শ্রমিক	গৃহস্থালির কাজকর্ম	অন্যান্য
কলকাতা	১.৭৬	০.৬৭	১৩.০৪	৮৪.৫৩
বর্ধমান	১১.৩৯	১৬.৮৩	২৭.৫৩	৪৪.২৫
নদীয়া	১৮.৯১	৭.৯৫	২৪.৫৭	৪৮.৫৭
উত্তর ২৪ পরগনা	৭.৫০	১৫.৩০	২৩.২৮	৫৩.৯২
হাওড়া	২.৫০	৫.২৪	৫২.০১	৪০.২৫
হুগলী	১২.৮৩	১৪.৪৮	২৯.৩০	৪৩.৩৯
দক্ষিন ২৪ পরগনা	১০.২৭	২৯.৫১	২১.২২	৩৯.০০
বীরভূম	৯.৭৬	১২.৯০	৪৬.২৫	৩১.১০
দক্ষিন দিনাজপুর	২৩.০৫	৩১.৪১	৬.৬৬	৩৮.৮৯
দার্জিলিং	৭.২৫	২৮.৪৯	২.৭৫	৬১.৫১
মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)	১২.৬৫	২৭.১৯	৩১.১২	২৯.০৪
মুর্শিদাবাদ	৩.৬১	৪.১৪	৭৪.১৩	১৮.১১
কোচবিহার	৩০.৭৭	৫৩.৩২	৩.২৯	১২.৬১
জলপাইগুড়ি	২০.৫৩	৪৭.৫৫	১.৯৯	৩০.১২
উত্তর দিনাজপুর	২৫.৪৭	৪৫.৩৩	১১.৮১	১৭.৪০
বাঁকুড়া	১৭.৫৮	১৯.৫২	৩৯.৪০	২৩.৫০
পুরুলিয়া	২০.০৭	৫৫.৫০	১২.৪৬	১১.৯৭
মালদা	৪.৮৮	১৪.১৬	৭৪.১৩	১৮.১১

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, ভারত।

উপরোক্ত আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মুসলিম নারী গৃহস্থালির কাজ কর্মের সাথে যুক্ত এবং অন্যান্য পেশায় যোগদানের হার খুব কম। বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে স্থান-কাল পাত্র ভেদে মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন হলেও আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলের বিচারে নারীর অবস্থান মোটামুটি একই রকম, সামাজিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৭

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের নারীর কর্মে যোগদানের হার (শতকরা হিসেবে)

		মোট কর্মী	প্রধান বা মুখ্য কর্মী	প্রান্তিক বা আংশিক কর্মী	অন্যান্য
ভারত	মোট	২৫.৫	৫৯.৬	৪০.৪	২৯.২
	গ্রামাঞ্চল	৩০.০	৫৫.৬	৪৪.৪	১৭.৭
	শহরাঞ্চল	১৫.৪	৭৭.০	২৩.০	৭৯.১
পশ্চিমবঙ্গ	মোট	১৮.১	৪৯.৯	৫০.১	৪১.৫
	গ্রামাঞ্চল	১৮.৪	৪২.১	৫৭.৯	২৪.২
	শহরাঞ্চল	১৫.৪	৭০.৯	২৯.১	৭৭.৫

উৎসঃ রেজিস্টার জেনারেল দপ্তর, ভারত। আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১।

উপরোক্ত সারণি থেকে প্রতিভাত যে সমগ্র ভারতবর্ষের মোট নারীর সংখ্যার ২৫.৫% কর্মী, তার মধ্যে প্রধান কর্মী হিসেবে নিযুক্ত ৫৯.৬ শতাংশ এবং প্রান্তিক বা আংশিক সময়ের কর্মী হিসেবে ৪০.৪ শতাংশ নারী নিযুক্ত। গ্রামাঞ্চলে মোট ৩০.৪ শতাংশ নারী কর্মীর মধ্যে মুখ্য কর্মী হিসেবে নিযুক্ত ৫৫.৬ শতাংশ ও প্রান্তিক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত ৪৪.৪ শতাংশ। শহরাঞ্চলে নারী কর্মীর সংখ্যা গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা কম। ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলে ১৫.৪ শতাংশ নারী

উপার্জনকারী কর্মের সাথে যুক্ত, যার মধ্যে ৭৭.০ শতাংশ প্রধান কর্মী হিসেবে নিযুক্ত এবং ২৩ শতাংশ আংশিক সময়ের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলে একই পরিমান নারী (১৫.৪ শতাংশ) কর্মে নিযুক্ত, তবে সারণিতে লক্ষণীয় যে শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে প্রান্তিক নারী কর্মীর সংখ্যা বেশি।

মালদা জেলা গঠনের প্রেক্ষাপট ও ভৌগলিক গঠনঃ

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত মালদা জেলা একসময় ছিল গৌড়বঙ্গের রাজধানী। মালদা শব্দটি এসেছে আরবি ‘মাল’ শব্দ থেকে যার অর্থ হলো সম্পদ অর্থাৎ মালদা শব্দের আরবি মতে আক্ষরিক অর্থ হল যেখানে প্রচুর ধনসম্পদ আদান প্রদান করা হয় অথবা যেখানে বহু সংখ্যক মানুষের কাছে প্রচুর অর্থ সম্পদ রয়েছে।[৬৯] দক্ষিণ দিনাজপুরের দুটি থানা, পশ্চিমের রাজশাহী জেলার তিনটি ও পূর্বে পূর্ণিয়া জেলা চারটি থানা নিয়ে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গপ্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা হিসেবে মালদা জেলা আত্মপ্রকাশ করে।[৭০] মালদা জেলা গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় নদীপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এটিকে ব্রিটিশ সরকার বাণিজ্য ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। ইংরেজ বাণিজ্য ঘাঁটি হওয়ায় এটি ইংরেজবাজার বা ইংরেজ বাদ বা ইংলিশবাজার নামে পরিচিত হয়।[৭১] এই নতুন শহরটি মালদা ও মহানন্দা নদীর উত্তরের শহরটি পুরাতন মালদা বা ওল্ড মালদা নামে পরিচিত হয়। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতার আলোয় প্রজ্বলিত হলেও মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ জেলাগুলি তখনও পাকিস্তানী সৈন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং সংবাদ শোনা যায় যে এই তিনটি জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। মালদহের মানুষ এই সময় চরম উৎকণ্ঠায় (১৫ ও ১৬ই আগস্ট) দিনযাপন করে। অবশেষে সীমানা নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত র‍্যাডক্লিফ কমিশন ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট এক ঘোষণার দ্বারা মালদা জেলাকে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তি নং ৬৭ তারিখ ১৭/০৮/১৯৪৭ অনুসারে ইংলিশ বাজার, কালিয়াচক, মালদহ, হবিবপুর,

বামনগোলা, রতুয়া, মানিকচক, খরবা, হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজোল এই দশটি থানা নিয়ে গঠিত হয় বর্তমান মালদা জেলা এবং পরের দিন ১৮ই আগস্ট মালদহের কালেক্টরেট ভবনে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়, প্রকৃত অর্থে সেই দিন মালদা বাসী স্বাধীনতা পায়। [৭২]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও মালদা জেলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বর্তমান মালদা একদা প্রাচীন ঐতিহ্যশালী গৌড় নামে পরিচিত ছিল। গৌড়বঙ্গের সর্বপ্রথম সার্বভৌম অধিপতি শশাঙ্ক দেবের মৃত্যুর পর গৌড় প্রদেশে অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল। এই অরাজক অবস্থা থেকে সমগ্র প্রদেশকে রক্ষা করে পাল বংশের রাজা গোপাল। সপ্তম শতকে বাংলার গোপাল পাল বংশের সূচনা করে। অষ্টম শতক থেকে ১১ শতক পর্যন্ত পাল বংশের শাসনকালে সমগ্র বাংলা প্রদেশ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বৌদ্ধ ধর্মের পিঠস্থানে পরিণত হয়। যা বাংলা প্রদেশকে সমগ্র উত্তর ভারতে এক উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে পরিচয় দেয়। পাল বংশের অবসানের চিহ্ন পাওয়া গেছে পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের জগজ্জীবনপুর গ্রামে। এরপরে বাংলায় সেন বংশ সূচনা হয় রাঢ় অঞ্চল ও বর্তমান মালদা জেলাকে কেন্দ্র করে। সেন শাসনকালে গৌড়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং লক্ষণাবতী পর্যন্ত তাদের শাসন প্রসারিত হয়। গঙ্গা ও পার্শ্ববর্তী নদীগুলির সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় গৌড়বঙ্গ তথা বর্তমান মালদা জেলা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। সেন বংশের বল্লাল সেন ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড়সহ সমগ্র বাংলায় শাসন কায়েম করে। সেন বংশের আভ্যন্তরীন দুর্বলতার সুযোগে সেন বংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষন সেনকে পরাজিত করে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি বাংলা দখল করে গৌড়ে তুর্ক আফগান শাসনের সূচনা করেন। দিল্লি থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে বাংলায় স্বাধীন সুলতানীর সূচনা হয়। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে পান্ডুয়াকে কেন্দ্র করে স্বাধীন ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনা হয়। গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় পান্ডুয়া ছিল জলপথে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১৫ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ মহানন্দার নদী দূরে চলে যেতে থাকে এবং গৌড়কে কেন্দ্র করে হোসেন শাহী বংশের শাসন শুরু হয়। স্বাধীন বাংলা প্রদেশের কেন্দ্রবিন্দু মালদা জেলা বর্তমানে গৌড় ও পান্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষে

পূর্ণ। হোসেনশাহী বংশের আমলে বাংলায় বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার সমন্বয় ঘটে এবং সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

দীর্ঘ ৫০০ বছরের মুসলিম শাসনকালে মালদা জেলার স্থাপত্য ভাস্কর্যে মুঘল শাসনের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ১৫৭৬ সালে আকবর গৌড় জয় করে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং রাজমহলের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে, গৌড়সহ সমগ্র বাংলা প্রদেশের দায়িত্ব মানসিংহ ও টোডরমলের হাতে তুলে দেন। আকবরের গৌড় জয়ের পর মহামারী প্লেগ গৌড়বঙ্গে দেখা দিলে বহু ধনী ব্যক্তি অন্যত্র চলে যেতে থাকে। এইভাবে একসময়ের সমগ্র উত্তর ভারতের দৃষ্টান্ত গৌড় তার শ্রী হারাতে থাকে। মুঘল সাম্রাজ্যের অবসানের পর ব্রিটিশ শাসনকালে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য ঘাটী স্থাপিত হলেও ইংরেজদের কাছে মালদা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডক্টর বি হ্যামিল্টন এর সময় বর্তমানের গাজোল, মালদা, বামনগোলা, হবিবপুর থানার কিছু অংশ দিনাজপুর জেলার সাথে ও হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক থানা পূর্ণিয়া সাথে যুক্ত করা হয়। ১৮১৩ সালে কালিয়াচক ও সাহেবগঞ্জ থানার গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের জন্য দিনাজপুর ও পূর্নীয়া থেকে কতগুলি থানা ও কিছু স্থান পুনরায় মালদা জেলার অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান মালদা জেলার রূপ দেওয়া হয়।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গৌরব থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে গঠিত বর্তমানের মালদা জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি পশ্চাৎপদ জেলা হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের উন্নত জেলাগুলির সাথে উত্তরের অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জেলাগুলির যোগসূত্রকারী হিসেবে মালদা জেলা গভীর পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। মালদা জেলা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোন বিশেষ জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মালদা জেলার ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক অবস্থানটি চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান মালদা জেলা ৩৭৩৩ স্কয়ার কিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে। মালদা জেলার উত্তর পশ্চিমে বিহার, পশ্চিমে ঝাড়খন্ড, উত্তরে উত্তর দিনাজপুর, উত্তর পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণে গঙ্গা, দক্ষিণ পূর্বে মুর্শিদাবাদ। মালদা জেলার সীমানা অঞ্চলে যেমন বৈচিত্রপূর্ণ ভৌগলিক চিত্রটিও তেমনি

বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে মালদা জেলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় বারিন্দ, তাল, দিয়ারা। মহানন্দা নদীর পূর্ব দিকে লাল মাটি দিয়ে গঠিত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৮ থেকে ৩২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত কঠিন ও অনূর্বর ভূমি খন্ড বারিন্দ এলাকা নামে পরিচিত। বর্তমান মালদা জেলার পুরাতন মালদা, হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল ব্লকগুলি এই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে কালিন্দী নদীর উত্তর অংশের অসংখ্য খাল বিল যুক্ত অঞ্চলটি তাল অঞ্চল নামে পরিচিত, এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৮ থেকে ২০ মিটার। এটি বারিন্দ অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত নিচু। মালদা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলটি গঙ্গা বিধৌত পলিমাটি দিয়ে গঠিত সর্বাপেক্ষা উর্বর অংশটি দিয়ারা অঞ্চল নামে পরিচিত। মানিকচক, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক ১, ২, ৩ ব্লক গুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত।[৭৩]

সারণি ৮

মালদা জেলার ভূতাত্ত্বিক বিন্যাস

	বারিন্দ	তাল	দিয়ারা
ব্লক	পুরাতন মালদা, হবিবপুর, বামনগোলা, গাজল	রতুয়া ১, ২, চাঁচল ১,২, হরিশ্চন্দ্রপুর ১, ২,	মানিকচক, ইংরেজ বাজার, কালিয়াচক ১, ২, ৩

উৎসঃ সেন্সাস রিপোর্ট ২০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

মালদা জেলার বৈচিত্রপূর্ণ সীমানা ও ভৌগলিক অবস্থান ভাষা, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। বারিন্দ এলাকা হল মালদহের সবথেকে প্রাচীনতম ভূখণ্ড, এই অঞ্চলটি বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক প্রশাসনিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে বসবাসকারী মানুষজন হল মালদহের সব থেকে প্রাচীনতম অধিবাসী। একদা পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত এই ভূখণ্ডে পুন্ড্র জনজাতির বসবাস ছিল। যাই হোক বিভিন্ন কাল প্রবাহের মধ্য দিয়ে বর্তমান মালদা জেলায়

বিভিন্ন জাত ও সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। বারিন্দ এলাকায় অধিকাংশ হিন্দু জনজাতির লোকের বাস, যার মধ্যে অধিকাংশই তপশিলি জাতি উপজাতির মানুষ বসবাস করে। তাল ও দিয়ারা অঞ্চলে অধিকাংশই মুসলিম ও প্রভাবশালী শ্রেণীর বসবাস। মালদার জনসংখ্যা এলাকা ও অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন সময়ের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তরবঙ্গের জনবহুল এলাকা গুলির মধ্যে অন্যতম হলো মালদা জেলা। নিম্নের সারণিতে স্বাধীনোত্তরকালে মালদা জেলার সম্প্রদায় ভেদে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

সারণি ৯

সম্প্রদায়ভেদে মালদা জেলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যায়ন (শতকরা হিসেবে)

সেন্সাস বছর	হিন্দু	মুসলিম	খ্রিস্টান	শিখ	বৌদ্ধ	জৈন	অন্যান্য
১৯৫১	৬২.৯২	৩৬.৯৭	০.০৯	০.০১	০.০০	০.০১	০.০১
১৯৬১	৫৩.৬৪	৪৬.১৮	০.১৭	০.০০	০.০০	০.০১	০.০০
১৯৭১	৫৬.৬৩	৪৩.১৩	০.২২	০.০১	০.০০	০.০১	০.০০
১৯৮১	৫৪.৪৯	৪৫.২৭	০.২০	০.০১	০.০১	০.০২	০.০১
১৯৯১	৫২.২৫	৪৭.৪৯	০.১৯	০.০১	০.০০	০.০১	০.০৪
২০০১	৪৯.২৪	৪৯.৭২	০.২৫	০.০১	০.০০	০.০২	০.৬৮
২০১১	৪৭.৯৯	৫১.২৭	০.৩৩	০.০২	০.০১	০.০২	০.২০

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৫১-২০১১, ধর্মভিত্তিক রিপোর্ট ২০০৫, ভারত।

১৯৭১ থেকে ২০১১ আদমশুমারি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে মালদা জেলার সবথেকে বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হলো হিন্দু ও মুসলিম। তবে ১৯৭১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে ও মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯০১ সালে

যেখানে মালদাহের জনসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ, ২০০১ সালে তা ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩২.৯ লক্ষ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে সহজেই অনুমেয় যে মৃত্যুহার জন্ম হারের তুলনায় কম এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও কাজ কর্মের জন্য বহু জনগণ পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে এসে মালদায় বসতি স্থাপন করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৬১-১৯৭১ সালের তুলনায় ১৯৭১-৮১ সালে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে বহু সংখ্যক লোকজন মালদায় আসে এবং ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত মালদায় জনগণের আগমন অব্যাহত থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের কারণ হিসেবে জন্ম সংখ্যার বৃদ্ধির থেকেও স্থানান্তরকরনকে দায়ী করা যায়। উপরোক্ত সারণিতে পরিলক্ষিত হয় যে হিন্দু জনসংখ্যা ২০০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে হঠাৎ করেই কমে যাচ্ছে কিন্তু মুসলিম জনসংখ্যা ধারাবাহিকভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষক সিদ্দিক ও হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন মালদা জেলার মুসলিম জনসংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ২০৪১ সালে তা ৫৩.২৭ শতাংশে পৌচ্ছাবে।[৭৪] গবেষক নাজমুল হোসেন মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণার অভাবকেই দায়ী করেছেন।[৭৫] ফলে মালদা জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে জনঘনত্বের ঘনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়।

সারণি ১০

ব্লক অনুযায়ী মালদা জেলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যায়ন ২০০১

ব্লক	জনসংখ্যা			জেলার জনসংখ্যার হার	জনঘনত্ব	লিঙ্গানুপাত
	মোট	পুরুষ	নারী			
১. হরিশ্চন্দ্রপুর ১	১৬২৪০৬	৮৩১১৩	৭৯২৯৩	৪.৯৪	৯৪৭.৪৭	৯৫৪
২. হরিশ্চন্দ্রপুর ২	১৯৮০৩৯	১০২০৬৬	৯৫৯৭৩	৬.০২	৯১১.৭৪	৯৪০
৩. চাঁচল ১	১৭৪২০৪	৮৯১৮২	৮৫০২২	৫.২৯	১০৭৪.৪	৯৫৩
৪. চাঁচল ২	১৬৫১৯২	৮৪১৭৫	৮১০১৭	৫.০২	৮০৪.৯৫	৯৬২
৫. রতুয়া ১	২১৭৩৫৬	১১২৩৯৬	১০৪৯৬০	৬.৬১	৯৪২.৮৫	৯৩৪
৬. রতুয়া ২	১৬০৯০৪	৪২২৯৭	৭৪৬০৭	৪.৮৯	৯২৫.১১	৯৫৫
৭. মানিকচক	২১৪১২৭	১১০৪১০	১০৩৭১৭	৬.৫১	৬৬৫.৪৭	৯৩৯
৮. ইংরেজ বাজার	২২৬২৩৬	১১৬৪৫৭	১০৯৭৭৯	৬.৮৮	৮৯৯.৪৮	৯৪৩
৯. ওল্ড মালদা	১৩১২৫৫	৬৭৫৮৭	৬৩৬৬৮	৩.৯৯	৬০৪.৬২	৯৪২
১০. হবিবপুর	১৭১১২৫	৮৬৫৪৯	৮৪৫৭৬	৫.২	৪৩২.০৬	৯৭৭
১১. বামনগোলা	১২৭২৫২	৬৫২৫৮	৬১৯৯৪	৩.৮৭	৬১৮.০০	৯৫০
১২. গাজল	২৯৪৭১৫	১৫০৩০৩	১৪৪৪১২	৪.৯৬	৫৭৩.৭৭	৯৬১
১৩. কালিয়াচক ১	৩১০৯৩৫	১৬০০৬৪	১৫০৮৭১	৯.৪৫	২৯৫০.৮৯	৯৪৩
১৪. কালিয়াচক ২	২১১৪০৬	১০৮৯২১	১০২৪৮৫	৬.৪২	৯৪৯.১৬	৯৪১
১৫. কালিয়াচক৩	২৮৪৩৭৬	১৪৬৪৭৬	১৩৭৫০০	৮.৬৪	১০৯৩.২৫	৯৩৬
গ্রামাঞ্চল	৩০৪৯৫২৮	১৫৬৫৬৫৪	১৪৮৩৮৭৪	৯২.৬৮	৮৩৪.৭৫	৯৪৮
১. ইংরেজ বাজার	১৬১৪৫৬	৮২৮৪৫	৭৮৬১১	৪.৯১	১১৮৪৫.৬৩	৯৪৯
২. ওল্ড মালদা	৬২৯৫৯	৩২৫১১	৩০৪৪৮	১.৯১	৬৯৯৫.৪৪	৯৩৭
ক. কাচুপুকুর	৫৩৪৩	২৭৩০	২৬১৩	০.১৬	৬.০০৩.৩৭	৯৫৭
খ. কেদুয়া	৫৭৭৩	২৯৫৪	২৪১৯	০.১৮	৫৬০৪.৪৫	৯৫৪
গ. আইহো	৫৪০৯	২৭১২	২৬৯৭	০.১৬	৬৫৯৬.৩৪	৯৯৪
শহরাঞ্চল	২৪০৯৪০	১২৩৭৫২	১১৭১৮৮	৭.৩২	৯৪৯৭.০৪	৯৪৭
মোট	৩২৯০৪৬৮	১৬৮৯৪০৬	১৬০১০৬২	১০০	৮৯৪.৪৯	৯৪৮

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে মালদা জেলার ব্লক অনুযায়ী জনসংখ্যা, লিঙ্গানুপাত, জনঘনত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার যে মালদা জেলায় গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যক জনগণের বাসস্থান। মালদা জেলার সর্বত্র জনসংখ্যার সমবন্টন দেখতে পাওয়া যায় না। জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করে। ২০০১ এর সেন্সাস অনুযায়ী জনঘনত্ব ৮৯৪ জন প্রতি স্কয়ার কিলোমিটার, যা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জায়গা গুলোর মধ্যে অন্যতম। সাধারণত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতা ওপর জনঘনত্ব অনেকটা নির্ভর করে। পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার যে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লক, চাঁচল ১, রতুয়া ১ ও ২, ইংরেজবাজার এবং কালিয়াচক ১, ২, ৩ ব্লক গুলিতে জনঘনত্ব অনেক বেশি। সে তুলনায় গাজোল, ওল্ড মালদা, বামনগোলা, হবিবপুর কম জনঘনত্ব সম্পন্ন এলাকা। বারিন্দ এলাকার চারটি ব্লক তাল ও দিয়াড়া অঞ্চলের থেকে কম ঘনবসতি সম্পন্ন, এর কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সুবিধা চাষাবাদ যোগ্য জমি ও স্থানান্তরকরনকে বলা যায়। লিঙ্গানুপাত জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ২০০১ এর সেন্সাস অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে লিঙ্গানুপাত ৯৪৮/১০০০ পুরুষ ও শহরাঞ্চলে তা ৯৪৭/১০০০। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে একটি সমতা দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যক মানুষের বাস হলেও মালদা জেলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একরকম ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, কিছু এলাকা উন্নত হলে অধিকাংশ এলাকা তার প্রান্তিক চরিত্র বহন করে চলেছে এখনও।

মালদা জেলার মুসলিম জনসংখ্যাঃ

মালদা জেলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও জনঘনত্বের চিত্রটিতে ধর্মীয় চরিত্র যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মালদা জেলার মুসলিম জনগণ ও মুসলিম নারীদের জীবনযাত্রা ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। সেক্ষেত্রে ২০০৫ সালের ধর্ম সংক্রান্ত সর্বপ্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, এখানে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন, শিক্ষার হার, কর্মে যোগদানের হারের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ২০০১ সালে

মালদা জেলার জনসংখ্যা ৯,৩৭,৫৮০ থেকে ২০১১ সালে তা তিন থেকে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৯,৮৮,৮৪৫ জন। সাম্প্রদায় ভেদে মালদা জেলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের সারণী থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মালদা জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হলো হিন্দু ও মুসলিম। এছাড়াও অন্য সম্প্রদায় গুলি যেমন- খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির মধ্যে খুব কম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় গুলির লোকসংখ্যা প্রায় একই আছে। সম্প্রদায় ভেদে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের সারণী থেকে বোঝা যায় মালদা জেলার হিন্দু সংখ্যার কমতে শুরু করে কয়েক দশক ধরে যেমন ১৯৭১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা যেখানে ছিল ৫৬.৬৩ শতাংশ ২০১১ সালে তা ৪৭.৯৯ শতাংশ দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মুসলিম জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা ৩৬.৯৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১১ সালে ৫১.২৭ শতাংশ। মালদা জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হল মুসলিম জনগণ। তবে মালদা জেলার সর্বত্র এই মুসলিম জনগণের বন্টন সমান নয়। এই বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এবং এদের মধ্যে আধুনিকীকরণের প্রভাব খুব কম। মালদা জেলার মুসলিম জনগণের অধিকাংশই পূর্ব থেকেই গ্রামে অবস্থিত। এটি সাধারণত মনে করা হয় যে জাতীয় স্তরের মুসলিমরা শহরাঞ্চলে অবস্থিত কিন্তু এটি মালদা জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত অধিকাংশ মুসলিম জনগণ নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জমি ও চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। শহরাঞ্চলের জীবনযাত্রা মানুষের সমস্ত রকম চাহিদা পূরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কাজে যোগদানের সুযোগ তৈরি করে ও জীবনের প্রত্যেক ছোটখাটো প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম।[৭৬] কিন্তু মালদা জেলার অধিকাংশ মুসলিম জনগণ গ্রামে অবস্থিত থাকাই নিজেদের সামান্যতম চাহিদা পূরণ করতেও সক্ষম নয়। নিম্নোক্ত সারণিতে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে মালদা জেলার ব্লক গুলিতে মুসলিম জনগণের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

সারণি ১১

ব্লক অনুযায়ী মালদা জেলার মুসলিম জনগণের পরিসংখ্যান

	ব্লক	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা			শতকরা মুসলিম	ব্লক সাপেক্ষে শতকরা মুসলিম
			মোট	পুরুষ	পুরুষ		
তাল	১. হরিশ্চন্দ্রপুর ১	১৬২৪০৬	৯৩৮৮৫	৭৪৮৯৬	৪৫৯৪৯	৫৭.৮১	৫.৭৪
	২. হরিশ্চন্দ্রপুর ২	১৯৮০৩৯	১৪৩৮০৩	৭৪০৯২	৬৯৭১১	৭২.৬১	৮.৭৯
	৩. চাচোল ১	১৭৪২০৪	১২২০৫৫	৬২৪৯৫	৫৯৫৬০	৭০.০৬	৭.৪৬
	৪. চাচোল ২	১৬৫১৯২	১১৪৭৮২	৫৮৬০৪	৫৬১৭৮	৬৯.৫৮	৭.০২
	৫. রতুয়া ১	২১৭৩৫৬	১৪১৮৯৫	৭৩৩৫৪	৬৮৫৪১	৬৫.২৮	৮.৬৭
	৬. রতুয়া ২	১৬০৯০৪	১২৩৩৪২	৬৩০০৯	৬০৩৩৩	৭৬.৬৬	৭.৫৪
দিয়ারা	৭. মানিকচক	২১৪১২৭	৯১৩৮৪	৪৬৬৬৩	৪৪৭২১	৪২.৬৮	৫.৫৯
	৮. ইংরেজ বাজার	২২৬২২৬	১১২০২৯	৫৭২৪৬	৫৪৭৮৩	৪৯.৫২	৬.৮৫
	৯. কালিয়াচক ১	৩১০৯৩৫	২৭৪৮২৫	১৪১২৩১	১৩৩৫৯৪	৮৮.৩৯	১৬.৮০
	১০. কালিয়াচক ২	২১১৪০৬	১৪২৭৭২	৭৩৩৪৫	৬৯৪২৭	৬৭.৫৩	৮.৭৩
	১১. কালিয়াচক ৩	২৮৪৩৭৬	১৩৫৬৫৪	৬৯৭২১	৬৫৯৩৩	৪৭.৭০	৮.২৯
বারিন্দ	১২. পুরাতন মালদা	১৩১২৫৫	৩৪৬০৫	১৭৬৪৬	১৬৯৫৯	২৬.৩৬	২.১১
	১৩. হবিবপুর	১৮৭৬৫০	২৯৪২	১৫৪৯	১৪৩৩	১৩.৭৪	০.১৮
	১৪. বামনগোলা	১২৭২৫২	১১২৮৭	৫৭৩৮	৫৫৪৯	৮.৮৭	০.৬৯
	১৫. গাজল	২৯৪৭১৫	৬৫৬৫০	৩৩৫০৯	৩২১৪১	২২.২৮	৪.০১
শহরাঞ্চল	১৬. ইংরেজবাজার	১৬১৪৫৬	১৭৯৪৪	৯২৬৩	৮৬৮১	১১.১১	১.১০
	১৭. ওল্ড মালদা	৬২৯৫৯	৭৯৫৪	৪০৯২	৩৪৬২	১২.৬৩	০.৪৯
মোট জনসংখ্যা		৩২৯০৪৬৮	১৬৩৬১৭১	৮৩৯১০২	৭৯৭০৬৯	৪৯.৭২	১০০.০০

উৎসঃ সেনসাস রিপোর্ট ২০০১, ধর্মভিত্তিক রিপোর্ট ২০০৫, ভারত সরকার, ভারত।

সারণিতে দেখা যাচ্ছে দুটি পৌরসভা ওল্ড মালদাতে ১২.৬৩ শতাংশ ও ইংরেজবাজার পৌরসভায় ১১.১১ শতাংশ মুসলিম জনগণ বসবাস করে। ২০০১ সেন্সাস অনুযায়ী মালদা জেলার

শহরাঞ্চলে মোট মুসলিম জনসংখ্যার মাত্র ১১.০৩ শতাংশ মুসলিম বসবাস করে, বাকি ৫২.৭৮ শতাংশ মুসলিম গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে সবথেকে কম সংখ্যক মুসলিম আছে হবিবপুর (১.২৩ শতাংশ), এছাড়াও ওল্ড মালদা (২৬.৩৬ শতাংশ), গাজোল (২২.২৮ শতাংশ), বামনগোলা (৮.৮৭ শতাংশ) খুব কম সংখ্যক মুসলিম জনগণ বসবাস করে। মালদা জেলার সবথেকে বেশি সংখ্যক মুসলিম জনগণের বসবাস হলো রতুয়া ১ (৬৫.২৮শতাংশ), কালিয়াচক ২ (৬৭.৫৩ শতাংশ), চাঁচল ২ (৬৯.৫৮ শতাংশ), চাঁচল ১ (৭০.০৬ শতাংশ), হরিশ্চন্দ্রপুর ২ (৭২.৬১ শতাংশ), রতুয়া ২ (৭৬.৬৬ শতাংশ), কালিয়াচক ১ (৮৮.৩৯ শতাংশ) ব্লক গুলিতে। এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ব্লগ গুলিতে মালদা জেলার প্রায় ৬৭.০১ শতাংশ মুসলিম জনগণ বাস করে।

উপরোক্ত সারণিতে আরো একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে তাল ও দিয়ার অঞ্চলে অধিকাংশ মুসলিম জনগণের বাসস্থান হলেও বারিন্দ এলাকা গুলি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবেই পরিচিত এবং এখানে তপশিলি জাতি উপজাতির জনগণের বাসস্থান পরিলক্ষিত হয়। তাল অঞ্চল যেখানে অধিকাংশ মুসলিম জনগণ সেখানে দিয়ারা অঞ্চলে মিশ্র সংস্কৃতি দেখা যায়। দিয়ারা অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম জনগণের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। আবার বারিন্দ অঞ্চল হল সর্বনিম্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। যেকোনো অঞ্চল বা এলাকার উন্নয়ন নির্ভর করে সেখানে অবস্থিত জনগণের ওপর। তাল, দিয়ারা অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের বসবাস হওয়ায় এখানে আঞ্চলিক প্রান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। মালদা জেলার নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্ণয় হেতু সূক্ষ্ম গবেষণার জন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল কালিয়াচক ১, রতুয়া ১, মানিকচক ও ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা) কে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে মালদা জেলার মুসলিম জনমানস, সমাজ ও সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

মালদহের মুসলিম সমাজ ও নারী

১২০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম বহিরাগতদের আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়। ফলে গৌড় পুন্ড্রবর্ধন বরেন্দ্র জাতিতাত্ত্বিক গঠনেও এক মিশ্রণ প্রক্রিয়া দেখা যায় এই সময় থেকেই, যা বরেন্দ্রের প্রাচীন জাতিতাত্ত্বিক গঠনকে অনেকটাই পরিবর্তন করে দেয়। এরপরে বহু সুফি সাধকদের সাথে মুসলিম সেনাবাহিনী, শাসক, ব্যবসায়ী ভারতে আসতে থাকে ও উত্তর ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করে। বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনগণ বাংলায় প্রবেশ করে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের সাথে রাজশক্তির সহায়তায় বাংলার সমাজে প্রতিপত্তিশালী মুসলিম জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে বাংলার মুসলিম জনগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ধর্মান্তরিত মুসলিম জনগণ। গৌড়, পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান সর্বস্ব যাগযজ্ঞ, বৈদিক রীতিনীতি, জাত পাত ভেদাভেদ নিচু তলার মানুষদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। ইসলামের বিজয়ের পর সুফি সাধকদের ধর্ম প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে জাতপাতহীন ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী হয় বরেন্দ্র অঞ্চলের অধিকাংশ জনগণ। ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলায় ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে বেভারলী তার সেন্সাস রিপোর্টে বলেছেন নদী তীরবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ মুসলিম ছিল হিন্দু ধর্মের নিচুতলা (চন্ডাল ও রাজবংশী) থেকে আগত।[৭৭] এছাড়াও তুর্কি শাসকদের প্রদেয় করের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বাংলার বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে বাংলার উত্তর পূর্বে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ধর্মীয়, সামাজিক কারণ ছাড়াও পার্থিব সুবিধা লাভের জন্য বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

মুসলিমদের বাংলা বিজয়ের পর ক্রমাগত পারস্য, আফগানিস্তান, তুর্কি থেকে আগত বহু সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা আরবীয় রক্তের সঙ্গে বাংলার

সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে ফলে মুসলিম শাসকদের শাসনকালে গৌড়কে কেন্দ্র করে মালদহ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মুসলিম জনগণের বিকাশ ঘটে। আরবীয় রক্ত বহনকারী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এই মুসলমানরা আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে ধর্মান্তরিত মুসলিমরা নিজস্ব পূর্ব রীতিনীতি বিসর্জন দিতে না পেরে নিজস্ব ও আরবীয় রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে এক মিশ্র আচার রীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এই মিশ্র আচাররীতিতে বিশ্বাসী মুসলিমগণকে নিয়েই মালদাহের মুসলিম সমাজ গঠিত।

ইসলাম ধর্মে আশরাফ বা অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের সৈয়দ, সুফি, শেখ, পাঠান, মোগল, আফগান, তুর্কি বংশোদ্ভূত বলে মনে করে। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নিজেকে সৈয়দ বংশোদ্ভূত বলে দাবি করতেন। সুফি জালালউদ্দিন তাবরিজী ও তার শিষ্যরা বাংলায় সুফীবাদের প্রচার করতে থাকে। শেখ আলাউল হক ও তার পুত্র হযরত নুর কুতুব আলম মালদহের পান্ডুয়ায় খানকা স্থাপন করে সুফী দর্শন ও ইসলাম প্রচার করতে থাকে এবং তাদের বংশধররা মালদহের বর্তমান বাসিন্দা। এছাড়াও মালদাহের তাল, দিয়াড়া অঞ্চলে বহু পাঠান মুসলিমরা শেখ উপাধি বহন করে। মুঘল আমলে তারা বিহারের দাঁড়ভাঙ্গা থেকে এসে মালদহে বসবাস শুরু করে। এদের মূল ভাষা খোট্টা। ইংরেজবাজার, মানিকচক, রতুয়া থানা এলাকার অনেক জায়গায় শেখ সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস। মুঘল সম্প্রদায়ের মুসলিমরা সাধারণত শেখ, বেগ, মির্জা উপাধি ব্যবহার করে। ইংরেজ বাজার ও পুরাতন মালদার বহু জায়গায় মুঘল বংশদ্ভূত মুসলিমদের দেখা যায়। পুরাতন মালদার মির্জাপুর অঞ্চলে মুঘল সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলিমরা বসবাস করে। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির সাথে বাংলা বিজয়ের সময় আগত তুর্কি মুসলিমরা মালদা সহ বাংলা সর্বত্র বসবাস শুরু করে।

অভিজাত সম্প্রদায়ের মুসলিম ছাড়াও ধর্মান্তরিত নিচু শ্রেণীর মুসলিম যারা আরজাল বা আজলাফ নামে পরিচিত বহু সংখ্যক মুসলিম জনগণের বসবাস মালদাহের সর্বত্র। আজলাফ বা আরজাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ জন হলেন জোলা, গয়সাল, তেলি, মোমিন, পটুয়া, ধবি, কুমোর,

দর্জি, পিঠারি, কলান্দার শ্রেণীভুক্ত। এছাড়াও মালদা জেলায় কাজী, মোল্লা, শেরশাবাদিয়া, নদেগোষ্ঠী শ্রেণীর মুসলিম জনগণও বাস করে। জোলা সম্প্রদায়ের মুসলিমরা সাধারণত শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি তৈরি করেন। মালদা জেলার কালিয়াচক অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মুসলিমরা এখনো প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করে। মালদহের সর্বত্রই আজলাফ বা আরজল সম্প্রদায়ের মুসলিমরা বিরাজ করছে। শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা বিহারের শেরশাহবাদ থেকে এসে বাংলার মানুষদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে এখানে বসবাস শুরু করে। মালদাহের কালিয়াচক, মানিকচক এবং রতুয়ার মত জেলার প্রায় সর্বত্রই বাদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর নদেগোষ্ঠী বা নারেগুষ্টি সম্প্রদায়ের মুসলিমরা নদীয়া জেলা থেকে এসে মালদা জেলার পান্ডুয়ায় বসতি স্থাপন করতে থাকেন, পরে সুলতান হোসেন শাহ তাদের ধর্মান্তকরণের শর্তে নির্দিষ্ট জমি দান করেন ও বসতি স্থাপনে আশ্বস্ত করেন। বর্তমানে মালদহের দলদলি গ্রামে এদের বসবাস দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও হোসেননা গোয়ালা সম্প্রদায়ের মুসলিমরা মালদহের কালিয়াচক থানার দেবীপুর, জালালপুর, সুজাপুর, ইংরেজবাজার থানার রায়পুর ও গোবিন্দপুর এলাকায় এই বিশেষ সম্প্রদায়ের মুসলিমরা বসবাস করে। এরা মূলত ধর্মান্তরিত মুসলিম হলেও হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করতে পারেনি। এই শ্রেণীর মুসলিমরা সাধারণত পশুর চামড়ার ব্যবসা করে। মালদা জেলার চালশা পাড়া অঞ্চলে এদের বসবাস।[৭৮]

অতএব এটি সহজেই অনুমেয় যে, মালদা জেলায় বসবাসকারী অধিকাংশই ধর্মান্তরিত মুসলিম। এই মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীর সামাজিক জীবন ও অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থানের চিত্র প্রায় একই রকম। মুসলিম পরিবার গুলিতে মেয়েদের ততধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় না, পুত্রসন্তানের গুরুত্ব সর্বাধিক। এই মানসিকতা বা চিন্তা ভাবনা অনেকটাই নির্ভর করে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতার উপর। যেহেতু নারীরা উপার্জনে অক্ষম সংসারের দায়-দায়িত্ব নিতে পারেনা, তাই পুত্রসন্তান লাভের লালসা

থেকেই যায়। মালদা জেলার নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করার জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা করি। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গেছে একজন মুসলিম নারী বারংবার কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে ঘরছাড়া করে এবং তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েটির ও তার কন্যা সন্তানের দায় দায়িত্ব নিতে তার স্বামী অস্বীকার করে। আরেকটি সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে এক নারীর করুন জীবন কাহিনীর কথা জানা যায়। কালিয়াচক থানার অন্তর্গত সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাষপাড়া গ্রামে অবস্থিত ওই নারীর কাছে জানা যায় ১২ বছর বয়সে বিবাহের পর ১৫ বছর বয়সে তার প্রথম কন্যা সন্তান হয়, তার দুই বছর পর তার আরও একটি কন্যা সন্তান জন্মায়। এরপরই নেমে আসা তার জীবনে অশনি সংকেত, স্বামী শ্বশুরবাড়ির লোকের নির্মম নিশংস অত্যাচার। হঠাৎ তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেয় ও ভরণপোষণের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। এখন সেই নারী ১২ বছর বয়সে বিবাহ ও কুড়ি বছর বয়সে তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর, তার জীবন যুদ্ধ এখনও বর্তমান। কৈশোরের লাবণ্য দীপ্ত এক মেয়ে কুড়ি বছর বয়সে দুই কন্যা সন্তানের জননী ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলা হয়ে কোনভাবে সামান্য উপার্জনের উপর ভিত্তি করে নিজের ও দুই কন্যার ভরণ পোষণ করে চলেছে। তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার পিতা-মাতা পরিজনরাও তাদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। ইসলাম ধর্মে নারীর সম অধিকার, সমসম্মানের কথা বলা হলেও সমাজের বাস্তব চিত্র কিন্তু ভিন্ন কথাই বলে। স্বাধীনোত্তর ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো মুসলিম সমাজের মন মানসিকতায় মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা বিরাজ করছে। কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হলেও মুসলিম সমাজের সামগ্রিক চিত্র এখনো বদলায় নি। নারী এখনো অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এর কারণ হিসেবে শিক্ষার অভাব ও উপার্জন হীনতাকে দায়ী করা যায়।

১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদহ জেলার শিক্ষার হারের পর্যালোচনা করলে শিক্ষার হারের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হবে।

সারণি ১২

শিক্ষার হারের অগ্রগতি (শতকরা হিসেবে)

সেন্সাস বছর	পশ্চিমবঙ্গ			মালদা জেলা		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
১৯৫১	৩৪.৬০	১৩.২০	২৪.৯০	১৮.১০	৫.০০	১১.৬৮
১৯৬১	৪৬.৫০	২০.৩২	৩৪.৫০	২৫.৭০	৭.০২	১৬.৬০
১৯৭১	৪৯.৫০	২৬.৫০	৩৮.৯১	২৯.৯০	১১.২০	২০.৮৬
১৯৮১	৫৭.১০	৩৪.৪০	৪৬.৩৪	৩৬.১০	১৬.৩০	২৬.৫২
১৯৯১	৬৭.৮০	৪৬.৬০	৫৭.৭৩	৪৫.৬০	২৪.৯২	৩৫.৬২
২০০১	৭৭.১০	৫৯.৬০	৬৮.৬৪	৫৮.৮০	৪১.২৫	৫০.২৮
২০১১	৮১.৬৯	৭০.৫৪	৭৬.২৬	৬৬.২৪	৫৬.৯৬	৬১.৭৩

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৫১-২০১১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও মালদা জেলায় শিক্ষিতের হার যথাক্রমে ২৪.৯০ শতাংশ ও ১১.৩৮ শতাংশ। ১৯৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের দিকে তাকালে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের মোট শিক্ষার হার ৪৬.৩৮% অপেক্ষা মালদা জেলার শিক্ষার হার ২৬.৫২ শতাংশ, যা অনেক কম। আবার ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার হার ৩৪.৪০ শতাংশ মালদায় নারী শিক্ষার হার ১৬.৩০ শতাংশ। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নারী শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হলেও, মালদা জেলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব কম ও ধীর গতিতে হয়েছে। তবে ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সেন্সাস রিপোর্টের দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই সময়কালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছে। ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সেন্সাস রিপোর্টে মালদা জেলা নারী শিক্ষার হার যথাক্রমে ২৪.৯২ শতাংশ, ৪১. ২৫ শতাংশ এবং ৫৬.৯৬ শতাংশ, যা পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার হার (৪৬.৭ শতাংশ, ৫৯.৬০ শতাংশ ৭০.৫৪ শতাংশ) থেকে

কম। বিগত তিন দশকে মালদা জেলার নারী শিক্ষার হার খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যবধান নজরে আসার মত। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী মালদা জেলার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৬.৯৭ শতাংশ, তার মধ্যে পুরুষ শিক্ষিতের হার ১৮.১০ শতাংশ এবং নারী শিক্ষার হার ৫ শতাংশ। স্বাধীনোত্তর কালে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সরকারি কমিশন ও কমিটি গুলি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যেসব সুপারিশ করেছে এবং সরকার কর্তৃক তা প্রয়োগের ফলে সমাজে নারী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠে, যার ফলস্বরূপ আমরা ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মালদা জেলার নারী শিক্ষার হারে বৃদ্ধি দেখতে পায়। সামগ্রিকভাবে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটলেও মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে হয়নি। ২০০১ এর সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় মালদা জেলার মুসলিম স্ত্রী শিক্ষার হার ছিল ৩৮.৬৮ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ছিল ৫১.৫৬ শতাংশ। আবার ২০১১ রিপোর্টে মালদা জেলার মুসলিম নারী শিক্ষার হার ৫৭.২০ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ৬৬.৮০ শতাংশ। ২০০১ সালের স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান প্রায় ১৩ শতাংশ এবং ২০১১ সালের শিক্ষার হারের ব্যবধান প্রায় ১০ শতাংশ। এর থেকে বোঝা যায় মুসলিম নারীরা শিক্ষাগত দিক থেকে পুরুষ সদস্যদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আবার মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হার ৪৭.৭৬ শতাংশ ও নারী শিক্ষার হার ৩৮.৪১ শতাংশ। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মুসলিম নারী শিক্ষার হার ৩৮.১৪ শতাংশ, অপরদিকে শহরাঞ্চলে শিক্ষার হার ৭৯.২৮ শতাংশ ও নারী শিক্ষার হার ৬৮.৪৬ শতাংশ যা অনেক কম। মুসলিম নারীদের শিক্ষার হার গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলে বেশি। তা সত্ত্বেও উপার্জনকারী কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর অপ্রতুলতা লক্ষণীয়।

মালদা জেলার মুসলিম নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান

অর্থনৈতিক অবস্থা হল কোন ব্যক্তি বা সমাজের জীবনযাত্রা সামাজিক মর্যাদা ও মানব সম্পদের উন্নতির পরিচায়ক। অর্থনৈতিক অবস্থানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলি হল কাজে যোগদানের হার, পেশাগত অবস্থান, উপার্জনের ক্ষমতা প্রভৃতি। এখানে মালদা জেলার মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার, উপার্জন ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একজন নারী বিভিন্ন উপায়ে অর্থনৈতিক কর্মে যোগদান করে। একজন গৃহকর্মী ও মা হিসেবে প্রতিনিয়ত পরিবারের সকলের পাশে থেকে যত্ন ও সেবা দিয়ে চলেছে, এইভাবে পরোক্ষভাবে পরিবারের উপার্জনের সাহায্য করে চলেছে। ঠিক একই ভাবে ব্যক্তিগতভাবে উপার্জনকারী কর্মে যোগদানের মাধ্যমে বা উপার্জনহীন পরিশ্রম দানের মাধ্যমে পরিবারের উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে চলেছে। গ্রাম্য এলাকায় যেখানে সমষ্টিগতভাবে কৃষিকাজ বা অন্যান্য কাজে যোগদান করা হয়, সেখানে নারীরা উপার্জনহীন কর্মী হিসেবে কাজ করে থাকে। যেহেতু নারীকে গৃহে ও বাইরে সর্বত্রই সমঝোতা করে ও সব রকম সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে হয় তাই নারী মুখ্য বা প্রধান কর্মী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না। গ্রামাঞ্চল অপেক্ষার শহরাঞ্চলে নারীদের মধ্যে কাজে অংশগ্রহণের প্রবণতা অনেক কম দেখা যায়। ফলে শহরের উচ্চবিত্ত ঘরের নারীদের থেকে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের নারীদের কাজে যোগদানের হার বেশি।

নারী বা পুরুষের কর্মে যোগদানের হার মোট জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক সক্রিয়তা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সক্রিয় কর্মীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়, মুখ্য কর্মী ও প্রান্তিক বা অস্থায়ী কর্মী। মালদা জেলার মুসলিম জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার ও সম্প্রদায় ভেদে নারীর কর্মে যোগদানের হার নিম্নোক্ত সারণীতে দেওয়া হল।

সারণি ১৩

মালদা জেলার ধর্ম ও লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার (শতকরা হিসেবে)

ধর্ম	কৃষিকাজ			কৃষি শ্রমিক			গৃহস্থালির কাজকর্ম			অন্যান্য		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
মোট	২০.৮৩	২৭.৫১	৭.৭৪	৩০.৭২	৩০.৫৯	৩০.৯৭	১৫.৬১	৪.৮৩	৩৬.৭৬	৩২.৮৪	৩৭.০৭	২৪.৫৩
হিন্দু	২১.৮১	২৭.৫৩	১০.১৮	৩৩.১৯	২৬.৫২	৪৬.৭৬	১০.৭৫	৪.৭৫	২২.৯৭	৩৪.২৫	৪১.২০	২০.০৯
মুসলিম	১৯.৪৭	২৭.০৯	৪.৮৮	২৭.৬০	৩৪.৬২	১৪.১৬	২০.৯১	৪.৯৭	৭৪.১৩	৩২.০২	৩৩.৩১	১৮.১১
খ্রিস্টান	৩৩.০৬	৪১.৬০	২২.৭১	৪০.২১	২৮.০০	৫৫.০১	৬.৭৪	৫.৯৫	৭.৬৯	২০.০০	২৪.৪৫	১৪.৫৯
শিখ	১১.৩১	১০.৯০	১৬.৬৭	৫.৩৬	৩.২১	৩৩.৩৩	১.৭৯	০.০০	২৫.০০	৮১.৫৫	৮৫.৯০	২৫.০০
বৌদ্ধ	৫.৮৮	৫.৮৮	৫.৮৮	১০.২৯	৯.৮০	১১.৭৬	২০.৫৯	১১.৭৬	৪৭.০৬	৬৩.৮৪	৭২.৫৫	৩৫.২৯
জৈন	১.০৬	০.০০	১৬.৬৭	১.০৬	১.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৭.৮৭	৯৮.৮৬	৮৩.৩৩

উৎসঃ সেন্সাস রিপোর্ট ২০০১, ভারত।

উপরোক্ত সারণিতে লক্ষ্যনীয় যে, মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর তুলনায় কম। ২০০১ এর সেন্সাস অনুযায়ী মুসলিম নারীর মাত্র ৪.৮৮ শতাংশ নারী কৃষিকাজ, ১৪.১৬ শতাংশ নারী কৃষি শ্রমিক ও ৭৪.১৩ শতাংশ গৃহস্থালির কাজকর্মের সাথে যুক্ত। সারণিতে লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম নারীর বেশি সংখ্যক সদস্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর তুলনায় গৃহস্থালির কাজকর্মের সাথে যুক্ত। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা নারীকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে।[৭৯] মালদা জেলার মুসলিম নারীর অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে রেশম গুটি শিল্প ও বিড়ি শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগদান করে। ২০০১ এর আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী মালদা জেলার ১.৮২ লক্ষ মুসলিম নারী বিড়ি শ্রমিক হিসেবে কর্মরত।[৮০] খুব কম সংখ্যক নারী অর্থ উপার্জনকারী কর্মের সাথে যুক্ত রয়েছে।

মালদা জেলার মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার অঞ্চলভেদে মুসলিম জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। ২০০১ এর সেন্সাস রিপোর্টে মালদা জেলার ব্লক অনুযায়ী নারী পুরুষের কাজের যোগদানের হার মুখ্য ও প্রান্তিক কর্মী হিসেবে কর্মে যোগদানের হার ও লিঙ্গ ব্যবধান নিম্নের সারণির মাধ্যমে দেওয়া হল। মুখ্য কর্মী হিসেবে নারীদের খুব কম সংখ্যক যুক্ত, প্রান্তিক কর্মী হিসেবে নারীদের সংখ্যাধিক্ক্য লক্ষ্য করা যায়। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের মহিলারা অর্থনৈতিক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেও তাদের কাজের প্রকৃতি সাময়িক এবং তাদের সারা বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জনকারী কাজে যোগ দিতে দেখা যায় না বা যোগদানের প্রকৃতি হল প্রান্তিক কর্মী হিসেবে। মালদা জেলার কালিয়াচক অঞ্চলের তিনটি ব্লকে দেখা যায় বহু নারী মুখ্য কর্মী হিসেবে বিড়ি শ্রমিক ও রেশম শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে সারা বছর কাজে যোগ দিয়ে থাকে, সেইভাবে এই অঞ্চলের বহু নারী সাময়িক প্রান্তিক কর্মী হিসেবে চাষবাসের কাজে বা কৃষিজ কর্মী হিসেবে কাজ করে কারণ এই অঞ্চলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে কর্মের যোগান খুব কম। আবার কালিয়াচক ১ ব্লকের মহিলাদের সর্বোচ্চ মুখ্যকর্মী হিসেবে কাজের যোগদান দেখা যায় কারণ এখানে গৃহস্থালি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজকর্ম যেমন- বিড়ি বাঁধানো, রেশম শিল্পের সুযোগ রয়েছে, এছাড়াও প্রান্তিক কর্মী হিসেবেও নারীদের সর্বোচ্চ কাজে যোগদানের হার বেশি দেখা যায়। কালিয়াচক অঞ্চলে অকৃষিজ কাজকর্মে অধিক সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ২০০১ এর আদমশুমারি রিপোর্টে মালদা জেলার কর্মে যোগদানের হারের দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় মালদা জেলার ব্লক গুলির মধ্যে কালিয়াচক ১ ব্লক হল সর্বোচ্চ পরিমাণ মুখ্যকর্মী হিসেবে যোগদানের সুযোগ থাকায় প্রায় ১.২৫ লক্ষ মানুষ মুখ্যকর্মী হিসেবে কর্মে যুক্ত। কালিয়াচক ১ ব্লকে পুরুষদের কর্মে যোগদানের হার বেশি দেখা গেলেও মহিলাদের তুলনায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে তা অনেক কম। সর্বনিম্ন মহিলা কর্মীর কর্মে যোগদানের হার দেখা যায় রতুয়া ১ ব্লক (৯.৮ শতাংশ) ও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (৯.৮শতাংশ)। অতএব কর্মের যোগদানের হারের লিঙ্গ ব্যবধানও এই দুটি ব্লকে বেশি। মালদা জেলার অন্যান্য ব্লকের থেকে কালিয়াচক ১, ২, ৩, ব্লকের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সেখানে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মহিলা

কৃষিকাজে যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে নারীদের যেখানে মুখ্য কর্মী হিসেবে কর্মে যোগদানের হার খুব কম দেখা যায়, সেখানে কালিয়াচক অঞ্চলে অকৃষিজ কর্মে মুখ্য কর্মী হিসেবে মহিলাদের কর্মে যোগদানের হার বেশি পরিলক্ষিত হয়।

সারণি ১৪

মালদা জেলার ব্লক অনুযায়ী লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মে যোগদানের হার (শতকরা হিসেবে)

ব্লক	মুখ্য কর্মী			প্রান্তিক কর্মী		
	পুরুষ	নারী	ব্যবধান	পুরুষ	নারী	ব্যবধান
হরিশ্চন্দ্রপুর ১	৯০.২	৯.৮	৮০.৩	৩৯.১	৬০.৯	২১.৮
হরিশ্চন্দ্রপুর ২	৮৭.৬	১২.৪	৭৫.১	২৯.৫	৭০.৫	৪১.০
চাঁচল ১	৮৯.৩	১০.৭	৭৮.৫	৪০.৭	৫৯.৩	১৮.৫
চাঁচল ২	৮৫.৭	১৪.৩	৭১.৪	৩৪.৩	৬৫.৭	৩১.৩
রতুয়া ১	৯০.১	৯.৯	৮০.২	৪৪.২	৫৫.৮	১১.৬
রতুয়া ২	৮৫.৪	১৪.৬	৭০.৮	৩৫.৭	৬৪.৩	২৮.৬
মানিকচক	৮১.৫	১৮.৫	৬৩.১	৪১.৩	৫৮.৭	১৭.৪
ইংরেজ বাজার	৮৪.০	১৬.০	৬৮.১	৪৪.০	৫৬.০	১১.৯
ওল্ড মালদা	৭৯.৮	২০.২	৫৯.৬	৩৯.৫	৬০.৫	২১.১
হবিবপুর	৭৩.০	২৭.০	৪৬.০	৩০.০	৭০.০	৪০.১
বামনগোলা	৮২.৯	১৭.১	৬৫.৭	৩৩.০	৬৭.০	৩৪.১
গাজল	৮৪.৪	১৯.২	৬৫.২	৩১.৩	৬৮.৭	৩৭.৫
কালিয়াচক ১	৫৮.১	৪১.৯	১৬.১	৩৯.৩	৬০.৭	২১.৪
কালিয়াচক ২	৭১.৬	২৮.৪	৪৩.২	৩০.০	৭০.০	৩৯.৯
কালিয়াচক ৩	৬৬.১	৩৩.৯	৩২.০	৩০.৬	৬৯.৪	৩৮.৮

উৎসঃ সেন্সাস রিপোর্ট ২০০১, ভারত।

কিন্তু প্রান্তিক কর্মী হিসেবে নারীর কর্মে যোগদানের হার মালদা জেলার সবগুলি ব্লকে মোটামুটি একই। সর্বোচ্চ প্রান্তিক কর্মী হিসেবে মহিলাদের কর্মে যোগদানের হার হরিশ্চন্দ্রপুর ১,

হবিবপুর ও কালিয়াচক ২ ব্লকে দেখা যায়। এর থেকে প্রতিভাত হয় যে অর্থনৈতিক চাহিদা ও জনসংখ্যার চাপ দুটোই গ্রামাঞ্চলের পরিবারের নারী ও পুরুষ উভয়কেই কাজের সন্ধানে ও কর্মে যোগদানে বাধ্য করে। যেহেতু গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী কাজের সুযোগ সীমিত তাই গ্রামাঞ্চলের মহিলারা অধিকাংশই প্রান্তিক কর্মী হিসেবে কর্মে যোগদান করে থাকে। উপরোক্ত সারণিতে কর্মের যোগদানের হারের লিঙ্গ ব্যবধান স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মালদা জেলার এলাকা বিশেষে কর্মে যোগদানের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজ জমির অভাব থাকায় দিয়ারা অঞ্চলে অবস্থিত অধিকাংশ মুসলিম জনঘনত্ব বহুল এলাকায় মুসলিম নারীরা কৃষিকাজের বাইরে বেতনভুক্ত কর্মী হিসেবে বিভিন্ন কর্মে যোগদান করে। তাই দিয়ারা অঞ্চলের কালিয়াচক ব্লকে মুসলিম নারীদের মুখ্য ও প্রান্তিক কর্মী হিসেবে কর্মে যোগদানের হার বেশি হলেও লিঙ্গ ব্যবধানও স্পষ্ট পরিলক্ষিত। প্রান্তিক কর্মীর তুলনায় মুখ্য কর্মী হিসেবে লিঙ্গ ব্যবধান অত্যাধিক। তবে বারিন্দ অঞ্চলে নারীদের মুখ্য কর্মী বা স্থায়ী কর্মী হিসেবে যোগদানের হার কম এবং তারা দারিদ্রতার কারণে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় অস্থায়ী বা প্রান্তিক কর্মী হিসেবে কাজে যোগদান করে। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে অধিকাংশ মহিলা যারা বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী প্রান্তিক কর্মী হিসেবে বা কৃষি শ্রমিক হিসেবে যোগদান করে তারা বেতনের দিক থেকে বা অন্যান্যভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যদিও বিভিন্ন অকৃষিজ কাজকর্ম যেমন বিড়ি শ্রামিক হিসেবে মহিলারা কম বৈষম্যের শিকার এবং এটি তাদের গৃহের মধ্যেই কর্মে যোগদানের সুযোগ দিয়ে থাকে। দিয়ারা অঞ্চলের অধিকাংশ নারীই এইরকম বিভিন্ন অকৃষিজ কাজকর্ম যেমন বিড়ি শিল্প, রেশম শিল্প, দর্জি প্রভৃতি কাজের সাথে যুক্ত এবং গৃহস্থালির কাজকর্ম ও উপার্জনকারী কাজ একসঙ্গে করতে গিয়ে অত্যাধিক পরিশ্রম তাদের স্বাস্থ্যের হানি ঘটাতে থাকে।

উপরোক্ত সারণিতে পরিলক্ষিত যে সর্বাপেক্ষা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে মুসলিমদের কর্মে যোগদানের হার সবচেয়ে কম। এই বিষয়টি গবেষক নাজমুল হাসান তার গবেষণাপত্র

‘*Muslim & Non-Muslim Differentials in Education, Employment & Fertility in Malda District, West Bengal (india)’* সুক্ষভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি সমীক্ষা দ্বারা মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকের মুসলিম অমুসলিম নারী পুরুষের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজে যোগদানের হার বিশ্লেষণ করেছেন।

সারণি ১৫

মালদা জেলার ব্লক অনুযায়ী মুসলিমদের কর্মে যোগদানের হার (শতকরা হিসেবে)

ব্লক	কর্মে যোগদানের হার			জনসংখ্যার ভিত্তিতে কর্মে যোগদানের হার					
				মুখ্য বা স্থায়ী কর্মী			অস্থায়ী বা প্রান্তীয় কর্মী		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
১. হরিশ্চন্দ্রপুর ১	৪৫.৯১	১৮.০২	৩১.৯০	৩৭.৭৩	৮.১১	২২.৮৫	৮.১৮	৯.৯১	৯.০৫
২. হরিশ্চন্দ্রপুর ২	৪২.১৭	২৫.১৫	৩৩.৮২	৩৩.০৫	১০.৬৫	২২.০৬	৯.১২	১৪.৫০	১১.৭৬
৩. চাঁচল ১	৪৭.১৬	২৭.৮০	৩৭.৮১	৪১.৪৯	১৪.০৬	২৮.২৪	৫.৬৭	১৩.৭৪	৯.৫৭
৪. চাঁচল ২	৪৫.৩৩	২২.০৭	৩৩.৮৫	৩৯.৬২	১০.৯৪	২৫.৪৬	৫.৭১	১১.১৩	৮.৩৯
৫. রতুয়া ১	৪৩.৭১	১৮.০৬	৩০.৯৫	৩৫.৪৩	৮.০৩	২১.৮০	৮.২৮	১০.০৩	৯.১৫
৬. রতুয়া ২	৪৮.০২	২৬.৬৭	৩৭.৯৬	৩৭.৬২	১৪.৪৪	২৬.৭০	১০.৪০	১২.২২	১১.২৬
৭. মানিকচক	৪৭.২৮	৩০.২৬	৩৯.০২	৩৯.১৩	১৩.৮৩	২৬.৮৫	৮.১৫	১৬.৪৩	১২.১৭
৮. ইংরেজ বাজার	৪৫.১৬	২৯.০৫	৩৭.২৪	৩৭.৩৩	১৫.২৪	২৬.৪৬	৭.৮৩	১৩.৮১	১০.৭৭
৯. ওল্ড মালদা	৩৭.৯০	২৯.৫৭	৩৩.৮৯	২৯.৮৪	১৯.১৩	২৪.৬৯	৮.০৬	১০.৪৩	৯.২১
১০. হবিবপুর	৩৮.২৪	২৮.১৩	৩৩.৩৩	২৯.৪১	১৫.৬৩	২২.৭৩	৮.৮২	১২.৫০	১০.৬১
১১. বামনগোলা	৪০.৭৮	২৬.৮৮	৩৪.১৮	৩৩.০১	১২.৯০	২৩.৪৭	৭.৭৭	১৩.৯৮	১০.৭১
১২. গাজল	৪১.৫৬	২৯.৬৭	৩৫.৮১	৩২.১৯	১২.০০	২২.৪২	৯.৩৮	১৭.৬৭	১৩.৩৯
১৩. কালিয়াচক ১	৪২.৪৫	২৯.৬৩	৩৬.৪৪	৩৫.১০	১৭.৫৯	২৬.৯০	৭.৩৫	১২.০৪	৯.৫৪
১৪. কালিয়াচক ২	৪২.৭৫	৩০.৯৬	৩৭.১৩	৩৩.৫৯	২৩.৮৫	২৮.৯৪	৯.১৬	৭.১১	৮.১৮
১৫. কালিয়াচক ৩	৪১.১৮	৩২.৮৭	৩৭.১৬	৩২.৬৮	১৯.৫৮	২৬.৩৫	৮.৫০	১৩.২৯	১০.৮১
গ্রামাঞ্চল	**৪৪.১৪**	**২৬.২৭**	**৩৫.৪৫**	**৬৩.২১**	**১৩.৫৪**	**২৫.১৯**	**৭.৯২**	**১২.৭৩**	**১০.২৬**
১. ইংরেজ বাজার (পৌর এলাকা)	৪০.৮৭	২৪.৭৮	৩২.৮৯	৩৩.০৪	১৫.৯৩	২৪.৫৬	৭.৮৩	৮.৮৫	৮.৩৩
২. ওল্ড মালদা (পৌর এলাকা)	৪২.৩৭	২৬.৩২	৩৪.৪৮	৩৪.৭৫	১৭.৫৪	২৬.২৯	৭.৬৩	৮.৭৭	৮.১৯
শহরাঞ্চল	**৪১.৬৩**	**২৫.৫৫**	**৩৩.৭০**	**৩৩.৯১**	**১৬.৭৪**	**২৫.৪৩**	**৭.৭৩**	**৮.৮১**	**৮.২৬**
মোট	৪৩.৯৯	২৬.২৩	৩৫.৩৫	৩৬.০৮	১৩.৭৩	২৫.২১	৭.৯১	১২.৪৯	১০.১৪

উৎসঃ Hussain Najmul, *Muslim & Non-Muslim Differentials in Education, Employment & Fertility in Malda District, West Bengal (india),* Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing House, 2011, p.224. থেকে সংগৃহীত।

গবেষক নাজমুল হুসেনের সমীক্ষা থেকে প্রতিভাত হয় যে মালদা জেলার মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে অধিকাংশ মহিলা দিনের দীর্ঘসময় গৃহস্থালির কাজকর্মে অবেতনভুক্ত কর্মী হিসেবে ব্যস্ত থাকে।[৯৪] উপরোক্ত সারণিতে পরিলক্ষিত হয় যে মুসলিম নারীর গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে কর্মে যোগদানের হার যথাক্রমে ২৬.৭৭ শতাংশ ও ২৫.৫৫ শতাংশ। কাজের সুযোগ কম থাকার সাথে সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় যেমন পর্দা প্রথা, ঐতিহ্যগত সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি মুসলিম নারীর কর্মে কম যোগদানের জন্য দায়ী। এছাড়াও আরও একটি বিষয় মুসলিম নারীর কম কাজে যোগদানের জন্য দায়ী তা হল অতিরিক্ত পরনির্ভরশীলতা ও অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ। ফলে নারীর সর্বদাই গৃহে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। ব্লক ও এলাকা ভিত্তিক মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হারের তারতম্য দেখা যায়। নাজমুল হাসানের সমীক্ষা থেকে বোঝা যায় মুসলিম নারীর স্থায়ী মুখ্য কর্মী হিসেবে কর্মে যোগদানের হার সবথেকে বেশি কালিয়াচক ২ ও ওল্ড মালদা ব্লকে।[৯৫] আবার অস্থায়ী কর্মী হিসেবে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকে বেশি সংখ্যক মুসলিম নারীর যোগদান দেখা যায়। এটি কর্মের সুযোগ ও অর্থনৈতিক চাহিদার জন্যই এই তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনা করার জন্য আমরা চারটি ব্লক কালিয়াচক ১, রতুয়া ১, মানিকচক ও ইংরেজবাজার পৌর এলাকায় মুসলিম নারীদের ওপর সমীক্ষা করা হয়েছে এবং কাজের ভিত্তিতে তাদের বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা নিম্নোক্ত সারণিতে পরিষ্কার উল্লেখিত।

মালদা জেলার মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের হার (শতকরা হিসেবে)

কৃষিকাজ- ২.৩৩ শতাংশ

কৃষি শ্রমিক- ২.৬১ শতাংশ

পারিবারিক ব্যবসা- ০.৪০ শতাংশ

সরকারি চাকরি- ০.৮০ শতাংশ

বেসরকারি চাকরি- ০.১৫ শতাংশ

অস্থায়ী শ্রমিক- ৮.৯০ শতাংশ

শুধুমাত্র গৃহস্থালির কাজকর্ম- ৪৫.৪৭ শতাংশ

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী- ০.৩০ শতাংশ

কাজে অক্ষম (শিশু/বয়স্ক)- ৩২.৩১ শতাংশ

অনুমোদনহীন কর্মী- ০.০ শতাংশ

অন্যান্য- ১০.১২ শতাংশ

বেকার- ৫.১৫ শতাংশ

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২১ শে মার্চ ২০২২ – ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২)

সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে মুসলিম নারীর কাজের পরিসর ও যোগদানের হার বিভিন্ন। তবে উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিষয় পরিলক্ষিত যে মুসলিম নারীরা সর্বাধিক সংখ্যক গৃহস্থালির কাজে যুক্ত। গ্রামাঞ্চল অর্থাৎ মানিকচক, রতুয়া ১ ও কালিয়াচক ১ ব্লকের কিছু জায়গায় মুসলিম নারীদের কৃষিকাজ ও কৃষি শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হতে দেখা গেলেও ইংরেজবাজার পৌর এলাকার মুসলিম নারীরা অধিকাংশই অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই বহু নারী ও পুরুষ কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগদান করে। সূক্ষ্মভাবে গবেষণার

জন্য মানিকচক, রতুয়া ১, কালিয়াচক ১ ব্লক ও ইংরেজবাজার পৌর এলাকার মুসলিম নারীর বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকার বিষয়টি নিম্নের সারণির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে-

সারণি ১৬

মালদা জেলার মুসলিম নারীর বিভিন্ন ধরনের কর্মে যোগদানের হার (শতকরা হিসেবে)

ব্লক	চাষী	কৃষি শ্রমিক	ব্যবসা	বেতনভুক্ত সরকারী কর্মী	বেতনভুক্ত বেসরকারী কর্মী	অন্যান্য	মুখ্য বা স্থায়ী কর্মী	অস্থায়ী বা প্রান্তিক কর্মী
রতুয়া ১	২.০১	৩.৮০	০.৯০	৩.২৫	৫.২৫	৯.৭৯	১৫.২৫	১০.৭৫
মানিকচক	৩.২০	৩.৫০	১.১০	২.৫০	৪.৩৫	১০.৩৫	১৬.৭০	৮.৩০
কালিয়াচক ১	২.৫০	১.২৫	২.৭৫	২.৩৫	৩.৩৫	১২.৫০	১১.২০	১৩.৮০
ইংরেজ বাজার (পৌর এলাকা)	০.০২	০.৭০	২.৫০	৪.৭৫	৬.৬০	১০.২৫	১১.২৫	১৩.৭৫

উৎসঃ ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২১ শে মার্চ ২০২২ – ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২)।

উপরোক্ত সারণি থেকে স্পষ্ট যে খুব কম সংখ্যক মুসলিম নারী চাষবাস বা ব্যবসার সাথে যুক্ত সরকারি অথবা বেসরকারি ক্ষেত্রে বেতনভুক্ত কর্মী হিসেবে শহরাঞ্চলের মুসলিম নারীদের অধিক সংখ্যক যোগদান দিতে দেখা গেলেও মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলের ব্লকগুলিতে তার পরিসংখ্যান খুব কম। এর কারণ হিসেবে শিক্ষার অভাব ও সুযোগের অভাবকেও দায়ী করা যেতে পারে। তবে অন্যান্য কাজ যেমন ১০০ দিনের কাজ, বিড়ি শিল্প, রেশম শিল্প, সাধারণ শ্রমিক হিসেবে বহু মুসলিম নারীর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কালিয়াচক ১, ইংরেজবাজার পৌর এলাকার বহু মুসলিম নারী আয়া সেবিকা, গৃহের পরিচারিকা হিসেবে ও বেতনভুক্ত কর্মী হিসেবে নিযুক্ত। স্থায়ী অথবা মুখ্য কর্মী হিসেবে মুসলিম নারীর কাজে যোগদানের হার খুব কম। মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে মুসলিম নারীর কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা যায়। কালিয়াচক ১ ও ইংরেজবাজার পৌর এলাকায় মুখ্য বা স্থায়ী বেতনভোগী মুসলিম নারীকর্মীর সংখ্যা অস্থায়ী কর্মীদের তুলনায় বেশি। অপরদিকে মানিকচক, রতুয়া ১ ব্লকের মুসলিম নারীরা অধিকাংশই

অস্থায়ী বা প্রান্তিক কর্মী হিসেবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত, এর কারণ হিসেবে বলা যায় কাজের সুযোগের অপ্রতুলতা ও শহরাঞ্চল থেকে দূরে অবস্থান।

ক্ষেত্র সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বলা যায় মুসলিম নারীরা অনেকেই স্থায়ী কর্মী হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুক্ত। এটি অবশ্যই উল্লেখিত যে সমস্ত জায়গা শহরাঞ্চল বা তার আশেপাশে অবস্থিত সেখানে মুসলিম নারীরা নির্দিষ্ট আয়যুক্ত কাজ যেমন- শিক্ষিকা, শাকসবজি বিক্রেতা, দর্জি, গৃহ পরিচারিকা প্রভৃতি কাজের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে যে সমস্ত এলাকা শহরাঞ্চল থেকে দূরে অবস্থিত, সেখানে মুসলিম নারীরা সম্পূর্ণভাবে কৃষিকাজ ও কৃষি শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত।[৮২] সমীক্ষা দ্বারা আরও স্পষ্ট বোঝা গেছে মালদা জেলার খুব কম সংখ্যক মুসলিম নারী সাধারনত শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত এবং মুসলিম নারীর বেতনভুক্ত কাজে যোগদানের হার খুব কম। মালদা জেলার অধিকাংশ মুসলিম নারী গৃহস্থালির কাজকর্ম যেমন পরিবারের কাজকর্ম, সন্তান লালন-পালনে অধিক সময় ব্যয় করে ফলে গৃহস্থালির চার দেয়ালের বাইরে গিয়ে সামাজিক কাজকর্ম বা নির্দিষ্ট আয়যুক্ত কোন কাজে যোগদানের সুযোগ কম এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন বিধি নিষেধের চাপে পড়ে নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা বা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। তবে যে সমস্ত পরিবার গুলি শিক্ষিত ও আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন সেই সমস্ত মেয়েরা পরিবারের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন থেকে শুরু করে নিজস্ব মান মর্যাদা রক্ষা করতে তৎপর ও নিজেকে সাবলম্বী করতেও সচেষ্ট। তাই উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ধর্মীয় কারণ অপেক্ষা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীর আর্থসামাজিক পশ্চাদপদতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলিতে মুসলিম নারীদের স্বাবলম্বী করার প্রয়াস করা হলেও মুসলিমের অবস্থা সেরকম পরিবর্তন হয়নি। তাই উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা বলা যায়, মালদা জেলার মুসলিম নারী নিম্ন আর্থিক অবস্থানের জন্য ধর্মীয় সামাজিক অবস্থা সাথে সাথে নিজস্ব ইচ্ছার অভাবকেও দায়ী করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Engineer Ashgar Ali, *Muslim Minority Continuity and Changes*, Delhi, Gyan Publishing House, 2009, pp.148-149.

২. Weber Max, *Class, Status, Party,* in Gerth H. H. & Mill C. Wrigth (eds.), *Essays in Sociology*, New York, Oxford University Press, 1946, pp.186-195.

৩. Sassen Sskia, *Towards Sociology of Information Technology*, Current Sociology, vol.50, Issue 3, May 2002, https://doi.org/10.1177 retrived on 21.10.2023.

৪. GOI, *Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India*, New Delhi, Social Welfare Department, 1974, p.6.

৫. Sassen Sskia, প্রাগুক্ত।

৬. Agarwal Sushila, *Status of Women*, Jaipur, Print Well Publishers, 1988, pp.172-180.

৭. Giri Nivedita, *Laws Institution and Women Rights in India*, in Biswal Tapan (ed.), *Laws Institutions and Women Rights in India*, New Delhi, Viva Books, 2006, pp.207-215.

৮. Chaturvedi Archana, *Encyclopedia of Muslim Women*, Delhi, Common Wealth Publishers, 2003, p.130.

৯. Jain Shashi, *Status and Role Perceptions of Middle Class Women*, New Delhi, Puja Publishers, 1988, p.328.

১০. Roy Shibani, *Status of Muslim Women in North India: A Study in Dynamics of Change*, New Delhi, B. R. Publishers Corporation, 1979, p.139.

১১. GOI, *Social Economic and Educational Status of the Muslim Community of India*, New Delhi, Prime Minister's High Level Committee Cabinet Secretariat, 2006, pp.30- 49.

১২. Kazi Seema, *Muslim Women in India, London*, Minority Rights Group International, 1999, p.325.

১৩. Jawad Haifa, *The Rights of Women in Islam*, New York, St. Martin's Press, 1998, p.125.

১৪. হোসেন আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭)*, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৬, পৃ.১১।

১৫. হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের আগে আরব সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে যে অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল তাকে জাহেলিয়া যুগ বলা হয়।

১৬. Levy Reuven, *The Social Structure of Islam*, Cambridge, Cambridge University Press, 1967, pp.90-91.

১৭. Umari M.S. Jalaluddin, *Women and Islam* (translated by Dr. Parvez Mandviwala), New Delhi, Markazi Maktab Islami Publishers, 2017, p.15.

১৮. Khan Qamaruddin, *Status of Women in Islam*, New Delhi, Sterling Publishers, 1990, p.16.

১৯. Gibraltar, *The Massage of the Quran,* Muhammmad Asad, London, E.J. Brill Publishers, 1980, p.933.

২০. Farooqi Ifta Rashid, *Position of Women in ISLAM*, New Delhi, Adam Publishers & Distributers, 2011, p.8.

২১. Al Qur'an, 17:31.

২২. হোসেন আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২৩. Shustery A. M. A., *Out Lines of Islamic Culture*, Vol. II, Philosophical and Technologycal Aspects, Bangalore, The Bangalore Press, 1938, p.674.

২৪. Subbama Mallabi, *Islam and Women*, New Delhi, Sterling Publishers, 1988, p.128.

২৫. Umari M.S. Jalaluddin, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২৬. Tabassum M. Samiya, *Status of Muslim Women in India: Law Relating to Marriage, Divorce and Maintenance,* New Delhi, Regal Publications, 2013, pp.22-23.

২৭. Imran Muhammad, *Ideal Women in Islam*, London, Islamic Publishers Ltd., 1981, p.8.

২৮. Al Qur'an, প্রাগুক্ত, ৩:১৯৫।

২৯. Al Qur'an, তদেব, ৪:১।

৩০. Ahmed Naseem, *Women in Islam,* New Delhi, APH Publishing Corporation, 2003, p.18.

৩১. Pickthal M. M., *Cultural Side of Islam,* Delhi, Kitab Bhavan, 1927, p.143.

৩২. Al Qur'an, প্রাগুক্ত, ২:২২৮।

৩৩. Umari M.S. Jalaluddin, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬।

৩৪. Al Qur'an, প্রাগুক্ত, ২:১৮৭।

৩৫. Engineer Ashgar Ali, Islam, *Women and Gender Justice*, New Delhi, Sterling Publishers, 1987, p.278.

৩৬. Chaturvedi Archana, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩।

৩৭. Qureshi Muniruddin, *Women in Islam,* New Delhi, Reference Press, 2003, p. 103.

৩৮. Ahmed Naseem, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৩৯. Ahmed Naseem, তদেব, পৃ.৭২।

৪০. Jayaraj Nirmala, *Women and Society,* Madurai, Lady Doak College, 2001, p.2.

৪১. হোসেন আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯।

৪২. Ali Mohammad Mohar, *History of Muslims in Bengal: A Survey of Administrative Society and Culture,* Riyad, Dept. of Culture & Publications, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic Society, 1985, pp.331-354.

-----সরকার চণ্ডী প্রসাদ, *বাঙালি মুসলমান (১৮৬৩-১৯৪৭)*, কলকাতা, মিত্রম, ২০০৭, পৃ.১৯।

৪৩. Karim Abdul, *Social History of the Muslims in Bengal, Down To 1558,* Dacca, The Asiatic Society of Pakistan, 1959, p.193.

৪৪. সরকার চণ্ডী প্রসাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯।

৪৫. সরকার চণ্ডী প্রসাদ, তদেব, পৃ.২৩।

৪৬. সরকার চণ্ডী প্রসাদ, তদেব, পৃ.২৬।

৪৭. Hunter W. W., *The Indian Musalmans,* London, Trubner & Company, 1872, p.27.

----Dey Amalendu, *Roots of Separatism in 19th Century Bengal,* Calcutta, Ratan Prokashan, 1974, p.119-123.

৪৮. *General Report of the Public Instruction, Bengal*, 1875-76, 1884-85, Calcutta, Bengal Secratariat Press.

৪৯. আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,* দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ.৫২-৫৬।

৫০. Ikramullah Shaista, *Behind the Veil*, Karachi, Oxford University Press, 1992, pp.3-4. And *From Purda to Parliament*, London, Cresset Publishers, 1963, pp.1-5.

৫১. Murshid Gulam, *Reluctant and Debutant: Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905,* Rajshahi, Rajshahi University Press, 1983, p.12.

৫২. Hunter W. W., *Stastical Account of Bengal,* Vol.VI, Noakhali, New Delhi, Govt. of India, 1973, p.79.

৫৩. কানিজ সাইয়েদা মুস্তাফা, *ইসলামে নারীর অধিকার,* কলকাতা, বাণী প্রকাশ, ১৯৮৮, পৃ.৯৪-৯৫।

৫৪. *ইসলাম প্রচারক,* ১৯০৯।

৫৫. সরকার চণ্ডী প্রসাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭-২৯।

৫৬. সাহিত্যিক ফাল্গুন, ১৩১১, *নারী শিক্ষা সমিতির সভানেত্রীর ভাষণ।*

৫৭. রফিক আব্দুল, *নারী শিক্ষা বিস্তারে পথিকৃৎ ফয়েজুন্নেসা,* খোঁজ, নববর্ষ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১২-১১৩।

৫৮. Jahangir K.N., *Muslim Women in West Bengal*, Kolkata, Minerva Publication, 1991, p.46.

৫৯. Hasan & Menon, *In A Minority, Delhi,* Oxford University Press, 2004, p.134.

৬০. Hashia Haseen (ed.), *Muslim Women in India since Indipendence,* New Delhi, Genuine Publication & Media pvt. Ltd, 1998, p.132.

৬১. Engineer Ashgar Ali, *Muslim Minority Continuity and Change,* New Delhi, Gyan Publishing House, 2009, p.148.

৬২. Engineer Ashgar Ali, তদেব, p.163.

৬৩. Engineer Ashgar Ali, প্রাগুক্ত, p.176.

৬৪. Azim S., *Muslim Women Emerging Identity,* New Delhi, Rawat Publication, 1997, p.124.

৬৫. কাদির আব্দুল (সাঃ), *বেগম রোকেয়াঃ অবরোধবাসিনী,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ৪২০।

৬৬. Roy Shibani, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৬৭. Levy Reuven, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭.

৬৮. A Shariff, National sample Survey Organization (NSSO), 43rd Round, 1987-88, quoted in Sebastian Vempery, *Minorities in Contemporary India*, New Delhi, Kanishka, 2003, p.92.

৬৯. *Census of India 1991*, p. 156.

৭০. ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা,* কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০২০, পৃ.৭৮।

৭১. ঘোষ তুষারকান্তি, তদেব, পৃ.৭৮-৮৪।

৭২. ঘোষ তুষারকান্তি, তদেব, পৃ. ১৭৪।

----মিশ্র সমর কুমার, *মালদা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ.১২৩।

৭৩. সোম সুস্মিতা, *মালদহঃ জাতি, সম্প্রদায় ও কুটির শিল্প,* কলকাতা, সোপান, ২০১১, পৃ.১৩।

৭৪. Siddiqui F. A. and Hussain N., *Literacy and Socio-Economic Marginalization of Muslim Population in Malda District, West Bengal, India*, Arab World Geographer, Vol.12, No.1-2, 2009, pp.62-75.

৭৫. Hussain N. Bhat F. A. and Khurshid F., *Gender Disparity and Policies of Inclusion: A Case Study of women's Education in Jammu and Kashmir,* Research World, Vol.2, No 3, July 2011, pp.131-146.

৭৬. Singh J. and Singh P. B., *Dimension and Implication of Urbanization in the Least Develop Countries,* paper presented at the International Conference on Urban and Regional Change in Developing Countries, Kharagpur, 11-15 Decmber 1981.

৭৭. Beverly H., *Report on the Census of Bengal*, Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat Press, 1872, p.133.

৭৮. সোম সুস্মিতা, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭-৫৩

৭৯. GOWB, *District Human Development Report Malda*, Kolkata, Development and Planning Department, 2007, p.127.

৮০. GOWB, *District Human Development Report Malda*, তদেব, পৃ.১২৭।

৮১. Siddiqui F. A. and Hussain N., প্রাগুক্ত, পৃ.৬২-৭৫।

৮২. GOI, *Report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০-৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান

দ্বিতীয় অধ্যায়

মালদা জেলায় মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান

সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষা। এটি একটি অপ্রতিরোধ্য চলমান পদ্ধতি। একটি ব্যক্তিতার জন্মলগ্ন থেকে আমৃত্যু জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সমাজ ও সভ্যতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তবে মূলত পড়তেওলিখতে জানার সক্ষমতাকে শিক্ষার মাপকাঠি ধরা হয়। এই শিক্ষা বা EDUCATION শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ *EDUCARE* থেকে যার অর্থ উপরে ওঠা, জাগ্রত হওয়া ইত্যাদি।[১] আধুনিক শিক্ষা সামাজিক সক্রিয়তা ও অবস্থান পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার সাথে অভিযোজিত হতে শেখায় না, বরং প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মুক্তমনা হতেও শেখায়। একটি দেশের অর্ধেক অংশই যেহেতু নারী, তাই নারী শিক্ষা ব্যতীত দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব। একটি নারী শিক্ষিত হলে সে সমগ্র পরিবার ও সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির সহায়ক। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মিলন ভূমি ভারতবর্ষের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হল মুসলিম। এই বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পন্ন মুসলিম জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাই মুসলিম নারী শিক্ষা ও অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রয়োজন। মুসলিম নারী শিক্ষা সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে- (i) ধর্মীয় শিক্ষা, যা শুধুমাত্র কোরআন ও হাদিস কেন্দ্রিক, (ii) নিরপেক্ষ শিক্ষা যা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা গৃহে বা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।[২]২০১১ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের জাতীয় শিক্ষার হার ৭৪ শতাংশ,তারমধ্যে মোট নারী শিক্ষার হার ৬৫% এবং মুসলিম নারীর শিক্ষার হার ৫১.৮৯ শতাংশ, যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর শিক্ষার হারের থেকে অনেক কম। ভারতের গ্রামাঞ্চলে মুসলিম নারীর শিক্ষার হার ৫৪.৪৩ শতাংশ কিন্তু শহরাঞ্চলে মুসলিম নারী শিক্ষার হার ৬১.৪৮%, যা গ্রামাঞ্চলে অপেক্ষা বেশি। ২০১১

সেন্সাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হার ৭৭.০৮%, নারীর শিক্ষার হার ৭১%। শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় সামাজিক সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ব্যবধান প্রকট হয়েছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে অন্যান্য সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ব্যবধান বৃদ্ধির কারণ হল মুসলিমরা পরিবর্তীত অবস্থার সাথে নিজের শিক্ষাগত অবস্থানের উন্নতি ঘটতে পারেনি। যদিও মুসলিম জাতির শিক্ষাগত অবস্থার সামান্যতম উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু তা অন্যান্য ধর্মীয় সামাজিক সম্প্রদায়েরতুলনায় অনেক ধীরগতিতে।[৩]

লিঙ্গ বৈষম্য ভারতবর্ষে বহু যুগ ধরে চলে আসা একটি সামাজিক ব্যাধি স্বরূপ। গৃহে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাজগৎ সর্বত্র নারী পুরুষের মধ্যে অসাম্য প্রচন্ডভাবে প্রকটমান। প্রাচীন যুগের মত বর্তমানেও ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে মূলসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। নারী-পুরুষের এই বৈষম্য শিক্ষাক্ষেত্রেও দৃশ্যমান। ২০০১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের পুরুষ শিক্ষার হার ৭৫% সেখানে নারী শিক্ষার হার ৫৪.১৬%।[৪] ২০১১ সেন্সাস অনুযায়ী ভারতবর্ষের পুরুষ শিক্ষার হার ৮২.১৪% এবং নারী শিক্ষার হার ৬৫%। এই নারী পুরুষের শিক্ষাগত ব্যবধান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে নারী সর্বদাই অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভারতে নারী শিক্ষা :-

ভারতের সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন ভারতের মানুষ নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নারী শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করেছিল। বৈদিক যুগে স্রোত রচনা, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারন থেকে শুরু করে বিচারক বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও নারীর ভূমিকা লক্ষ্যনীয়। বৈদিক যুগে নারীরা শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সাথে সাথে বাস্তবিক জ্ঞান যেমন চরকা চালনা, অশি চালনা, সেলাই ফোর প্রভৃতি বিষয়েও লাভ করেছিল।[৫]

গবেষক ডঃ আর এন শর্মার ভাষায় নারী নৃত্য, কলা, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত যা পুরুষদের জন্য অযোগ্য ছিল।[৬] তবে প্রাচীন ভারতের শেষের দিকে নারী তার গৌরব হারাতে থাকে। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ নারীর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এমনকি কোন রকম ধর্মীয় যাগযজ্ঞ এ অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। নারীর বিবাহের বয়স ১৬ থেকে ১৭ থেকে কমিয়ে ৮-৯বছর করা হয়। তবে বিত্তশালী ও অভিজাত পরিবারের মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। তারা সংস্কৃত, প্রাকৃত এর পাশাপাশি নৃত্য, সংগীত, গৃহস্থালির কাজকর্ম, গৃহসজ্জা, প্রভৃতির শিক্ষা লাভ করে।[৭] তার সাথে যুক্ত হয় বহিরাক্রমণ। বহিরাক্রমণের ফলে বহু বিদেশি শাসক ভারতে আসেন ও ভারতে স্থায়ীভাবে রাজত্ব শুরু করেন। এই শাসক ও ব্যবসায়ীগণের সাথে আগত বিদেশী সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে এদেশের মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। ফলে এক নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব ভারতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর প্রতিফলিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বিভাজন শুরু হয়। প্রাচীন ভারতে নারী যে রূপ স্বাধীনতা ভোগ করত ও পুরুষের সমমর্যাদা পেত তা খর্ব হতে থাকে। কিছু বিত্তশালী ও অভিজাত পরিবারের মুসলিম মেয়েরা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে কোরআন, হাদিস, ইসলামী আইন ও ঐতিহ্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পায়, যদিও বা কেউ কেউ রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। এই বিষয়ে মুসলিম যুগে কিছু বিদূষী নারীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন রাজিয়া সুলতানা, বাবর কন্যা গুলবদন বেগম, নুরজাহান, আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসা প্রমুখ। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ে পর্দা প্রথার প্রচলন নারীর শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। বাল্যবিবাহের প্রচলন হওয়ায় সামান্য সংখ্যক নারী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেলেও উচ্চ শিক্ষার থেকে তারা বঞ্চিত হয়। ধনী ও রাজপরিবারের মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেলেও সাধারণ নারীদের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। এই সময় মানুষের মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা প্রসঙ্গে কুসংস্কার প্রচলিত ছিল।[৮] তবে এটি পরিষ্কার যে মধ্যযুগে শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্ম কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল এবং হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের জন্য ধর্ম শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শুধুমাত্র

প্রচলিত ছিল। ফলে উনিশ শতকের যখন তারা শিক্ষার সুযোগ পায় তাদের মধ্যে অনিহা দেখা দিতে থাকে এবং নিজেদের ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসে মূলতঃ বাণিজ্য ও মুনাফা অর্জনই ছিল তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তাই ভারতের শিক্ষা বিস্তারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না, তার কারণ হল প্রথমতঃ তখন ভারতে টোল ও মক্তব কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল, আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করলে ধর্মীয় শিক্ষা আঘাত প্রাপ্ত হবে, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়দের শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করতে তারা রাজি ছিল না। ১৮১৩ সনদ আইন দ্বারা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একলক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মেকলের মিন্টিস অনুসারে পাশ্চাত্য শিক্ষাখাতে এই অর্থব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কেরানী তৈরী করা। তবে মেকলের মিনিটসে নারী শিক্ষা বিষয়ে কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। অ্যাডাম এবং মুনরো সেই সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলি শুধুমাত্র ছেলেদের শিক্ষার জন্য প্রচলিত ছিল।[৯] কোম্পানির শাসনকালে মেয়েদের আলাদা কোন বিদ্যালয় ছিল না। কিছু ব্যক্তিগত ও মিশনারীদের উদ্যোগে নারী শিক্ষার সূচনা ঘটে। ১৮১৮ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চুঁচুড়াতে মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু সেটি কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায়।[১০] চার্চ মিশনারি সোসাইটি, ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি, স্কটিশ মিশনারি সোসাইটি, ব্যাসেল মিশনারি সোসাইটি নারী শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু কর্তা ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, যেমন ওয়ারেন হেস্টিং প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১),জোনাথান ডানকান প্রতিষ্ঠা করেন বেনারস হিন্দু কলেজ (১৭৯১), প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য আলেকজান্ডার ডাক প্রতিষ্ঠা করেন জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন ইত্যাদি। ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নারী শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলকাতা স্কুল সোসাইটি

প্রতিষ্ঠা হয়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এর সেক্রেটারি ও নারী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের দ্বারা ১৮১৯ সালে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় তিনি সাহায্য করেন।

১৮২০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাদেশিক গভর্নরদের ভারতে নারী শিক্ষার সম্বন্ধে জানার জন্য একটি শিক্ষা বিষয়ক ক্ষেত্র সমীক্ষা নির্দেশ দেয়। ১৮২২-২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে এই সমীক্ষা চলে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নর টমাস মুনরো সমীক্ষার দ্বারা দেখান যে প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় উপস্থিত এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রায় ১১,৫৭৫ স্কুলে প্রায় ১,৫৭,১৯৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করত, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল ছাত্র। সমীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে মাত্র ৪০২৩ জন ছাত্রী এই সমস্ত স্কুলে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করত। এটি প্রতিভাত হয় যে, অধিকাংশ ছাত্রীরা গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য হত।[১১] বোম্বে প্রেসিডেন্সির গভর্নর এলফিনস্টোন প্রেসিডেন্সিতে স্কুলের উপস্থিতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। ১৮৩৫-৩৮ বাংলায় একটি সমীক্ষা দ্বারা কলকাতার হিতবাদী ব্রিটিশকর্তা উইলিয়াম অ্যাডাম বর্ধমান জেলায় ৪টি বালিকা বিদ্যালয় এর সন্ধান পান এবং সেখানে ১৭৫ জন বালিকা পড়াশুনা করত বলে জানা যায়, যার মধ্যে একটিমাত্র মুসলিম মহিলা, ৩৬টি ভারতীয় খ্রিস্টান পরিবারের এবং ১৩৮টি হিন্দু পরিবারে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতেন।[১২] স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ন্যূনতম। বাংলায় মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান সম্পর্কে গবষক বেগাম রোকাইয়া তার প্রবন্ধে বলেছেন বাঙালি মুসলিম নারীর শিক্ষার হার খুব কম কারণ দরিদ্রতা, পর্দাপ্রথা এবং নারী শিক্ষার প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলার অনেক মেয়েইআইনত শিক্ষিত কিন্তু বাস্তবে তারা নিজের নামও লিখতে জানেনা। আবার তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয় বা তারপরে শিক্ষার সুযোগ পায়। গ্রামের মানুষজনের ধারণা মেয়েদের আসল শিক্ষালাভের স্থান হল গৃহ,[১৩] শহরাঞ্চলের নারীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বেথুন স্কুল, যা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় নামেও সমাধিক পরিচিত। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের সহায়তায় ড্রিংকওয়াটার বিটন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষা বিস্তারে এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রেখেছে।

বোর্ড অফ কন্ট্রোল এর সভাপতি চার্লস উড ১৮৫৪ সালে একটি নির্দেশ নামা জারি করেন, যার দ্বারা ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়। নারী শিক্ষা বিষয়ে উডের ডেসপ্যাচে বলা হয় বহুভারতীয় তাদের মেয়েদের সুশিক্ষা দিতে আগ্রহী, এরদ্বারা বোঝা যায় পুরুষদের মত নারীদেরও সমানুপাতিক হারে শিক্ষিত করা উচিত। উডের ডেসপ্যাচ এ সুপারিশ করা হয় ব্রিটিশ সরকার নারী শিক্ষার সমর্থক এবং ভারতে প্রাইভেট স্কুল বা নতুন কোন স্কুল তৈরির জন্য স্বতন্ত্র অনুদানকে আহ্বান করা হয়।[১৪] ব্রিটিশ সরকার উডের ডেসপ্যাচ এর সুপারিশমত Grant-in-aid কে স্বাগত জানায় কারণ এটি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র কে কোনরকম প্রভাবিত না করেই বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। উডেরডেসপ্যাচ (১৮৫৪) অনুযায়ী তখন ভারতে প্রায় ৬২৬ টি বালিকা বিদ্যালয়ে (মাদ্রাজ ২৫৬, বাংলা ২৮৮, বোম্বে ৬৫, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৭) মোট ২১ হাজার ৭৫৫ জন ছাত্রী পড়াশোনা করত।[১৫] পাঞ্জাবে ঐতিহ্যবাহী দেশীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পরও পাঞ্জাবে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে নারী শিক্ষার তেমন কোন অগ্রগতি ঘটেনি। এ বিষয়ে গবেষক হেমন্ত রাওত তার *'Women and Education'* গ্রন্থে নারী শিক্ষা, লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ ব্যবধান, নারী ক্ষমতায়ন প্রকৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। লিঙ্গ বৈষম্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করেউচ্চ শিক্ষা শেষ করা পর্যন্ত বর্তমান। সেকেন্ডারি স্কুল ও উচ্চশিক্ষাতেও মেয়েদের নাম নথিভুক্ত করনের হার কম, এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন অভিভাবকদের আর্থিকও সামাজিক অবস্থান, দূরবর্তী স্কুল পরিবার ও সমাজের গোঁড়া মানসিকতা, স্কুলে ছেলেদের সাথে পড়াতে নারাজ, নারী সতীত্ব হরণের ভয়, শিক্ষিকার অভাব প্রভৃতি। তিনি উপলব্ধি করেছেন শিক্ষার অভাব আরো অনেক অসুবিধা জন্ম দেয়তাই নারী শিক্ষার বিষয়ে পিতা-মাতাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে।[১৬]

শুধু ব্রিটিশ উদ্যোগেই নয় কতিপয় ভারতীয়দের উদ্যোগেও ঔপনিবেশিককালে শিক্ষার বিস্তার ঘটতেথাকে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের মধ্যে সবিশেষ

উল্লেখ্যযোগ্য। রামমোহন ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র বালিকাদের জন্য ৩৫ টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৫ সালে মাদ্রাজে ভারতীয়দের উদ্যোগেও কিছু কিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জ্যোতিবা ফুলে সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ, বিপ্লবী ও মহারাষ্ট্রে নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসাবে বিশেষ পরিচিত। তিনি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে পুণেতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গুজরাটের পার্শি ব্যবসায়ী সমিতিও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে উদ্যোগ নেয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে আমেদাবাদের মগন ভাই করমচাঁদ ২০,০০০ টাকার তহবিল তৈরি করেন, যার দ্বারা দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়াও ১৮৫৪ পর্যন্ত মহিলাদের বহু স্কুল ও কলেজ গুলিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়।

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য W.W.Hunter এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেন,[১৭] যা ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন নামেও খুব প্রসিদ্ধ। উডের ডেসপ্যাচ এর কার্যকারিতা ও রিপোর্টের ভিত্তিতে হান্টার কমিশন তার রেখাচিত্র অঙ্কন করেন। এই কমিশন মূলত স্কুল বই, পাঠক্রম, বেতন, স্কলারশিপ ও বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে মহিলা শিক্ষিকার প্রস্তাব দেয়। এর ফলে প্রায় ৩৪৭০ বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হয় এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১৮৮২ তে ১,২৭,০৬৬ থেকে ১৯০২ সালে ৪,৪৪,৪৭০ বৃদ্ধি পায়। বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর সংখ্যা ৮১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০২ সালে ৪৬১ হয় এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২০৫৪ জনথেকে ৯৮১০ জন ছাত্রী ১৯০২ সালে বৃদ্ধি পায়।[১৮] সরকারি তহবিল থেকে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ খরচের পাশাপাশি ব্যক্তিগত অনুদানকেও স্বাগত জানানো হয়, ফলে নারী শিক্ষারবিস্তারে প্রচুর অর্থব্যয় করা সম্ভব হয়, ফলে নারী শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে থাকে।

উত্তর ভারতের নারী শিক্ষা বিস্তারে আর্য সমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮৯০ সালে জুলানদার সমাজ আর্য কন্যা পাঠশালা ও ১৮৯২ সালে কন্যা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, যাস্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে পন্ডিত রামাবাঈ ও ডি. কে. কার্ভে পুণেতে সারদা সদন ও হিন্দু বিধবাদের সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শি সম্প্রদায় পুণেতে ১৯১৩ সালে বোম্বেতে ৮ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০১-১৯০২ সালে সেখানে ১২টি কলেজ, ৪৬৭টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৫৬২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৪৭,৪৭০জন। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন শিক্ষা ব্যবস্থায় যে নীতি নির্ধারণ করেন তাতে ভারতে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উদঘাটিত হয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনুদানকে স্বাগত জানানোর ফলে শিক্ষার উন্নতি ঘটতে থাকে। প্রচুর বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়, নারীদের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০৪ সালে অ্যানি বেসান্ত মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের জন্য বেনারসে Central Hindu Girl’s School প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও নারীদের মধ্যে শিল্পী সত্তার বিকাশের জন্য নৃত্য, সঙ্গীত, হাতের কাজ, গৃহসজ্জা, ইংরেজি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। বোম্বেতে কার্ভে বিধবা সংশোধনাগার, মহিলা বিদ্যালয়, সেবা সদন, পন্ডিত রামাবাঈ সদন, বনিতা বিশ্রাম এবং বাংলায় মহাকাল পাঠশালা শুধুমাত্র নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ এর সেবা সদন সমাজে নারী ও কম বয়সী মেয়েদের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯১০ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে গোপালকৃষ্ণ গোখলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি তোলেন প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার জন্য। এরদ্বারা বিঠলভাই প্যাটেল এর চেষ্টায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯১৮ সালের বোম্বে প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা পৌরসভা এলাকায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার অধিকার দেয়াহয়। ১৯২০ সালের আগে পর্যন্ত ছটি প্রদেশে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়। যেমন- ১৯১৯ এর পাঞ্জাব প্রাথমিক শিক্ষা আইন, বেঙ্গল প্রাথমিক শিক্ষা আইন, যুক্তপ্রদেশ প্রাথমিক শিক্ষা আইন, বিহার ও উড়িষ্যা প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রভৃতি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯০১-১৯০২ সালে ৫৬২৮ থেকে ১৯২১-১৯২২ সালে প্রায় ২২,৫৭৯ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করনের

হারও ৩৮০২০০ থেকে বেড়ে ১,১৯,৫৫,৯৬৭ হয়। ১৯০১ থেকে ১৯২২ এর সময় কালে বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্রিটিশ অনুমোদনপ্রাপ্ত ছিল।১৯১০ সালে মাত্র ৪.৬% ছাত্রী স্কুলে যেত যা ১৮৮৬(১.৮%), ১৮৯৬(২.১%), ১৯০১(২.৪%), এবং ১৯০৭(৩.৬%), ছিল। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে স্কুলগামী ছাত্রী সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৯] ১৯০৭ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, মাদ্রাস ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় বহিরাগত ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিলেও বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের প্রত্যেকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে যোগ দিতে ও পরীক্ষা দেওয়ার ওপর জোর দেয়।

ব্রিটিশ শাসনকালে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯১৬ সালে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (Indian Women’s University),যা বোম্বেতে প্রফেসর ডি.কে.কার্ভের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত. যা বর্তমানে Shirimati NathiBai Damodar Thackersey Women’s University নামে পরিচিত। প্রতিবছর প্রায় ৭০ হাজার নারী এখানে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ১৯২২ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৫ জন স্নাতক হন।ইংরেজি মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু, মেয়েদের ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট শিক্ষার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন দেওয়া, প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[২০]

১৯১৬ সালে দিল্লিতে মহিলাদের জন্য Lady HardingeMedical College প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সালের মধ্যে মহিলা কলেজের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯২১-১৯২২ সালে ভারতীয় ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৮১, যা আগামী ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই মানুষ কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল ছিন্ন করে স্ত্রী শিক্ষা গুরুত্ব উপলব্ধি করেথাকে এবং স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারকে স্বাগত জানায়। নারীর সামাজিক মর্যাদা ও উন্নতিকল্পে বহু নারীর সংগঠন গড়ে ওঠে। বাংলার ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, উত্তরপ্রদেশে স্ত্রী মন্ডল,

বোম্বেতে সেবা সদন সমাজ সবথেকে বেশি প্রণিধান যোগ্য। ১৯১৭ সালে শ্রীমতি অ্যানি বেসান্তের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান ওমেন্স অ্যাসোসিয়েশন, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষার বিস্তার। বিংশ শতক নাগাদএর প্রায় ৮৭ টি শাখা সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার নারী আন্দোলন ভারতের নারীদেরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯২৫ সালের গঠিত হয় National Council of Women's, যা International Council of Women's এর অনুমোদন প্রাপ্ত। নারীর সামাজিক উন্নতি, নারী শিক্ষার সমান সুযোগের দাবিতে ১৯২৭ সালেAll India Women's Conference সংগঠিত হয়। ১৯২৯ সালে Sharda Act সারাদেশে বাল্যবিবাহকে বেআইনি ঘোষণা করে যা নারী শিক্ষা, নারীর শৈশব ও কৈশোর রক্ষার সহায় হয়। এই সমস্ত সংগঠন গুলি নারী শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে মুসলিম নারী শিক্ষার উন্নতির দিকেও নজর দেওয়াহয়। বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড শিক্ষা বিষয়ে যে সনদ জারি করেন তাতে মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রগতিতেও নজর দেওয়া হয়। উডের ডেসপ্যাচে বলা হয় মুসলিমরা শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাৎপদ তাই তাদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় ডেসপ্যাচে। মুসলিম অভিজাত শ্রেণির দাবি ছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন্ট হেস্টিং ১৭৮০ সালে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন, এর আসল উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমদের শিক্ষিত করা ও ব্রিটিশ সরকারের সমর্থকে পরিণত করা। উডের ডেসপ্যাচ এর মত ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) মুসলিম শিক্ষার প্রতি নজর দেয়। এই কমিশন মুসলিমদের জন্য আলাদা স্কুল ও মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য স্কলারশিপ এর ব্যবস্থা করে। মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। মুসলিম সমাজের কুসংস্কার গুলি দূর করার জন্য স্যার সৈয়দ আহমেদ খান উদ্যোগ গ্রহণ করলেও নারীদের প্রতি তিনি নিরপেক্ষ হতে পারেন নি। তিনি নারীর পর্দার প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস

করতেন নারী চার দেয়ালের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয় মুসলিমরা মনে করত মুসলিম মেয়েরা অন্যান্য শ্রেণী সম্প্রদায়ের সঙ্গে একসাথে পড়াশুনা করলে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতি দেখা দেবে, যা মুসলিম সমাজ ও ধর্মের ওপর কুপ্রভাব ফেলবে। সৈয়দ আহমেদ বিশ্বাস করতেন মুসলিম নারীরা বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও ধর্মীয় শিক্ষার দ্বারা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

বহু নারী সমাজ সংস্কারক পর্দা প্রথার বিরোধী ও নারী শিক্ষা সমর্থক ছিলেন। ভূপালের বেগম তাদের মধ্যে অন্যতম। শেখ আব্দুল্লাহ ও তার স্ত্রী আলীগড়ে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলে ভোপালের বেগম আর্থিক সাহায্য করেন। ভারতের সমাজে যখন নারীর মুক্তির আন্দোলন, নারীর সমান অধিকার, মর্যাদা ও শিক্ষার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনও মুসলিম সমাজের নারীরা বাইরে বেরিয়ে শিক্ষা গ্রহণে ও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে ইতস্তত বোধ করে। গান্ধীজি তার প্রাথমিক শিক্ষা (Basic Education) প্রবর্তন করে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা করেন। তিনি পর্দা প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং মুসলিম নারীদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। বিংশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম নারী শিক্ষার উন্নতি কল্পে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।এই সময় বহু পত্রপত্রিকা মুসলিম নারীর উচ্চতর শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করতে থাকে। ১৯১৫ সালে All India Muslim Ladies Conference অনুষ্ঠিত হয় যার আলোচ্য বিষয় ছিল নারী শিক্ষা।

স্বাধীনোত্তর ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি:

স্বাধীনতার পূর্বে মধ্যযুগীয় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা নারী শিক্ষার প্রগতিকে ব্যাহত করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধান ও ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিশনে নারী শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য সর্বপল্লী ডক্টর

রাধাকৃষ্ণন এর নেতৃত্বে রাধাকৃষ্ণন কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) গঠন করে। এই কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, পুরুষ শিক্ষকের ন্যায় নারী শিক্ষিকাদের সমহারে বেতন প্রদান প্রভৃতির সুপারিশ করে। এই কমিশন বলেছে, "Women's present education is entirely irrelevant to the life they have to lead. It is not only a waste but often a definitdisability. The present system of Women's education, based as it is upon men's need, does not in any way make them fit for coping with the problems of daily life." রাধাকৃষ্ণন কমিশন ১৩ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের পৃথক বিদ্যালয় এর সুপারিশ করে, যদিও কলেজ স্তরে সহশিক্ষার সমর্থনে মত প্রকাশ করেছে। এছাড়াও মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্যঅর্থনীতি বাগার্হস্থ্য শিক্ষা চালু করার সুপারিশ করে যা নারীকে নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করার সুযোগদেবে।[২১]

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশনের (১৯৫২-৫৩) চতুর্থ অধ্যায় নারী শিক্ষার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। রাধাকৃষ্ণান কমিশনের বিদ্যালয় স্তরে পৃথক শিক্ষার বিরোধিতা করে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সহশিক্ষার সমর্থন করে। পুরুষ ও নারী শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই কমিশন সুপারিশ করে যে, ছেলেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতমেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সরকারি অর্থ সাহায্য দিতে হবে। মিশ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে কমিশন কতগুলি সুপারিশ দিয়েছে, যেমন বিদ্যালয়ে মহিলা ও পুরুষ দুই কর্মী রাখতে হবে, মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিদ্যা, সংগীত, অঙ্কন ও মুদ্রণ শিল্প, নার্সিং ও সেলাই প্রভৃতিপড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। মেয়েদের আলাদা কমন রুম, শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।[২২] যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় ও মালদা জেলার ক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হয়।

১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১) নারী শিক্ষা সম্বন্ধে

আলোকপাত করার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমতি দূর্গাবাই দেশমুখের নেতৃত্বে ১৯৫৮ সালে মহিলা শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি (National Committee on Women education) স্থাপন করা হয়। এই কমিটি নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা গুলি খতিয়ে দেখে ও ভারতীয় নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুপারিশ করে। এই কমিটি নারী শিক্ষা বিষয়ে কতগুলি প্রস্তাব করে, যেমন- প্রাথমিক স্তরে স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে, নারী শিক্ষার বিরোধী বিষয়গুলির বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাতে হবে, নারী-পুরুষের শিক্ষার মানের ব্যবধান দূর করতে হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে, গ্রাম এলাকায় ছেলে মেয়েদের আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে, মেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে হবে, ৬-১১বছর বয়সী মেয়েদের বিদ্যালয়গামী করার জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে, উচ্চশিক্ষায় নারী শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য UGC (University Grand Commission) দ্বারা বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নারী শিক্ষার উন্নয়নের ও প্রসারের জন্য নারী শিক্ষা পর্ষদ (National Council for Women’s Education) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রস্তাব ক্রমে ১৯৫৯ সালে শ্রীমতি দুর্গা ভাই দেশমুখ এর সভাপতিত্বে জাতীয় নারী শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়।[২৩]

১৯৬১ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিলিং ফর ওমেন্স এডুকেশনের নির্দেশে ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পরামর্শ ক্রমে হংস মেহতার সভাপতিতে হংস মেহতা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি মূলত প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সুপারিশ করে। কমিটি বলে যে ছেলে মেয়েদের পাঠ্যক্রমে বিভেদ থাকা উচিত নয়, অবিলম্বে এই বৈষম্য দূর করতে হবে। কমিটি, প্রাথমিক স্তরে সহশিক্ষার সপক্ষে মত প্রকাশ করে, তার সাথে ছেলে-মেয়ে উভয়কেই সেলাই, হাতের কাজ, রন্ধন, সংগীত, নৃত্য শেখানো উচিত যাতে নারী পুরুষের প্রভেদ সংক্রান্ত ধারণা গুলি সহজে গড়ে উঠতে না পারে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের কথা বলা হয়। ১৪ বছর পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা চালু করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে ছেলে মেয়েদের পাঠ্যক্রমে বৃত্তি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বৃত্তিমূলক বিষয় পড়ানোর জন্য মেয়েদের বিদ্যালয় গুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি করা উচিত।[২৪]

১৯৬৪-৬৬ সালে আরও একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় যা কোঠারি কমিশন নামে পরিচিত। যা নারী শিক্ষার বিস্তার ও সমস্যাবলি সমাধানের সুপারিশ করে। এই কমিশনে নারী শিক্ষা, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষ কর্মসূচি বলে পরিগণিত হয় এবং এই বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে একত্রে এগিয়ে আসতে হবে। প্রাথমিক স্তরে সর্বজনীন শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয়। এছাড়া মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয়, বৃত্তির ব্যবস্থা, আংশিক পাঠ্যক্রম ও বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম ও ছাত্রী আবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন মন্তব্য করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত ৪:১ থেকে ৩:১ নিয়ে আসতে হবে ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার তারতম্য দূর করতে হবে। স্নাতকোত্তর স্তরে কলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি গৃহ বিজ্ঞান, নার্সিং ও সমাজ সেবামূলক কাজ প্রভৃতি বিষয়গুলিও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা নারীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে।[২৫]

নারী শিক্ষার ব্যাপারে জনগণের অনীহার কারণ অনুসন্ধান (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) এবং জনগণের সহযোগিতা লাভের উপায় অনুসন্ধানের জন্য ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় মহিলা শিক্ষা পরিষদ ও তৎকালীন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম ভক্ত বৎস্যলমের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে যা ভক্ত বৎসলম কমিটির নামে পরিচিত। এই কমিটি নারী শিক্ষার প্রচারের জন্য সরকারি ও বেসরকারি এবং কেন্দ্র ও রাজ্য যুগ্ম উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। এই কমিটি নারী শিক্ষার বিস্তারের জন্য মেয়েদের বিদ্যালয় ভবনের উন্নতি, ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই খাতা ও পোশাক দেওয়ার সুপারিশ করে, শিক্ষিকাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় স্তরে বেশি সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।[২৬] ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতিতেও

নারী শিক্ষার প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষানীতিতে বলা হয় নারী শিক্ষার অগ্রগতি ব্যতীত সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই শিক্ষানীতি নারী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষাক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা, শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও কৃষি বিদ্যার প্রসার, সামাজিক ও নৈতিকতা বৃদ্ধি প্রভৃতি সুপারিশ করে। অনুন্নত ও উপজাতি অঞ্চলে নারীশিক্ষার ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলা হয়।[২৭]

বিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে সর্বত্র নারী আন্দোলন, নারীর অধিকারের লড়াই শুরু হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ - ৮৫ সাল কে নারীর দশক বলে ঘোষণা করে।[২৮] ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতির ওপর বেশি মনোযোগ প্রদান করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বলা হয় সঠিক শিক্ষা নীতির অভাবে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বাধিক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) নিরক্ষরতা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, জীবিকা ভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়। এতে ‘নারী ও উন্নতি’ (Women and development) বিষয়ক একটি অধ্যায় সূচিত হয়েছে, যা শুধুমাত্র নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার উপর আলোকপাত করে। বেশি মাত্রায় মেয়েদের স্কুলে নাম নথিভুক্ত করণ, স্কুল সময়ের বাইরে জীবিকা ভিত্তিক শিক্ষা চালু, বিদ্যালয় গুলিতে বিশেষ করে গ্রাম্য এলাকায় অধিক মাত্রায় মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ, শিক্ষিকাদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা, মেয়েদের বিদ্যালয়ে ও কলেজ গুলিতে বিজ্ঞান বিভাগ তৈরি করা, মহিলাদের পেশাদারী শিক্ষা যেমন- ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, পশু চিকিৎসা, ফরেস্ট প্রভৃতি শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা, যেখানে নারী সাক্ষরতার হার কম সেখানে সাক্ষরতা অভিযান চালানো, সহশিক্ষার উৎসাহ প্রদান এবং অনগ্রসর জাতির স্ত্রীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সুপারিশ করা হয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫- ৯০) এ নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে ১৯৮৬ সালে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। মেয়েদের নিরক্ষতা দূর করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বা আধুনিক পেশায় মহিলাদের প্রবেশাধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয়।[২৯] ১৯৮৬ শিক্ষানীতির সাথে যুক্ত প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (programme of action) নারী ক্ষমতায়ন, নারীর আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি পাত করে। ১৯৮৬ এর শিক্ষানীতি ও প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশনের ত্রুটিবিচ্যুতি গুলি সংশোধন করার জন্য ১৯৯০ রাম মূর্তি রিভিউ কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বাসস্থানের কাছে বিদ্যালয় স্থাপন, মেয়েদের কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলা, আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার, উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি সুপারিশ করে।

২০০১ সালের সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA) ঘোষণা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সকলের জন্য শিক্ষা ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়ন। ২০১০ এর মধ্যে ৬-১৪ বছর বয়সি সকল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। সর্বশিক্ষা অভিযানের বিশেষ দৃষ্টি ছিল স্ত্রী শিক্ষার প্রতি। রাওয়াত এর কথাই সর্বশিক্ষা অভিযান প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ইতিবাচক মান উন্নয়ন ঘটায় এবং বিদ্যালয় স্তরে নাম নথিভুক্তকরণ ১৯৯০-৯১ এ ৯৭.৪ মিলিয়ন থেকে ২০০১ এর ১২২.৪০ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়।[৩০]

ভারত সরকার স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরফলে ১৯৫১-২০১১ নারী শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি নারী পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান আজও বর্তমান, নারীরা শিক্ষাগত দিক থেকে পুরুষদের তুলনায় ক্রমশ পিছিয়ে রয়েছে।

সারণি ১৭

স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি (শতকরা হিসেবে)

সেন্সাস রিপোর্ট	জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	ব্যাবধানের হার
১৯৫১	১৮.৩৩	২৭.১৬	৮.৮৬	১৮.৩০
১৯৬১	২৮.৩৩	৪০.৪০	১৫.৩৫	২৫.০৫
১৯৭১	৩৪.৪৫	৪৫.৯৬	২১.৯৭	২৩.৯৪
১৯৮১	৪৩.৫৭	৫৬.৩৮	২৯.৭৬	২৬.৬২
১৯৯১	৫২.২১	৬৪.১৩	৩৯.২৯	২৪.৮৪
২০০১	৬৫.৩৮	৭৫.৮৫	৫৪.১৬	২১.৭০
২০১১	৭৪.০৪	৮২.১৪	৬৫.৪৬	১৬.৬৮

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৫১-২০১১, ভারতবর্ষ।

উপরোক্ত সারণিতে নারী পুরুষের শিক্ষার হারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সারণিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ১৯৫১ সালে নারী শিক্ষার হার ৮.৮৬ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৫.৪৬ শতাংশ। নারী শিক্ষার হার ক্রম বর্ধমান, কিন্তু ২০১১ সালে পুরুষ শিক্ষার হার ৮২.১৪ শতাংশ এবং নারী শিক্ষার হার ৬৫.৪৬ শতাংশ স্বাধীনতার ৭ দশক পরেও নারী-পুরুষের শিক্ষার ব্যবধান চোখে পড়ার মত, আমরা এখনো এই ব্যবধান ঘুচিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সর্বস্তরের নারীর মধ্যে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ইসলাম ধর্ম ও নারীর শিক্ষাঃ

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় কোরআনে উদ্ধৃত কিছু শ্লোক দ্বারা ৬১১ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ রমজানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর প্রকাশিত কুরআনের প্রথম স্রোত ছিল "Read : In the name of thy Lord who created man from a clot. Read: and thy

Lord in the Most Generous who taught by the pen taught man that which he knew not."[৩১] কোরআনের শিক্ষা অর্জনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে শিক্ষা অর্জনের কোনো সীমারেখা নেই। শিক্ষা অর্জনের জন্য যদি সুদূর চীন দেশে যাওয়ারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে কোরআনে। কোন ব্যক্তির চরিত্র গঠনে শিক্ষার অবদানকে কুরআনে স্বীকার করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম ঈশ্বরের ধ্যানজ্ঞান থেকেও শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র নিজের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্বে সামগ্রিক উন্নতির জন্য অবশ্যই প্রয়োজন।[৩২]

ইসলাম ধর্ম ও কোরআনে এটি কখনোই মনে করা হয় না যে শিক্ষা শুধুমাত্র পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উল্লেখ করেছেন, 'The pursuit of knowledge is a duty of every Muslim men and women.'[৩৩] এর থেকে বোঝা যায় প্রত্যেক মুসলিম জনগণের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নিজেকে, পরিবারবর্গকে ও সমাজকে শিক্ষিত করা। কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানার্জনের বাধা দিতে পারে না। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ কোন কিছুই জ্ঞানার্জনের বাধা হতে পারে না। এর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা সৃষ্টি করেননি বরং জীবন উপলব্ধির ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, শাহীদের রক্ত অপেক্ষা আলিমের কালির জোর অনেক বেশি।[৩৪]

প্রাক্ ইসলাম আরব সাম্রাজ্য ছিল অন্ধকার যুগ, শিক্ষার কোন গুরুত্ব ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত আরব সাম্রাজ্যে পার্থিব সুখ অর্জনই আসল উদ্দেশ্য হয়ে দাড়িয়েছিল। শিক্ষার আঙিনা ছিল তাদের নাগালের বাইরে।[৩৫] যদিও জাহেলিয়া যুগে মক্কা, দৌমাতুল, জান্দাল ও আনবার এ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত বায়তুল মাদ্রাসায় বানু হুদাইল ও খাস্মপ গোষ্ঠীর ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করতে যেত। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় জাহিলিয়া যুগেও শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়েছিল।[৩৬] জাহেলিয়া যুগও শিক্ষার গুরুত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করতে

পারেনি। তবে শিক্ষার অঙ্কুরোদ্গম সম্পূর্ণ হয়েছিল যখন ইসলাম ধর্ম তার উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করেছিল।[৪২] ইসলাম প্রকৃত জীবন দর্শন প্রদান করেছে এবং প্রত্যাহিক কিছু নিয়ম নীতি আরব বাসীদের মধ্যে প্রদান করেছে যার দ্বারা তারা সত্য-মিথ্যা, ঠিক-ভুলের মধ্যে বিভেদ করতে পারে। ইসলাম তাদের স্বর্গ ও নরকের পরিষ্কার ধারণা দিয়েছে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তার দূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নির্দেশ দিয়েছে।[৩৭]

কোরআনে নারীদের শিক্ষা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামিক শরীয়তে অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছে কন্যা সন্তানকে শিক্ষিত করতে যাতে তারা ঠিক ভুলের মধ্যে বিভেদ করতে পারে। এটি প্রত্যেক পিতা-মাতার কর্তব্য তার কন্যা সন্তানকে শিক্ষিত করে সমাজে যোগ্য সম্মানীয় স্থান দেওয়া। শিক্ষা ব্যতীত তারা ইসলামের মূল আদর্শ কখনোই উপলব্ধি করতে পারবে না। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মেয়েদের শিক্ষিত করাকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘who so ever bought up three daughters, taught them manners and etiquette, got them married and treated them well, Haven is for him.’[৩৯] ইসলামিক শরীয়ত নারীর জ্ঞান অর্জনের জন্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। নারীর মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে তাকে সমাজের কার্যকারী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।[৪০] ইসলাম নারীর ক্ষমতায়নে উৎসাহ দেয় এবং সমাজে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করে।[৪১] উরাহবিন জুবাইর হযরত আয়েশা সম্পর্কে বলেছেন, “Hadrat Ayesha (R.A) knew more about the injunctions of Holy Quran, poetry and literature, the History of Arabs and their hierarchy than any other person.”[৪২]

মুসলিম সমাজে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় কোরআন শিক্ষার মধ্য দিয়ে, লিঙ্গভেদে নারী-পুরুষ সকলে ধর্মীয় শিক্ষা পেয়ে থাকে। ইসলাম ধর্মে নারী পুরুষ নির্বিশেষ সকলে শিক্ষার অধিকার থাকলেও ভারতে মুসলিম নারীর পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষক নীলম যাদব বলেছেন, ইসলাম অপেক্ষা সামাজিক কারণ যেমন- পর্দাপ্রথা, পরিবারের পুরুষ সদস্য ও ধর্মের ব্যাখ্যা কর্তাদের নারী শিক্ষার প্রতি অনিহা, মেয়েদের ছেলেদের সাথে এক স্কুলে পড়তে অনিচ্ছা প্রভৃতি দায়ী যদিও বর্তমানে চিত্র বদলেছে, মুসলিম সমাজ নারী শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান

করেছে।[৪৩] ইসলাম আবির্ভাবের পর আরব সাম্রাজ্যের এমন অনেক বিদুষী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়, যারা শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমরনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মুসলিম নারী ধর্মের ব্যাখ্যাকারী হিসেবেও সম্মান অর্জন করেছেন। বহিরাক্রমণ ও ইসলামী সভ্যতার পতনের সাথে সাথে মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থানের পতন ঘটতে থাকে। সমাজ জীবনেও তারা গুরুত্ব হারাতে থাকে। মুসলিম নারী নিজেকে কঠোর পর্দাপ্রথা ও ঘরের চার দেওয়ালে আবদ্ধ করে ফেলেএবংএটি মনে করা হয়যে ধর্মীয় শিক্ষা তাদের জন্য যথেষ্ট। এইভাবে তারা আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে। গবেষক নীলম যাদব নারী শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থে বলেছেন আধুনিক শিক্ষা মুসলিম নারীর কাছে গৌণ হয়ে ওঠে, ফলে যখন তারা শিক্ষার সুযোগ পায় তারা তা অস্বীকার করে। ফলে ছেলেদের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে।[৪৪] ইসলামে নারী শিক্ষা, নারী উন্নতি, ঐতিহ্য বিকৃতি ও কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে শুরু করে, অশিক্ষা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। সারা বিশ্বের মুসলিম নারীরা শুধুমাত্র বাইরে অবহেলিত হত তা নয়, তারা সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ ও সামাজিক অধিকার গুলি থেকেও বঞ্চনার শিকার হয়।

এইভাবেই ইসলাম ধর্ম নয় বরং পুরুষতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, গোঁড়া ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক রীতি-নীতি মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অনগ্রসতা আধুনিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের জন্য দায়ী। নারীর প্রতি ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলামের নারীর প্রতি যে সব অধিকার ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে বাস্তবে তা পালন করা হয় না। ইসলামে নারী ও মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের বাস্তব চিত্রের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। মুসলিম নারীর অশিক্ষা একটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, নারী শিক্ষার উন্নতির দিকে নজর না দিলে এই চিত্র চলতে থাকবে।[৪৫]

ভারতে মুসলিম নারী শিক্ষা:

নারী শিক্ষা ব্যতীত সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি সম্ভব নয় এবং শিক্ষার সাথে নারীর সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক উন্নতিও যুক্ত। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়ের

প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী। স্বভাবতইঃ এই বৃহৎ সংখ্যক নারীর শিক্ষা ব্যতীত সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নতি ও অগ্রগতি অসম্ভব। ভারত সরকার শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৫) দ্বারা জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক শিশুকে সর্বজনীন ও অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার প্রদান করেছে। তথাপি মুসলিম নারীরা শিক্ষাগত দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দারিদ্রতা, প্রচলিত সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা, পর্দাপ্রথা, ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রভৃতি নারীর অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বহু শিক্ষা কমিশন, জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮, ১৯৮৬), নারী শিক্ষা পর্ষদ নারীর শিক্ষাগত উন্নতির জন্য বহু সুপারিশ করেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে মুসলিম নারীর শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তেমন কিছু বলেনি। বর্তমানে ভারতে মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান পর্যালোচনা প্রয়োজন।

সারণি ১৮

ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষার হার ২০১১ (শতকরা হিসাবে)

ধর্মগোষ্ঠী	পুরুষ	নারী	মোট	অশিক্ষার হার
হিন্দু	৭০.৭৮	৫৫.৯৮	৬৩.৩৮	৩৬.৩৯
মুসলিম	৬২.৪১	৫১.৯০	৫৭.১৫	৪২.৭২
জৈন	৮৭.৮৬	৮৪.৯৩	৮৬.৩৯	১৩.৫৭
খ্রিষ্টান	৭৬.৭৮	৭১.৯৭	৭৪.৩৭	২৫.৬৫
শিখ	৭১.৩২	৬৩.২৯	৬৭.৩০	৩২.৪৯
বৌদ্ধ	৭৭.৮৭	৬৫.৬০	৭১.৭৩	২৮.১৬
অন্যান্য	৫৯.৩৮	৪১.৩৮	৫০.৩৮	৪৯.৬৫

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১, ভারতবর্ষ।

উপরোক্ত সারণিতে বোঝা যাচ্ছে মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান (৫১.৯০%) অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর তুলনায় অনেক কম। এমনকি তারা একই সম্প্রদায়ের পুরুষদের (৬২.৪১%) থেকেও পিছিয়ে। জাতীয় নারী শিক্ষার হার ৬৫.৪৬ শতাংশ থেকেও মুসলিম নারী শিক্ষার হার কম। উক্ত সারণী থেকে ভারতে মুসলিম নারী শিক্ষাগত অনগ্রসতার পরিচয় পাওয়া যায়। সারণী

থেকে বোঝা যাচ্ছে সব থেকে বেশি অশিক্ষার হার মুসলিম সম্প্রদায়ের (৪২.৭৭ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন অশিক্ষার হার জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে (১৩.৫৭ শতাংশ)।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই মুসলিমরা ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের জন্য আধুনিক শিক্ষা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে রেখেছে এবং ধর্মীয় গোড়ামী, পর্দাপ্রথা প্রভৃতি সমাজে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা মুসলিম নারীর শিক্ষাগত উন্নতির বিপক্ষে।[৪৬] একাদশতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যবধান বিশেষ করে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দূর করার জন্য বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে নারীশিক্ষার উন্নতির জন্য সর্বশিক্ষা অভিযান, মিডডে মিল প্রকল্প, প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় প্রোগ্রাম, কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় প্রকল্প প্রভৃতি (২০০৪) তপশীল জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু পিছিয়ে পড়া মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে অনুষ্ঠিত হয়।[৪৭] যার দ্বারা মালদার পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মেয়েরা উপকৃত হয়েছে।

ভারত সরকার ১৯৭৮ সালের ধর্মীয়ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের উন্নতি ও স্বার্থরক্ষার জন্য সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করে। সংখ্যালঘুদের শিক্ষাগত পশ্চাদপদতা দূর করার জন্য নবম ও দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে চেষ্টা করা হয়। এর দ্বারা শিক্ষাগত পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের জন্য সুযোগ সুবিধা ও পরিকাঠামোগত উন্নতি এবং নিকটবর্তী এলাকায় বিদ্যালয় সুপারিশ করা হয়।[৪৮]

ভারত সরকার ভারতীয় মুসলিমদের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বহু কমিটি গঠন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারক রাজিন্দার সাচারের নেতৃত্বে গঠিত সাচার কমিটি। এই কমিটি ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করে। বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট ও এনজিও গুলির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদের

এক ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা দেয়। কমিটির রিপোর্টে মুসলমানদের নিম্নশিক্ষাগত অবস্থানের চিত্র ভালোভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০১ সালে মুসলিমদের শিক্ষাগত হার ৫৯.১%, যা জাতীয় শিক্ষার ৬৫.১ শতাংশ থেকে অনেক কম। তপশীলি জাতি, উপজাতি (৫২.২ শতাংশ) ও মুসলিমদের বাদ দিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির শিক্ষার হার অনেক বেশি (৭০.৮%)। শহরাঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার (৭০.১ শতাংশ) ও জাতীয় শিক্ষার হারের মধ্যে ব্যবধান ১১ শতাংশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে ব্যবধান ১৫ শতাংশ।[৪৯] ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী মুসলিম ছেলেমেয়েদের প্রায় ২৫ শতাংশ হয়তো কখনো ও স্কুল যায়নি নতুবা স্কুলছুট।[৫০] স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা গুলি মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে পৌঁছয় নি।[৫১] এই শিক্ষাগত অনগ্রসরতার প্রতিফলন মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়।

উচ্চ বংশজাত হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর ৬২ শতাংশ ছেলে মেয়েরা (মুসলিম ব্যতীত) যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে, সেখানে মুসলিমরা (৪৪ শতাংশ), তপশীলি জাতি (৩৯ শতাংশ) তপশীলি উপজাতিরা (৩২ শতাংশ) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর উচ্চ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়েও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম ও এস সি, এস টি ছেলেমেয়েরা উচ্চ বংশীয় হিন্দুদের তুলনায় কম সংখ্যক বিদ্যালয়ে যায়। কিন্তু কলেজ স্তরে একটু ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। কলেজ স্তরে মুসলিম ছেলে মেয়েদের অবস্থা এস সি,এস টি দের তুলনায় একটু ভালো। যেখানে ২৩ শতাংশ এস সি, এস টি ছাত্রছাত্রী উচ্চ বিদ্যালয় স্তর পাস করে কলেজ উত্তীর্ণ হয়, সেখানে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী (২৬ শতাংশ) ও অন্যান্য ধর্ম গোষ্ঠীর (৩৪ শতাংশ) ছাত্রছাত্রী কলেজ উত্তীর্ণ হয়।[৫২] সাধারণত এটি মনে করা হয় মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের বেশিরভাগ মক্তব মাদ্রাসা ভিত্তিক পড়াশুনা করে। তবে সাচার কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক মাত্র ৩% মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী মাদ্রাসায় নাম নথিভুক্ত করে।[৫৩] তবে রিপোর্টে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার বিশদ চিত্র পাওয়া যায় না।

সাচার কমিটির মতে মুসলিম অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুলের শিক্ষার মূলস্রোতে দিতে নারাজ। মুসলিম এলাকা গুলিতে সরকারি স্কুলের সংখ্যা খুব কম, বালিকা বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতি, মেয়েদের হোস্টেলের অসুবিধা, মহিলা শিক্ষিকার অভাব, নিম্নমানের শিক্ষা, মুসলিম মেয়েদের বিদ্যালয় নাম নথিভুক্ত না করার কারণ। মুসলিম মেয়েরা যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে হবে বলে কমিটির সুপারিশ দেয়।[৫৪]

সাচার কমিটি মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাগত অবস্থানের উন্নতি কল্পে কতগুলি সুপারিশ করে। কমিটি ১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর কথা বলে এবং এটি কার্যকারী হলে মুসলিমদের শিক্ষার উন্নতি ঘটবে, বিশেষ করে সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য এটি মঙ্গলদায়ক হবে বলে কমিটি মনে করে। মুসলিম এলাকা গুলিতে উচ্চমানের সরকারি স্কুল স্থাপন, ৯-১২ বছর বয়সী মেয়েদের জন্য আলাদা বিশেষ স্কুল স্থাপন এবং সেখানে মুসলিম মেয়েদের প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে, সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিক মাত্রায় মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ এবং সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করে কমিটি যাতে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা ভালো মানের শিক্ষার সুযোগ পায়।[৫৫]

সাচার কমিটির ঠিক পরেই ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থান ও শিক্ষার মান জানার জন্য রঙ্গনাথ মিশ্রর সভাপতিত্বে আরেকটি কমিটি গঠিত হয় যা National Committee for religious and linguistic Minorities নামে পরিচিত। এই কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার মান ও শিক্ষাগত অবস্থান সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা যায়। এই কমিটি ২০০৭ সালে ভারত সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করে।

রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটি স্বীকার করেছে যে, কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির সর্বাঙ্গীণ সামাজিক উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। এর দ্বারা মানুষের জীবিকা সুনিশ্চিত হয় এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঘটে ও সমাজের সুযোগ সুবিধা গুলি পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ২০০১ সেন্সাস

রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কমিটির সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গুলির সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থান ব্যাখ্যা ও পর্যবেক্ষণ করেছে। কমিটির ব্যাখ্যায় প্রকাশ পেয়েছেজৈনদের মধ্যে শিক্ষার হার সবথেকে বেশি, খ্রিস্টান (৮০.৩%), বৌদ্ধ (৭২.৭%), হিন্দু (৫৬.১%) এবং শিখদের শিক্ষার হার (৬৯.৪%), যা জাতীয় শিক্ষার হারের ৬৪.৮% সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যান্যদের শিক্ষার হার ৪৭% এবং মুসলিমরা শিক্ষার হার ৫৯.১%, যা জাতীয় শিক্ষার হারের থেকে অনেক কম। ভারতের শিক্ষার হার পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় মুসলিমদের শিক্ষার হার তপশীলি জাতি উপজাতিদের থেকে কোন অংশে ভালো নয়। পার্সিদের শিক্ষার হার ৯৭.৭৯ শতাংশ এর থেকে বোঝা যায় উনিশ শতক থেকেই পার্সিরা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল ছিল। ভারতের ছয়টি মুখ্য ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সবথেকে বেশি নারী পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান যথাক্রমে ২৩ শতাংশ, ২১ শতাংশ, ১৭.৫ শতাংশ। ভারতের শিক্ষাস্তরে সব থেকে বেশি শিক্ষিতের হার জৈনদের মধ্যে, প্রায় ২১.৪৭ শতাংশ জৈন তাদের কলেজ স্তরে শিক্ষা সম্পন্ন করে যা খ্রিস্টান ও শিখদের মধ্যে যথাক্রমে ৮.৭১ শতাংশ ও ৬.৯৪ শতাংশ কলেজ স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করে, যা মুসলমানদের মধ্যে সবথেকে কম (৩.৬ শতাংশ)। কলেজ ও তার পরবর্তী স্তরে হিন্দুদের শিক্ষার হার দেখা যায় ৭ শতাংশ। প্রাথমিক স্তরে মুসলিমদের যোগদানের হার বেশি (৬৫.৩১ শতাংশ) দেখা গেলেও উচ্চ বিদ্যালয় (১০.৯৬ শতাংশ) ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে (৪.৫৩ শতাংশ) যোগদান কমতে থাকে।[৫৬]

২০০১ সেন্সাস অনুযায়ী রিপোর্টে দেখানো হয়েছে জাতীয় স্তরে নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান ২১. ৫ শতাংশ, ২৪.৫৭ শতাংশ। গ্রাম্য এলাকায় এবং শহরাঞ্চলে ১৩ শতাংশ জৈন নারী-পুরুষের মধ্যে সবথেকে বেশি শিক্ষিতের হার দেখা যায় ৯০.৬ শতাংশ ও ৯৭%, ব্যবধান হল ৬.৮২ শতাংশ। সবথেকে বেশি শিক্ষার ব্যবধান দেখা যায় হিন্দু (২৩ শতাংশ), বৌদ্ধ (২১.৪%) এবং মুসলিমদের মধ্যে।[৫৭]

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারীর যোগদানের প্রকারভেদ রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য ধর্ম গোষ্ঠীর (other religious) নারীর যোগদান সব থেকে বেশি (৯২.৫%), সেখানে তপশীলি জাতি (৮৫.০৯ শতাংশ), উপজাতি(৮৯.৩৯ শতাংশ), মুসলিম (৮৭.৯৭ শতাংশ) এবং বৌদ্ধ(৭৯.৩১ শতাংশ) নারী প্রাথমিক স্তরে যোগদান করে। জৈন ও শিখ নারীরা সব থেকে কম প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া সম্পন্ন করে। আবার উচ্চ প্রাথমিকে জৈন (২০.৭৩ শতাংশ),শিখ (১৮.৭৫ শতাংশ) এবং খ্রিস্টান (১৭.১৯ শতাংশ) সবথেকে বেশি নারী শিক্ষার হার দেখা যায়, তেমনি সবথেকে কম নারীর উচ্চ প্রাথমিকে অংশগ্রহণ দেখা যায়। যথাক্রমে তপশীলি উপজাতি (৬শতাংশ), তপশীলি জাতির (৭.৬৬ শতাংশ) ও অন্যান্যদের (৯.৬৬ শতাংশ) মধ্যে। ঠিক এইভাবে উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে জৈন, শিখ ও খ্রিস্টান ধর্মের মেয়েদের যোগদানের হার বেশি এবং তপশিল জাতি উপজাতি ও অন্যান্যদের অনেক কম সংখ্যকমেয়ে উচ্চ বিদ্যালয় সম্পন্ন করে।[৫৮]এই কমিটির রিপোর্টে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গুলির সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থানের উন্নয়নের জন্য কতগুলি সুপারিশ ভারত সরকারের কাছে পেশ করে।

রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন সুপারিশ করে যে,

ক. ১০ শতাংশ মুসলিম এবং ৫শতাংশ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সরকারি চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসন সংরক্ষণ করতে হবে।

খ. মূল আসন সংখ্যা ৮.৪% ওবিসিদের জন্য এবং ২৭ শতাংশ সংখ্যালঘু জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

গ. এস সি আসন সংরক্ষণ দলিতদের জন্য বরাদ্দ হবে।

প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর কালে বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষাঃ

প্রাক স্বাধীনতাকালে বাংলা বলতে দুই বাংলাকেই বোঝানো হত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মুসলমান সমাজে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। সেই সময় গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ পুরনো চিন্তা ভাবনা পরিত্যাগ করে নারী শিক্ষায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে,উনিশ শতকের প্রথম দিকে মেয়েদের লেখাপড়াকে ঘৃণার চোখে দেখা হত। হিন্দু মুসলিম উভয়সম্প্রদায়ে নারী শিক্ষাকে

শাস্ত্র বিরোধী বলে মনে করা হত।মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে পুরুষদের পদতলে থাকতে অস্বীকার করবে, এই আশঙ্কায় সেই সময় পুরুষ শাসিত সমাজের লোকজন নারী শিক্ষায় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এমনকি ন্যূনতম শিক্ষা গ্রহণেও বাধা সৃষ্টি করত। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড নারীর শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ নেন এবং উডের নির্দেশ নামায় ঘোষণা করেন, “The importance of female education in India can not be over rated; and we have observed with pleasure the evidence which is now afforded of an increased desire on the part of many of the natives to give a good education to their daughter”.[৫৯] ১৯৮২-৮৩ সালের শিক্ষা কমিশন মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে এদেশীয় লোকদের অনীহা দেখে মন্তব্য করেছে “One great objection made by the native public to the instruction of the girls is that it is of no practical use to them”.[৬০] ১৯০৫-১৯০৬ সালে মহিলা স্কুল ইন্সপেক্টর মিস ব্রুক নারী শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে পর্দা প্রথা ও শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞাকে দায়ী করেছেন।[৬১] যা বর্তমানে মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করছে।

বাঙালি মুসলমান সমাজ মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করত। কিছু ব্যাক্তি বর্গ স্ত্রী শিক্ষারপক্ষে ছিলেন, আবার কিছু সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ নারী শিক্ষার প্রতি বিরূপ পোষন করতেন। এ বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখের দাবি রাখে, ১৮৬৮ সালে বেঙ্গল সোশাল সাইন্স অ্যাসোসিয়েশন এর সভায় আব্দুল লতিফ ‘Mohammedan Education in Bengal’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠের সময় তিনি বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়টি উত্থাপন করেন। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী প্যারীচাঁদ মিত্র হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান নারীদের শিক্ষার বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ হয়েছে কিনা তা জানতে চান। আব্দুল লতিফের হয়ে কলকাতা মাদ্রাসার মৌলোভী আব্দুল হাকিম উত্তরে জানান ইসলামের শিক্ষার গুরুত্ব থাকলেও অন্য সম্প্রদায়ের মত তারা মেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠাতে পারেনা। ধর্মের কারণে পর্দানশীন করে রাখতে বাধ্য। অন্য সম্প্রদায়ের মত তারাও ধর্মের বিধি পালনে বদ্ধপরিকর। তিনি মেয়েদের গৃহ শিক্ষার পক্ষে মত দেন।[৬২] অপরদিকে অনেকেই নারী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। সৈয়দ

আমীর আলী ১৮৯৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষক কনফারেন্সে মুসলিম ছেলেমেয়ে উভয়কেই একই ধরনের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেন কারণ ছেলে-মেয়েউভয়ই শিক্ষিত না হলে নারী সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।[৬৩] "ইসলাম প্রচারক" পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন নারী শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুলের প্রস্তাব দেন।[৬৪]

মুসলমান বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার সূচনা লগ্নে বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে আরও একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক দেখা যায় তা হল মুসলমান মেয়ের কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিছু মানুষের মতে মেয়েদের কাজ যেহেতু সংসার সামলানো ও সন্তান প্রতিপালন তাই তাদের আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা অপ্রয়োজন। আবার কেউ কেউ মেয়েদের পুরুষদের মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রয়োজন বলে মনে করে। 'মিহির' ও 'সুধাকর' পত্রিকা মুসলিম মেয়েদের কোরআন শিক্ষা ও উর্দু, বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি জোর দেয়। উচ্চশিক্ষার দ্বার মেয়েদের কাছে উন্মুক্ত করার বিরোধিতা করে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকাটি মেয়েদের মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষাদানের সুপারিশ করে।[৬৫] ১৯১৯ সালের 'সওগাত' পত্রিকায় সমাজ সেবিকা নুরুন্নেসা খাতুনও একই মত পোষণ করে মেয়েদের গৃহে শিক্ষাদানের কথা বলেন। তিনি বলেন মিশনারী স্কুলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ অনভিপ্রেত।[৬৬] আবার 'সাওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিতলেখক তাহের উদ্দিন আহমেদ 'স্ত্রীশিক্ষা' শিরোনামক প্রবন্ধে নারী ও পুরুষের পাঠ্যক্রম পৃথক হওয়া উচিত বলে মনে করেন। মেয়েদের স্বাস্থ্যবিধি, বিজ্ঞান, গৃহসজ্জা, শিশুপালন, সংগীত, সূচি শিক্ষা দেওয়া উচিত।[৬৭] কাশেমা খাতুন 'নারীর কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলিম মেয়েদের আধুনিক শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন।[৬৮]বহু ব্যক্তিবর্গ মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাটি খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করেন। মুসলিম সমাজ সংস্কারক এস ওয়াজেদ আলী, আব্দুর রশিদ প্রমুখ মেয়েদের আরবি ও উর্দু ভাষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার পক্ষে মত দেন।[৬৯] লেখক কাজী মোতাহার হোসেন 'সওগাত' পত্রিকায় মেয়েদের রন্ধন প্রণালী, শিশুপালন, গৃহসজ্জা প্রভৃতি শেখানোর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখার বিরোধিতা করে আধুনিক শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৭০]

প্রথমত বাংলায় নারী শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছিল মিশনারীদের হাত ধরে। পরবর্তীকালে বেসরকারি বা ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮১৯ সালে খ্রিস্টান মহিলাদের একটি সমিতি গঠিত হয়, যা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি নামে পরিচিত। এই সমিতি কলকাতা শহরে অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এরপর চার্জ মিশনারিদের উদ্যোগে লেডিস সোসাইটি স্থাপিত হয়, এই সোসাইটির দায়িত্ব মেরি অ্যান কুক এর হাতে দেওয়াহয়, তারই উদ্যোগে কলকাতা শহরে বিভিন্ন জায়গায় আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যথা শ্যামবাজার স্কুল, শোভাবাজার স্কুল, কৃষ্ণবাজার স্কুল, মল্লিকবাজার স্কুল এবং কুমোরটুলি স্কুল ইত্যাদি।[৭১] মিস কুক চার্চ মিশনারি সোসাইটির সদস্য মি. উইলসনকে বিয়ে করে মিসেস উইলসন নামে পরিচিত হয়। মিসেস উইলসনের প্রচেষ্টায় স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ২২ হয় এবং ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে ৪০০ হয়। পরবর্তীকালে ছাত্রীর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়।[৭২] সেই সময় মিশনারিদের উদ্যোগে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও মুসলিম নারীরা তার লাভ নিতে পারেনি। তবে মিসেস উইলসনের প্রচেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে মির্জাপুর, এন্টালি, জানবাজার এলাকার মুসলমান মেয়েরা যেত এবং মিসেস কুক এর স্ত্রী শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় মুসলমানরা স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল।[৭৩] ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতার গৌরীবাড়িতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৭৪] ১৮২৭ সালের লেডিস অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে কলকাতায় প্রায় ১২টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৪ সালে মির্জাপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৭৫] এতে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জনের মতো ছাত্রী পড়াশোনা করত বেশিরভাগ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের। শ্রীরামপুর মিশনারীদের উদ্যোগেও শ্রীরামপুরে স্ত্রীর শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৮২৫ সালে শ্রীরামপুর মিশনারীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি থেকে ৩০০ ছাত্রী পরীক্ষা দেয়।[৭৬]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কিছু ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হয়। এই সময় তারা বিভিন্ন সভা সমিতি স্থাপনের দ্বারা নারী শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াস শুরু হয়। নারী শিক্ষা বিস্তারে যেসব সভা সমিতি গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেগুলি

হল উত্তরপাড়া হিতকারি সভা, ঢাকা মুসলমান সোহাগ সম্মিলনী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী ইত্যাদি। উত্তরপাড়া হিতকারী সভা মূলতঃ হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগনা এলাকায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে কর্মসূচি গ্রহণ করে। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্য এই সভা শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এইসভার কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাংলা সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি এবং মুসলিম মহিলারাও এই পাঠ্যসূচির অনুযায়ী পরীক্ষা দিতেন। অন্তঃপুরের মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রগতিশীল ছাত্র আবদুল মজিদ, আব্দুল আজিজ, ফজলুল করিম প্রমুখের উদ্যোগে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী স্থাপিত হয়। এই সংস্থা মুসলিম মহিলাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই সংস্থা মহিলাদের জন্য প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করে এবং কলকাতা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে ঘুরে স্থানীয় লোকেদের সহায়তায় পরীক্ষা নিত, সম্পূর্ণ কঠোর পর্দার মধ্যে থেকে মুসলমান মেয়েরা পরীক্ষা দিতেন। নওসের আলী খান ইউসুফজাই 'বঙ্গীয় মুসলমান' পুস্তকে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর সফলতার কথা উল্লেখ করেছেন।[৭৭] শ্রীহট্টবাসী যুবকরা ১৮৭৬ সালে কলকাতার শ্রীহট্টে শ্রীহট্ট সম্মিলনী সভা প্রতিষ্ঠা করে। তবে এই সভার কার্যকলাপ কলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি সিলেটের হিন্দু মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সিলেটে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। ১৮৮৪ সালে এই সভার উদ্যোগে যে পরীক্ষা হয়েছিল তাতে মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২১। পরে আরো অনেক মুসলিম মহিলা এই সংস্থার দেওয়া পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরীক্ষা দেয়।[৭৮] এছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেক বালিকা বিদ্যালয় নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে খোলা হয়। বিপ্লবী লীলা নাগ মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য ১৯২৪ সালে কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

বিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যে জেনানা[৭৯] বা গৃহ শিক্ষা খুব জনপ্রিয় ছিল। মূলত খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যই জেনানা শিক্ষা চালু করা হয়। প্রথমে কলকাতা, পাবনা, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গায় জেনানা শিক্ষা চালু করা হয়। পরে অবশ্য তা অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জেনানা শিক্ষা জনপ্রিয় করার জন্য একজন

মুসলমান ভদ্রলোককে নিয়োগ করা হয়, কিন্তু ফলপ্রসূ নাহাওয়ায় তাকে বাতিল করা হয়।জেনানা শিক্ষাকে কার্যকারী করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে অনেক কমিটি নিয়োগ করা হয়। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে পর্দা প্রথা ও নারী শিক্ষার প্রতি অনীহার ফলে স্ত্রী শিক্ষায় আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ব্রিটিশ সরকার নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সরকারি উদ্যোগে কতগুলি স্কুল স্থাপন করেন। বেথুন স্কুল ও কলেজের হাত ধরে নারী শিক্ষা প্রসারে সূচনা হয়। কিন্তু বেথুন স্কুলে মুসলিম মহিলাদের প্রবেশ এর কোন সুযোগ ছিল না। তাই মুসলিম মেয়েদের কথা মাথায় রেখে ১৮৭৮ সালে ঢাকায় ইডেন গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিকে মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে মাইলস্টোন বলা হয়।[৮০] সমাজ সংস্কারক ফৈজুন্নেসা মুসলিম নারীদের আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কুমিল্লায় কুমিল্লা গার্লস স্কুল ও ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের পত্নী বেগম শামসি ফেরদৌস বাংলার নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৮৯৭ সালে কলকাতায় মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

নারী শিক্ষা বিস্তারে সব থেকে বেশি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বেগম রোকেয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল (১৯১১) নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করে। তিনি বহু বাধা-বিপত্তি ও সামাজিক ভ্রূকুটি সহ্য করে স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যান। তার কাছে মেয়েদের শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় সব নয়, মেয়েদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটানোই তার আসল উদ্দেশ্য। এই জন্য তিনি স্কুলে কোরআন পাঠের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি, রন্ধন, সেলাই ফোর, হোম নার্সিং প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকাদের দ্বারা পড়ানোর ফলে মুসলিম সমাজের নারীদের মধ্যে শিক্ষার সঞ্চার তাড়াতাড়ি হয়, যা মুসলিম নারী শিক্ষার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাক স্বাধীনতা পূর্বে বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ রদ কার্যকারী হওয়ার আগে অবধি শিক্ষার অগ্রগতি ছিল মন্থর। উনিশ শতকের শেষদিকে প্রকাশিত শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট গুলিতে দেখা যায় আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলারা হিন্দু মহিলাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। ১৮৮১ - ৮২ সালে ইংরেজি বিদ্যালয়ের মোট ১৮৪ জন ছাত্রী মধ্যে মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা ছিল শূন্য। আবার ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে মোট ৩৪০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৪।[৮১] এই সময় মাদ্রাসাগুলিতে পড়ার প্রবণতা বেশি ছিল, অবশ্য এই সময় অন্তঃপুর শিক্ষা বা জেনানা শিক্ষার চলও বেশি ছিল। বঙ্গভঙ্গ রোধের পর স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভঙ্গ রোধ কার্যকরী হওয়ার পর মুসলমান সমাজ নারীশিক্ষার উন্নতির জন্য দাবি করতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলি নারী শিক্ষা বিস্তারে সহায়কহয়। মুসলিম ছাত্রীদের স্কুলে যোগদান বাড়তে থাকে। ১৯১১-১২ সালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা ছিল ১৭,৪৫২, যা ১৯১৬-১৭ সালে১৩,২৯,৫১৮। তবে তা শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ১৯১২-১৩ সালে মাদ্রাসা গুলির সংস্কার করলেও পর্দাশীল মহিলারা মক্তবে পড়তেবেশি আগ্রহী। ফলে মুসলিম মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে।[৮২] অসহযোগ ও আইন অমান্য সময় কালেও নারী শিক্ষার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি, তবে ১৯৪০ এর দশকে স্কুল কলেজ গুলিতে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মুসলিম নারী শিক্ষার ক্রমশ বিকাশ ঘটতে শুরু করে।

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গ ২৩ টি জেলা নিয়ে গঠিত ও জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষের প্রায় ২৫.২ শতাংশ লোক এখানে বাস করে এবং চতুর্থ স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাধীনোত্তরকালের ক্রমশ বর্ধিত জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলেও নানা ধর্ম, বর্ণ, জাতির সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিক্য দেখা যায়। স্বাধীনোত্তর বাংলা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও মধ্যযুগে এই পশ্চিমবঙ্গ ছিল মুসলিম শাসনাধিকারে। ব্রিটিশ শাসনকালে সুচতুর ইংরেজ সরকার বাংলাকে ভাগ করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও তার পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাজিত হয়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রূপ লাভ

করে। তবে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায়ের আধিক্য দেখা যায়। ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

সারণি ১৯

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যা (১৯৫১-২০১১)

সাল	পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা	হিন্দু জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা
১৯৫১	২৪,৮১০,৩০৮	১৯,৪৬২,৭০৬ (৭৮.৪৫%)	৪,৯২৫,৪৯৬ (১৯.৮৫%)
১৯৬১	৩৪,৯২৬,২৭৯	২৭,৫২৩,৩৫৪ (৭৮.৮০%)	৬,৯৮৫,২৮৭ (২০.০০%)
১৯৭১	৪৪,৩১২,০১১	৩৪,৬১১,৮৪৬ (৭৮.১১%)	৯,০৬৪,৩৩৮ (২০.৪৬%)
১৯৮১	৫৪,৫৮০,২৬৫	৪২,০০৭,১৫৯ (৭৬.৯৬%)	১১,৭৪৩,২০৯ (২১.৫২%)
১৯৯১	৬৮,০৭৭,৯৬৫	৫০,৮৬৬,৬২৪ (৭৪.৭২%)	১৬,০৭৫,৮৩৬ (২৩.৬১%)
২০০১	৮০,১৭৬,১৯৭	৫৮,১০৪,৬২৪ (৭২.৪৭%)	২০,২৪০,৫৪৩ (২৫.২৫%)
২০১১	৯১,৩৪৭,৭৩৬	৬২,২০৭,৩২৫ (৭০.১০%)	২৭,৪০৪,৩২১ (২৭.০১%)

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৫১-২০১১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫১ সালে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ১৯.৮৫ শতাংশ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলে বিপুল সংখ্যক জনগণ পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করে, ফলে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা ও বিপুলভাবে বাড়তে থাকে। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা ২০.৪৬ শতাংশ থেকে ২১.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অতএব এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে বিপুলসংখ্যক জনগণ ভারতে প্রবেশ করেছিল, তার বেশি সংখ্যকই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। ১৯৯১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৩.৬১ শতাংশ এবং

২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৫.২৫ শতাংশ। ২০১১ এর জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৭.০১ শতাংশ যা ক্রমবর্ধমান।

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে নারী পুরুষের সাক্ষরতার পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে শিক্ষাগত বৈষম্য নজরে আসে। নারীরা সর্বদাই সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি শিক্ষাগত অবস্থানে দিক থেকেও পুরুষদের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। নারীদের পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে বিভিন্ন গবেষক শারীরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে বেশি তুলে ধরেছেন। তবে বর্তমানে নারীদের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। নারী আজ ক্ষুদ্র পরিসর থেকে সর্ববৃহৎ পরিসরে নিজের নাম উজ্জ্বল করেছে।

সারণি ২০

পশ্চিমবঙ্গের মোট সাক্ষরতার হার (শতকরা হিসেবে)

সাল	পশ্চিমবঙ্গের মোট সাক্ষরতার হার	পুরুষ সাক্ষরতার হার	নারী সাক্ষরতার হার
১৯৫১	২৪.৪২	৩২.৩৯	১১.২১
১৯৬১	২৯.২৮	৩৬.২৮	১৫.২২
১৯৭১	৩৩.০৫	৪২.৮৪	২২.০৮
১৯৮১	৪৮.৫৬	৫৪.২২	৩১.১২
১৯৯১	৫৭.৭০	৬৭.৮০	৪৬.৬০
২০০১	৬৯.০০	৭৭.০০	৫৯.৬০
২০১১	৭৬.২৬	৮১.৬৯	৭০.৫০

উৎসঃ জনগণনা রিপোর্ট ১৯৫১-২০১১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট সাক্ষরতার হার ২৪.৪২ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৩২.৩৯ শতাংশ এবং নারী সাক্ষরতার হার ১১.২১ শতাংশ। ১৯৮১ সালে পুরুষ সাক্ষরতার হার ছিল ৫৪.২২ শতাংশ এবং নারী সাক্ষরতার হারছিল ৩১.১২ শতাংশ, শিক্ষাগত

ব্যবধান প্রায় ২৩ শতাংশ। ১৯৮১তে যেখানে নারী স্বাক্ষরের হার ছিল ৩১.১২ শতাংশ, ২০১১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৭০.৫০ শতাংশে। তাহলে পরিষ্কার যে পশ্চিমবঙ্গের নারী পুরুষের শিক্ষাগত ব্যবধান বর্তমান থাকলেও নারীর স্বাক্ষরের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবার স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম জনগণের নারী পুরুষের মধ্যেও শিক্ষাগত বৈষম্য বিদ্যমান।

সারণি ২১

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম জনগণের নারী পুরুষের মধ্যেও শিক্ষাগত বৈষম্য

জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলিম
পুরুষ	৮১.৬৯%	৭৬.০৯%
নারী	৭০.৫০%	৫৭.২৩%
মোট	৭৬.২৬%	৬৮.৫৩%

উৎসঃ সেন্সাস রিপোর্ট ২০১১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং সুশান্ত পান্ডে, *পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণঃ হুগলি-হাওড়া-বর্ধমান-২৪ পরগনা-মুর্শিদাবাদ (১৯৫২-২০১০)*, অপ্রকাশিত, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৯১ থেকে সংগৃহীত।

আগের সারণীতে দেখা যাচ্ছে ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সঙ্গে নারী সাক্ষরতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে পুরুষ অপেক্ষা নারী সাক্ষরতার হার তুলনামূলক কম। আবার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হারের দিকে তাকালে বোঝা যায় হিন্দু মহিলাদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম মেয়েরা শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ২০১১ রিপোর্টে হিন্দু নারী শিক্ষার হার যেখানে ৭০.৫০ শতাংশ সেখানে মুসলিম নারীর শিক্ষার হার ৫৭.২৩ শতাংশ, যা অনেক কম। এই পশ্চাৎপদতার উৎস লুকিয়ে আছে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে। হিন্দুরা ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার লাভ গ্রহণ করলেও মুসলিমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে যার ফল স্বরূপ তারা পশ্চাৎপদ হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছে।[৮৩]

২০০১ ও ২০১১ সালের জেলাভিত্তিক নারী পুরুষের শিক্ষাগত হারের পরিসংখ্যায়নের দিকে তাকালে পশ্চিমবঙ্গের নারী শিক্ষাগত অবস্থান আরো পরিষ্কার বোঝা যাবে।

সারণি ২২

২০০১ ও ২০১১ সালের জেলাভিত্তিক নারী-পুরুষের শিক্ষাগত হারের পরিসংখ্যায়ন (শতকরা হিসেবে)

জেলার নাম	২০০১ সাক্ষরতার হার			২০১১ সাক্ষরতার হার		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
পশ্চিমবঙ্গ	৬৮.৬৪	৭৭.০২	৫৯.৬৮	৭৭.০৮	৮১.৭০	৭০.৫০
বাঁকুড়া	৬৩.৮৪	৭৪.২০	৪৯.৮০	৭০.৯৫	৮১.০০	৬০.৪৪
বর্ধমান	৭১.০০	৭৯.৩০	৬১.৯০	৭৭.১৫	৮৩.৪৪	৭০.৪৭
বীরভূম	৬২.১৬	৭১.৬০	৫২.২০	৭০.৯০	৭৭.৪২	৬৪.০৭
দক্ষিন দিনাজপুর	৬৪.৬৪	৭৩.৩০	৫৫.১০	৭৩.৮৬	৭৯.৬৩	৬৭.৮১
দার্জিলিং	৭২.৮৭	৮১.৩০	৬৩.৯০	৭৯.৯২	৮৫.৯৪	৭৩.৭৪
হাওড়া	৭৭.৬৪	৭৯.৯০	৭০.৯০	৮৩.৮৫	৮৭.৬৯	৭৯.৭৩
হুগলী	৭৫.৫৯	৭৭.২০	৬৭.৭০	৮২.৫৫	৮৭.৯৩	৭৬.৯৫
জলপাইগুড়ি	৬৩.৬২	৭৩.৬০	৫২.৯০	৭৩.৭৯	৮০.৬১	৬৬.৬৫
কোচবিহার	৬৭.২১	৭৬.৮০	৫৭.০০	৭৫.৪৯	৮১.৫২	৬৯.০৮
কলকাতা	৮৩.৩১	৮৪.১০	৭৮.০০	৮৭.১৪	৮৯.০৮	৮৪.৯৮
মালদা	৫০.৭১	৫৯.২০	৪১.৭০	৬২.৭১	৬৭.২৭	৫৭.৮৪
মুর্শিদাবাদ	৫৫.০৫	৬১.৪০	৪৮.৩০	৬৭.৫৩	৭১.০২	৬৩.৮৮
নদীয়া	৬৬.৫৫	৭২.৭০	৬০.১০	৭৫.৫৮	৭৯.৫৮	৭১.৩৫
উত্তর ২৪ পরগণা	৭৮.৪৯	৮৪.৪০	৭২.১০	৮৪.৯৫	৮৮.৬৬	৮১.০৫
পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর	৭৫.১৭	৮৫.২৫	৬৪.৬৩	৮৩.৩৫	৮৮.৭৯	৭৫.৯৩
পুরুলিয়া	৫৬.১৪	৮৫.৩০	৩৭.২০	৬৫.৩৮	৭৮.৮৫	৫১.২৯
দক্ষিন ২৪ পরগণা	৭০.১৬	৮৩.১০	৫৯.৭০	৭৮.৫৭	৮৪.৭২	৭২.০৯
উত্তর দিনাজপুর	৪৮.৬৩	৫৯.৩০	৩৭.২০	৬০.১৩	৬৬.৬৫	৫৩.১৫

উৎসঃ সেন্সাস রিপোর্ট ২০০১ ও ২০১১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

জেলাভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গের নারী পুরুষের সাক্ষরতার হার থেকে এটি পরিষ্কার যে নারীরা সবকটি জেলাতেই শিক্ষাগত দিক থেকে পুরুষ অপেক্ষা পিছিয়ে রয়েছে। ২০০১ সালে নারী পুরুষের শিক্ষাগত ব্যবধান ছিল প্রায় ১৭ শতাংশ যা ২০১১ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১১ শতাংশ। আবার ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের নারী সাক্ষরতার হার ৫৯.৬৮ শতাংশ থেকে ৭০.৫০ শতাংশ বেড়েছে। পরিসংখ্যায়ন থেকে এটি পরিষ্কার যে সবকটি জেলাতেই নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটেছে।

১৯৫১-২০১১ পাঁচদশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মুসলিম সাক্ষরতার হার সেরূপ বৃদ্ধি পায়নি। ২০১১ সালে রাজ্যে হিন্দু সাক্ষরতার হারছিল ৭৯.১০ শতাংশ এবং মুসলিমদের সাক্ষরতার হার ছিল ৬৮.৮০ শতাংশ অর্থাৎ শিক্ষাগত দিক থেকে মুসলিমরা হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে।এই পিছিয়ে পড়ার কারণ নিহিত আছে উপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণে মুসলিম সমাজের অনীহার মধ্যে। ফলে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ভারতসহ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা শিক্ষাগত দিক থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে, যা আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও এই অবস্থা তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। শিক্ষার অভাবে মুসলমান সমাজেঅশিক্ষা, কুসংস্কার ও অসচেতনতা গড়ে ওঠে, যার ফলে সবথেকে বেশি অবস্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে পড়ে মুসলিম নারীরা। তারা আজও ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার আবহে চার দেয়ালে আবদ্ধ হয়ে মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় এবং স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধীনে তিনটি বোর্ড রয়েছে, যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা পঠন-পাঠনও পরীক্ষার দ্বারা জীবনের ও শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে পারে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ, এছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা বোর্ড। এর দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভ করে থাকে।

মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তারে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকাঃ

বাংলায় জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য রয়েছে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির দিক থেকে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার ব্যবধান রয়েছে এবং এই ব্যবধান উপনিবেশিক শাসনকাল থেকেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বহু মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে মুসলিমদের জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগ দেখা যায় ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এই মাদ্রাসায় ইসলামিক ধর্মগ্রন্থ, আরবি ও ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হত। সেইসঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম দিকে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের অনীহা ছিল। এর প্রধান কারণ হল প্রথমতঃ ভারতের ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ মক্তব মাদ্রাসায় কোরআন ও হাদিস কেন্দ্রিক শিক্ষা গ্রহণ করত। দ্বিতীয়তঃ ভারতের মুসলিম জনগণ অসন্তুষ্ট হবে এই আশঙ্কায় ব্রিটিশরা মুসলিমদের জন্য আলাদা কোন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তৃতীয়তঃ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের জন্য শিক্ষাখাতে ব্যয়কে অপচয় বলে মনে করত। তবে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের মুসলমান জনগণের শিক্ষার প্রতি উদার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৮৩৫ সালে মেকলের প্রস্তাব অনুসারে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হলে ১৮৩৭ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষাকে রাজ ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়।[৮৪] যা মুসলিমরা সহজে মেনে নিতে পারেনি। বাংলায় ইংরেজি ভাষা চালু হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন এই ভাষাকে সাদরে গ্রহণ করে, কিন্তু মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে গবেষক ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বাংলার মানুষ বাংলার মুসলমান সমাজ প্রতিবাদ করতে থাকে কলকাতায় প্রায় ৮০০০ মুসলিম ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ পত্র সরকারকে জমা দেওয়াহয়। ঔপনিবেশিক সরকার যেহেতু কোরআন কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়নি তাই মুসলমান সমাজ নিজেদের পাশ্চাত্য

ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।[৮৫] হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পাশ্চাত্য ভাষা জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে ব্রিটিশ সরকার অধীন চাকরি গ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। মুসলমান সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদতার কারণ সেই উপনিবেশিক শাসনকাল থেকেই চলে আসছে। অফিস আদালত সরকারি কাজকর্মে ইংরেজি ভাষার প্রচলন হওয়ায় মুসলিম সম্প্রদায় তা গ্রহণ করতে পারেনি। লর্ড মেয়ো বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের প্রতি জোর দেন। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষ অঙ্ক, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল শিক্ষা গ্রহণে মুসলমান জনগণের অনিচ্ছা এবং উর্দু ভাষার প্রতি আসক্তি তাদের হিন্দু জনগণের থেকে পেছনে ফেলেছে। ফলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলার বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে হিন্দু জনগণের আধিপত্য প্রকট হয়ে ওঠে। বাংলার মক্তব্ মাদ্রাসাগুলির ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। মধ্যযুগের কোন অভিজাত পরিবার বা ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতাই মাদ্রাসা গুলি পরচালিত হত কিন্তু উপনিবেশিক শাসনকালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মাদ্রাসাগুলি আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে চলতে থাকে।

'মাদ্রাসা' শব্দটি একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এমন কোন প্রতিষ্ঠান যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা প্রদান করে থাকে।[৮৬] ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত তা মূলত মক্তব্ মাদ্রাসা কেন্দ্রিক। মক্তব হল বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা, এখানে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ও মাদ্রাসা হল উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাদান ব্যবস্থা। মধ্যযুগ থেকেই এই শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে। বেশিরভাগ মাদ্রাসা ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগে চলতে থাকাই ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে পাঠ্যক্রমের ওপর তেমন চাপ সৃষ্টি করতে পারত না। মক্তব গুলি অধিকাংশই এলাকার মসজিদগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে সরকারি উদ্যোগে প্রথম মাদ্রাসা স্থাপিত হয় ১৯১৩ সালে। এর আগে বিভিন্ন স্থানীয় ও আঞ্চলিক উদ্যোগে মাদ্রাসা ও মক্তবগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালিত হত। ১৯১৩ সালে রাজ্যের সরকারি অনুদানে সর্বপ্রথম পাঁচটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয় ও মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৮ জন এবং একই সময়ে ১২টি মক্তবে ১৬৭ জন ছাত্র পড়াশোনা করত।[৮৭] ১৯১৩ সালে মাদ্রাসার মৌলভী

ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে।[৮৮] ১৯৬২ সালে সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত মক্তবের সংখ্যা বেসরকারি উদ্যোগকেও অতিক্রম করে।[৮৯] এভাবে ধীরে ধীরে বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত মক্তব মাদ্রাসাগুলি সরকারি অনুদানে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত মক্তবগুলির ছাত্র সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের শিক্ষার অগ্রগতিতে 'অঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া' সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রী পান্নালাল বোস শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ঘোষণার দ্বারা মাদ্রাসা গুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করায় মাদ্রাসাগুলি আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পায় এবং একটি সুসংহত রূপ লাভ করে।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় প্রচলিত মাদ্রাসাগুলি পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (১৯২১) এর অন্তর্গত ছিল এবং উচ্চ মাদ্রাসা গুলি পরিচালনার জন্য ইসলামিকমধ্যবর্তী পর্ষদ ও ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (১৯২৭) গড়ে উঠেছিল। তবে মোজামুদ্দিন কমিটির সুপারিশ ক্রমে কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা নিয়ামক পর্ষদকে পরিবর্তন করে ১৯৪৬ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ গঠন করা হয় এবং এটি ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ নামে পরিচিতি লাভ করে।[৯০] ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা আইন পাস হয় ও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ একটি স্বয়ং শাসিত পর্ষদের মর্যাদা পায়। এখানে উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ন্যায় এটিও পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বই প্রকাশ করছে যা গুণগত মানেও উন্নত।[৯১] বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তিন ধরনের মাদ্রাসা ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

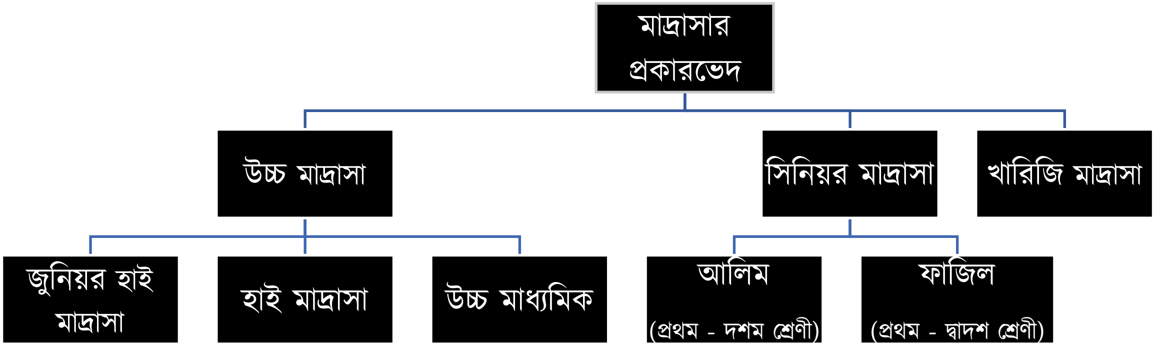

উচ্চমাদ্রাসাগুলি সরকার অনুমোদিত বা সরকার পোষিত হয়ে থাকে, এগুলিতে জুনিয়র হাই, হাই ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা হয়। সিনিয়র মাদ্রাসাগুলি আলিম ও ফাজিল ভাগে বিভক্ত। আলিম মাদ্রাসাগুলিতে সাধারণত প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ও ফাজিল মাদ্রাসা গুলিতে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। আলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, উর্দু অথবা বাংলা, অংক ও ইসলামিক বিদ্যা এবং ফাজিল প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা অথবা উর্দু, ইংরেজি, আরবি ও হাদিস আবশ্যিক বিষয় হিসেবে শিখতে হয়। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মধ্য থেকে শিক্ষার্থীরা যেকোনো পাঁচটি বিষয় বেছে নিতে পারেন।[৯২] এছাড়া আরও এক ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত যা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ বা গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত খারিজি মাদ্রাসা।

সারণি ২৩

১৯৪৭-২০১৬ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

সাল	১৯৪৭-৪৮	১৯৭৭-৭৮	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৫-১৬
জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা	৯০	৭১	১৬৭	১৩০	২৬	৩৫	৬২	১০১	১১০	১১৪	১১৪	১০৯	১০৯
হাই মাদ্রাসা	০৭	৯২	২৩৮	২৭৪	৩৭৮	৩৮৫	৩৯৬	৩৯৪	৩৯৪	৩৯৫	৩৯৮	৪০৩	৪০৪
সিনিয়র মাদ্রাসা	০২	৭৪	১০৩	১০৩	১০২	১০২	২০২	১০২	১০২	১০২	১০২	১০২	১০২
মোট	৯৯	২৩৭	৫০৮	৫০৭	৫০৬	৫২২	৫০৬	৫৯৭	৬০৬	৬১১	৬১৪	৬১৪	৬১৫

উৎসঃ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড, www.wbbme.org ও সুশান্তপান্ডে,*পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ হুগলি-হাওড়া-বর্ধমান-২৪পরগনা-মুর্শিদাবাদ,* অপ্রকাশিত, (১৯৫২-২০১০), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, পৃ.১২৭ থেকে সংগৃহীত।

উপরোক্ত সারণিতে স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকেই মাদ্রাসা গুলির সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে চলছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসার সংখ্যা ৬১৪টি এর মধ্যে ১০৯টি জুনিয়র হাই, ৪০৪টি হাই মাদ্রাসা, ও ১০২টি সিনিয়র মাদ্রাসা। বর্তমানে মোট মাদ্রাসার মধ্যে শুধুমাত্র বালিকা

মাদ্রাসার সংখ্যা ৬০টি। কো-এডুকেশন বা সহশিক্ষা মাদ্রাসার সংখ্যা হল ৫৫০টি ও ৪টি শুধুমাত্র বালকদের জন্য ও ১৭টি উর্দু মাধ্যমে পরিচালিত মাদ্রাসা।[৯৩]

পশ্চিমবঙ্গের দুই ধরনের মাদ্রাসা দেখা যায় একটি হল সরকারি অধীনস্থ যার সংখ্যা অনেক কম, আর অন্যটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, এর সংখ্যা অনেক বেশি। মাদ্রাসাগুলির বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এবং দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাই বেশি মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুকরণে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদেরও একই রকম পাঠ্যক্রম, শুধুমাত্র দুটি বিষয় আরবি ও ইসলাম পরিচয় অতিরিক্ত পড়তে হয়, শহরাঞ্চলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীন বহু স্কুল ও অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রচলিত থাকায় মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা অনেক কম দেখা যায়। যদিওবা মাদ্রাসা গুলি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা গুলিতেই বেশি গড়ে ওঠে। নিম্নে জেলাভিত্তিক মাদ্রাসা ও ছাত্রছাত্রীর পরিসংখ্যান থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নোক্ত সারণিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪,৪৩,৮২২জন। ২০১২-১৩ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ৫০৯ টি মাদ্রাসায় মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫,৪৬,০৯৮, এর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ২,১৮,৪৩৯ জন ও বালিকা সংখ্যা ৩,২৭,৬৫৯জন, মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ৪৩,৬৮,৭৭৯ জন ও অমুসলিম ছাত্র সংখ্যা ১,০৯,২১৯ জন। স্বভাবতই জানা যাচ্ছে যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান গুলিতে কেবল মুসলিম ছাত্ররাই লেখাপড়া করে তা নয়, বহু অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রী ও লেখাপড়া করে।[৯৪] নিম্নোক্ত সারণিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা মালদা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রভৃতিতে মাদ্রাসার সংখ্যা বেশি এবং মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার দিক থেকেও এই জেলাগুলি এগিয়ে রয়েছে।

সারণি ২৪

পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক মাদ্রাসার সংখ্যা

জেলা	জুনিয়র হাই মাদ্রাসা	হাই মাদ্রাসা	সিনিয়র হাই মাদ্রাসা	মোট	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার
বাঁকুড়া	০৫	০৯	০১	১৫	৫২৯২
বীরভূম	০৫	২২	০৪	৩১	১৬৭৯৫
বর্ধমান	০০	৩১	০৩	৩৪	১৪৩০৭
কোচবিহার	০০	২১	০২	২৩	১৩৫২২
দক্ষিন দিনাজপুর	০৩	১২	০৪	১৯	১১৭৯৫
দার্জিলিং	০৩	০২	০০	০৫	৮৭২
হুগলী	০৭	২৪	০৯	৪০	২২১৭৫
হাওড়া	০৫	২৫	০৩	৩৩	১৯৩০৮
জলপাইগুড়ি	০৩	০৭	০১	১১	৭৫০৩
কলকাতা	০০	০৭	০১	১১	৩৬৮০
মালদা	১২	৫৫	১৪	৮১	৮৮৩৮১
মুর্শিদাবাদ	৪২	৫৩	১৬	১১১	১০৪১৯৩
নদীয়া	০৪	১৪	০৪	২২	১৬১৫৩
উত্তর ২৪ পরগণা	০৬	২৮	১৭	৫১	৩৭৮৯৭
পুরুলিয়া	০০	০৪	০১	০৫	৮১৫৯
পূর্ব মেদিনীপুর	০২	১৪	০২	১৮	৭৯৭৫
পশ্চিম মেদিনীপুর	০৩	১৩	০৩	১৯	৩৫৮০
দক্ষিন ২৪ পরগণা	০৩	৩৮	১২	৫৩	৩৬৯৮৯
উত্তর দিনাজপুর	০৯	১৫	০৫	২৯	২৫২৪৬
মোট	১১২	৩৯৫	১০২	৬০৯	৪৪৩৮২২

উৎসঃ Directorate of Madrasah Education, W.B., Bikas Bhavan, Kolkata, 2016ও সুশান্তপান্ডে, *পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণঃ হুগলি-হাওড়া-বর্ধমান-২৪পরগনা-মুর্শিদাবাদ,* অপ্রকাশিত, (১৯৫২-২০১০), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, পৃ. ১১৮ থেকে সংগৃহীত।

মালদা জেলার মাদ্রাসার পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায় বর্তমানে মালদা জেলায় জুনিয়র হাই মাদ্রাসার সংখ্যা ১২টি, হাই মাদ্রাসা সংখ্যা ৫৫ টি এবং সিনিয়র মাদ্রাসা ১৪ টি। মোট ৮১ টি মাদ্রাসায় ৮৩৮১ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে।

অন্যদিকে এম এস কে (মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র) গুলির ও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াযায়। ২০১২ সালের মাদ্রাসা বোর্ডের রিপোর্টে ৩৫৬ টি এম এস কে এর পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। এর মধ্যে কতগুলি উর্দু মাধ্যম ও বাংলা মাধ্যমের মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্র আছে। এম এস কে গুলিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়, এরপর ছাত্রছাত্রীরা হাই মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। মূলতঃ স্কুলছুট ছাত্রছাত্রী ও দুর্গম এলাকাগুলিতে মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করে থাকে। মালদা জেলায় এরকম শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ১৬টি, যা অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলগুলিতে অবস্থিত।

সারণি ২৫

জেলাভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের (এম এস কে) পরিসংখ্যান

জেলার নাম	এমএসকের সংখ্যা
বাঁকুড়া	০৪
বীরভূম	১৮
বর্ধমান	০৬
কোচবিহার	২৫
দক্ষিন দিনাজপুর	০৩
দার্জিলিং	০২
হুগলী	১৯
হাওড়া	১৩
জলপাইগুড়ি	১৫
কলকাতা	০৫
মালদা	১৬
মুর্শিদাবাদ	৭৩
নদীয়া	১৬
উত্তর ২৪ পরগণা	২৭
পশ্চিম মেদিনীপুর	১৮
পূর্ব মেদিনীপুর	১০
পুরুলিয়া	০৬
দক্ষিন ২৪ পরগণা	৪০
উত্তর দিনাজপুর	৪০
মোট	৩৫৬

উৎসঃ Annual Report for 2011-12, W.B Directorate of Madrasah Education, Minority Affairs and Madrasah Education Department, W.B, p.12.

খারিজি মাদ্রাসা- এটি 'নিজামিয়া' মাদ্রাসা নামে বেশি পরিচিত। সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে ও সাধারণ মানুষের দানে পরিচালিত।[৯৫] এই মাদ্রাসা গুলি দরিদ্র ও দুস্থ মুসলিম পরিবারের সন্তানরা বিনামূল্যে পড়াশোনা করে। খারিজি মাদ্রাসাগুলি প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মোট আটটি শ্রেণি থাকে, পাঠ্যক্রম মূলতঃ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত। অষ্টম শ্রেণীশেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রদের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ, সাহারানপুর বা মুরাদাবাদ এর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। নিজামীয়া মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা শেষ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর বিভিন্ন মসজিদের মৌলভী, হাফেজ হিসেবে যোগদান করে। ফলে একদিকে যেমন আর্থিক নিশ্চয়তা হয় তেমনি মাদ্রাসাগুলিতে বিনামূল্যে খাওয়া পড়ার সুবিধা থাকাই বহু দুস্থ পরিবারের অভিভাবকরা সন্তানদের খারিজী মাদ্রাসায় পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়ে যান। তবে এই সকল মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রীদের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা থাকে না।

এছাড়াও কোরানিয়া মাদ্রাসা কেবল কোরআন মুখস্থ করানোহয় ও বিভিন্ন এলাকার মসজিদগুলোর সাথে সংযুক্ত বহু মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রী ধর্মভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

বর্তমানে শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সমধিক উপলব্ধি হচ্ছে তাই শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল সর্বত্রই মাদ্রাসা অথবা স্কুল সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বালিকার সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়ে নারী শিক্ষার অগ্রগতি সূক্ষভাবে পর্যালোচনা করার জন্য মালদহ জেলার মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে আলোকপাত করা হল। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে মালদহ জেলার সমৃদ্ধি ও সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

মালদা জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমান মালদা জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার উন্নতি এবং অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের গৌড় জনপদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন, কারণ ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে বর্তমান মালদা জেলা গৌড় জনপদের অন্তর্গত ছিল। পানিনি সূত্রে গৌরপুর

নামে একটি অঞ্চলের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়পুর পূর্ব ভারতের অবস্থিত বলে বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং অনেকেই মনে করেন কৌটিল্যের উল্লেখিত গৌড় ও মালদা জেলার গৌড় একই জায়গায় অবস্থিত। তবে ইতিহাসগত ভাবে যে গৌড় দেশের বর্ণনা পাওয়া যায় তা পশ্চিমবাংলার মালদা, মুর্শিদাবাদ নিয়ে গঠিত ছিল। প্রাচীন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন গৌড় রাজ্য শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতিতে অত্যন্ত উন্নত হয়ে উঠেছিল।[৯৬]

প্রাচীন গৌড়ের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত ভারতবর্ষের শিক্ষার ঐতিহ্য অনুসারী ছিল। বৈদিক রীতি-নীতি অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হত। উপনয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী গুরুগৃহে শিক্ষা লাভের জন্য প্রবেশ করত এবং গুরু গৃহে থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করার পর গুরুদক্ষিণা দিতে হত।প্রাচীন বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যম যেহেতু সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল তাই গৌড়ভূমিতেও সাংস্কৃতিক ভাষা চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে সংস্কৃত ভাষা চর্চার আগে গৌড় ভূমিতে নিজস্ব গৌড়ীয় লিপি ও গৌড়ীয় ভাষা চর্চা প্রচলিত ছিল, যদিও তার কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সর্বক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। মৌর্য শাসনাধীন গৌড় পুণ্ড্রবর্ধনে সংস্কৃত শিক্ষার বহু বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল এবং আচার্য ও বিদ্যার্থীরা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল।[৯৭]

গৌড় পুণ্ড্রনগরীতে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রগুলি ছিল গ্রামে। গ্রামের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বৈদিক শিক্ষা বা ব্রাহ্মণীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারে সাথে সাথে বৌদ্ধ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিহার বা মহাবিহার গড়ে ওঠে। দুটি শিক্ষাকেন্দ্রেই শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত।গৌড় পুণ্ড্রনগরীতে গড়ে ওঠা শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সাথে বিভিন্ন জনপদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ ছিল। সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করার পর গৌড় বাসীরা সংস্কৃত অনুশীলনের নিজস্ব লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, যা গৌড়ীয় রীতি নামে পরিচিত, যা গৌড়ীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই গৌড়ীয় রীতির প্রবর্তনে বোঝা যায় গৌড়বঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[৯৮]

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভের পর বিভিন্ন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য বিহারগুলি গড়ে উঠতে শুরুকরে। বৌদ্ধ বিহার গুলিতে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল।একশুধুমাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের জন্য ও দ্বিতীয় সাধারণ গৃহীদের জন্য। বস্তুত ব্রাহ্মণীয় ও বৌদ্ধবিহার গুলির শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। উভয়ই জন্ম জন্মান্তরের ব্যূহভেদ করে জীবনের মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণ লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। গৌড় রাজধানীকে কেন্দ্র করেই উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। পাহাড়পুরে ছিল সোমপুরী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমে ছিল নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়।[৯৯] পাল সম্রাট ধর্মপাল সোমপুরী বিহারটি ও বিক্রমশীলা মহাবিহারটি নির্মাণ করেন। বিক্রমশীলা মহাবিহারে প্রবেশিকা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তবে শিক্ষার্থী এখানে প্রবেশ করতে পারত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বিহারে অবস্থিত হলেও প্রাচীন গৌড়জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করতে আসত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যাও অত্যাধিক হওয়ায় এর চাপ কমানোর জন্য রাজা গোপাল ওদন্তপুরী মহাবিহারটি নির্মাণ করেন। গৌড়ভূমির অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র জগদ্দল বিশ্ববিদ্যালয়টি পাল রাজা রামপাল নির্মাণ করেন। বর্তমান মালদহ জেলার বামন গোলা থানার জগদ্দল গ্রামে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। প্রায় একশত বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয় বহুছাত্র ও আচার্য নির্মাণ করে এর জ্ঞানের প্রভা বিকিরণ করেছে। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম আক্রমণের এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে যায়। পাল যুগের গৌড় বাংলা শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। এছাড়া মালদা জেলার জগজ্জীবনপুরের তুলাভিটা ঢিবিতে আরেকটি বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে, যা গৌড়বঙ্গের শিক্ষার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। পাল বংশের পরে সেন আমলেও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। সেন বংশের রাজা লক্ষণ সেনের সময় মুসলিম আক্রমণের ফলে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে ও মধ্যযুগের ও মুসলিম শাসনের সূচনা হল, যার প্রভাব ধীরে ধীরে শিক্ষা ক্ষেত্রেও পড়তে শুরু করে।

গৌড়ে নারী শিক্ষা:

গৌড় ভূমিতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে নারীদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। এই সময় নারীরা শাস্ত্রীয় অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বেদ পাঠ, যোজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু নারী শিক্ষা বিষয়ে জানার জন্য উপাদানের স্বল্পতা রয়েছে। নারী শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। শুধু বেদ পাঠ নয় প্রাচীন গৌড়ের নারীরা আবৃতি পাঠ, গান, কবিতা প্রভৃতির সাথেও যুক্ত ছিল। উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা সংসার চালানোর জন্য আয় ব্যয়ের হিসাবও রাখতেন।[১০০] বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করতে হত। অধ্যায়নের বিষয়গুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের একই ছিল। বিদ্যাশ্রমে নারীদেরও উপনয়ন সংস্কার হত।[১০১] বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের বাইরে বেরতে হলে চীবরবস্ত্র ধারণ করতে হত। সমাজে এই বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হত।

মধ্যযুগের গৌড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা :

লক্ষ্মাবতী বা লক্ষনৌতি বিজয়ের পর ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্মের প্রবেশের ফলে বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বহু হিন্দু ধর্মাবলম্বী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে গৌড় ভূমির শিক্ষা ব্যবস্থাতেও তার প্রভাব পড়তে থাকে। গৌড়ে তুর্কি আক্রমণের সময় বহু মন্দির ও শিক্ষাকেন্দ্র বৌদ্ধ বিহার গুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুসলমানদের প্রবেশের পর ইসলামের প্রতি আনুগত্য ও ইসলামধর্ম বিস্তারের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বক্তিয়ার খলজী ও অন্যান্য খলজি প্রশাসকেরা গৌড় ও পুণ্ড্রভূমিতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকরেছিল। প্রস্তরলিপি ও সমসাময়িক লিখিত উৎস হতে গৌড় ও সন্নিহিত অঞ্চলের মাদ্রাসা নির্মাণের ইতিহাস জানা যায়। সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের আমলে নির্মিত দরসবাড়ি মাদ্রাসা, আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলের

বেলবাড়ি মাদ্রাসা এবং নুসরাত শাহের আমলের বাঘা মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য। এইসব মাদ্রাসা গুলি ইসলাম প্রচার ও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।[১০২]

সুলতানি ও মুঘল যুগের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র মক্তব নামে পরিচিত যা বেশিরভাগ সময় মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকত এবং মাদ্রাসাগুলি উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল। গৌড় ও পাভুয়ার বিভিন্ন মসজিদের সাথে মাদ্রাসা সংযুক্তির কথা জানা যায়। গৌড়ের বড়সোনা মসজিদের উত্তর-পশ্চিম দিকের উচ্চভূমিতে ভগ্নাবশেষ থেকে মাদ্রাসার চিহ্ন পাওয়া গেছে। গৌড়ের ছাত্ররা এইসব মাদ্রাসাগুলিতে উচ্চশিক্ষা লাভ করত।

গৌড় পুন্ড্রনগরীতে মেয়েদের শিক্ষার পৃথক কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না, ছেলেদের সাথেই তারা মক্তব গুলিতে শিক্ষা লাভ করত। মেয়েদের সর্বজনীন শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। রাজপরিবারের মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেলেও বস্তুত তারা গৃহ অভ্যন্তরে শিক্ষালাভ করত। এইভাবে মধ্যযুগে জেনানা শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছিল। পর্দা প্রথার কঠোরতা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। অল্প বয়সে বিবাহ ও পর্দাপ্রথা নারী শিক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল বহিরাক্রমণ, রাজহত্যা, যুদ্ধ লড়াই প্রভৃতি যা নারী শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছিল।

ব্রিটিশ শাসনাধীন মালদাহে শিক্ষার প্রসার :

প্রাচীন ও মধ্যযুগের গৌড় পাভুয়াকে কেন্দ্র করে ইংরেজবাজার ও মালদা জেলা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বাস্তবে মালদা জেলার আবির্ভাব ঘটে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে।[১০৩] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম দিকে ভারতে শিক্ষার প্রসারে তেমন উদ্যোগী ছিল না। ১৮১৩ চার্টার অ্যাক্ট এরপর থেকে ভারতে শিক্ষাখাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তারই সূত্র ধরে মালদাতেও শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করে। অষ্টাদশ ও উনিশশতকের মালদা জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা সাধারণত ইংরেজ

কর্মচারীদের বিবরণ থেকে জানতে পারি। প্রথম দিকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ছিল। দেশীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মিশনারী সদস্য উইলিয়াম কেরী মদনাবতীতে ৪০ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে হ্যামিলটন বুকানন মালদায় আসেন। হ্যামিলটনের সার্ভে ১৮১০ থেকে মালদা জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা একটি চিত্র পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন প্রত্যেক গ্রামে পাঠশালা উপস্থিত ছিল। এই পাঠশালা গুলি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র রূপে কাজ করত এবং যারা শিক্ষা দিত তাদের গুরু বলা হত।[১০৪]এই সময় হিন্দু ছাত্ররা টোল ও মুসলিম ছাত্ররা মক্তব ও মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। মাদ্রাসায় ফার্সি ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামিক ধর্ম শাস্ত্র পাঠ হত।

১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ অনুসারে ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার রূপরেখা তৈরি হয় এবং সেই অনুসারে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও বিভিন্ন জেলায় সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠার সিধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিধান্তের সূত্র ধরে সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে ১৮৫৮ সালে মালদা জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই স্কুল চালানোর শীর্ষে থাকবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ।[১০৫] কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারি হেনরী উড মালদা জেলা স্কুলের একজন হেড পন্ডিত নিযুক্ত করেন, যার মাসিক বেতন ছিল ১৫ টাকা। মাত্র ৪০ জন ছাত্র নিয়ে মালদা জেলা স্কুলের পথ চলা শুরু হয়।

মালদা জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মালদা এর বিভিন্ন জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মালদা শহরে দুটি, পুরাতন মালদাতে একটি এবং আড়াই ডাঙ্গা, চাঁচল ও মথুরাপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[১০৬] তবে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি। ১৮৬০-৬১ সালে মালদহ জেলায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। ১৮৭০-৭১ সালে একটি ইংরেজি স্কুল ও তিনটি দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য স্কুল খোলা হয়। এছাড়া তিনটি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ইংরেজি এবং দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য ১১ টি স্কুল খোলা হয়েছিল।

উনিশ শতকে বাংলার সর্বত্র নারী শিক্ষারপ্রসার ঘটতে শুরু করলেসেই সময় মালদায় সংস্কারপন্থীরা ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মালদহে নারী শিক্ষার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কুসংস্কারপন্থীদের বিরোধিতা সত্বেও ৪২ জন হিন্দু ও ৬ জন মুসলিম ছাত্রী নিয়ে মালদা গার্লস স্কুল শুরু হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয় রূপে স্বীকৃতি লাভ করে এই বালিকা বিদ্যালয়টি। মালদা জেলা এই সময় ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডিভিশনাল কমিশনার জি. এস. বার্ল মারা গেলে তার স্মৃতি রক্ষার্থে কয়েকজন ইংরেজ অনুরাগী মালদা শহরবাসী বার্ল মেমোরিয়াল কমিটির গঠন করেন।এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের জন্য একটি বড় হলঘর প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৮৭ সালে স্কুল কর্তৃপক্ষ কমিটির কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করলে বার্ল মেমোরিয়াল কমিটি সর্বসম্মতি ক্রমে মাননীয় বার্ল সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে সংগৃহীত অর্থ মালদা গার্লস স্কুলকে শর্ত সাপেক্ষে দান করে। শর্তানুযায়ী স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে বার্ল গার্লস স্কুল রাখা হয়।[১০৭] স্কুলটি প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে শুরু হয়েছিল, পরে ১৯৯২ সালে এটি মিডল ইংলিশ স্কুল এবং ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হাই স্কুলের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

১৮৮৮ সালে আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা হল চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন। চাঁচল রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী তার মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এই স্কুলটি স্থাপন করেন। এই স্কুলের ব্যয়ভার চাঁচল রাজ এস্টেটের দ্বারা চালিত হত, পরে ১৯৩৮ সালে এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হাই স্কুলের মর্যাদা পায়।[১০৮] যা আজও নারী শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

১৯০৫ সালের ভারতে সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে সর্বত্র জাতীয় শিক্ষা সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০৭ সালে ৬ই জুন মালদা জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমিতি কর্তৃক কলিগ্রাম, কুতুবপুর, ধরমপুরে প্রাথমিক ও নৈশ বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১০৯] কারিগরী শিক্ষার প্রসারেওএই সমিতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বদেশী ভাষায় শিক্ষার প্রসার ঘটলেও পরবর্তীকালে তাতে

কিছুটা ভাটা পড়ে এবং ইংরেজি শিক্ষার জোয়ার আসে। ১৯৩৮ সালে মকদমপুরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যা ইংরেজবাজার এম. ই. স্কুল নামে পরিচিত। ১৯৪৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে মালদা টাউন এইচ ই স্কুল করা হয়। ১৯৪৯ সালে এই স্কুলটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃত হাই স্কুলের অনুমোদন পায়।[১১০]

মালদা জেলায় অমুসলিমদের তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতি কম ছিল। G. E. Lamboun তার মালদা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত শেরশাবাদিয়ারা কোন ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বিরোধী ছিল।[১১১] হিন্দু জমিদাররা যেভাবে শিক্ষার অগ্রগতিতে এগিয়ে এসেছিল, মুসলমান জমিদারদের ততটা আগ্রহ ছিল না, পরে এর পরিবর্তন ঘটে। মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মালদা মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন। ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মালদা মডেল মাদ্রাসা এবং আব্দুল গনি সাহেব এর সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। প্রথমে এটি স্থাপিত হয় মীরচকে, পরে এটি কে জে সান্যাল রোডে এর বর্তমান অবস্থানের স্থানান্তরিত করা হয়।

মালদায় স্কুল শিক্ষার প্রসার তাড়াতাড়ি হলেও কলেজ স্থাপনে অনেক দেরি হয়েছিল। ১৯44 সালে মালদায় প্রথম কলেজ স্থাপিত হয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মালদা জেলা আর একধাপ এগিয়ে যায়। তবে অধ্যাপক গবেষক রত্না রায় সান্যাল মনে করেন যেখানে উত্তরবঙ্গে সর্বপ্রথম স্কুল স্থাপিত হয়েছিল সেখানে কলেজ স্থাপনে এতদেরি হল কেন? তিনি অনুমান করেছেন মালদা সেই সময় রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাজশাহীতে অনেক আগে থেকেই কলেজ ছিল। তাই হয়ত মালদায় পৃথক কলেজ স্থাপনের চেষ্টা হয়নি।[১১২]

স্বাধীনতার পূর্বে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা :

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫টি থানা নিয়ে প্রশাসনিকভাবে মালদা জেলা গঠিত হয়।তৎকালীন পূর্ণিয়া জেলা থেকে পাঁচটি থানা (কালিয়াচক, খরবা, গোরগরিবা, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ) কেটে মালদার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। এই উত্তরের অঞ্চল গুলি ছিল দুর্গম বন জঙ্গলে ভর্তি, অনুন্নত।

স্বাভাবিকভাবেই উত্তর মালদার তুলনায় দক্ষিণ মালদা অগ্রসর ও উন্নত ছিল। মালদার পার্শ্ববর্তী ভাগলপুর, রাজমহল, দিনাজপুর, রাজশাহী বহু এলাকার সংমিশ্রনের ফলে মালদার ভাষা-সংস্কৃতি প্রভৃতিতে এর প্রভাবে এক মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। এই মিশ্র সংস্কৃতি মালদার নারী শিক্ষার ওপরও প্রভাব বিস্তার করে।

মালদার মুসলমান সমাজ প্রথম দিকে নারী শিক্ষার বিরোধী ছিল। শুধুমাত্র পুত্র সন্তানদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠানো হত, নারীদের জন্য কেবলমাত্র ধর্মভিত্তিক ইসলাম শাস্ত্রীয় শিক্ষা ধার্য করেছিল এবং গৃহ ছিল তাদের একমাত্র স্থান। উনিশ শতকের শেষের দশকে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলে মালদহের কতিপয় শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষজন মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। ইংরেজবাজার শহরে মুসলিম সমাজ বালিকাদের শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হয়। মিরচক, ফুলবাড়ী প্রভৃতি মহল্লায় মোসলেম লোয়ার প্রাইমারি মক্তব ও ইসলামিয়া আপার প্রাইমারী মক্তবে মুসলিম ছাত্রীরা পড়াশুনা করত। ১৯১৬ সালে ডক্টর কাজী আজহারউদ্দিন জালালিয়া গার্লস নামে মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে বিবিগ্রাম, হায়দারপুর, মিরচক, মহেশমাটি প্রভৃতি এলাকার মুসলিম মেয়েরা এখানে পড়াশোনা করত। এই মক্তবগুলির ব্যয়-ভারওয়াকাফ সম্পত্তির দ্বারা পরিচালিত হত। জালালিয়া গার্লস মক্তবে ছাত্রীদের অবৈতনিক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা, উন্নত পাঠক্রম প্রভৃতি নানা দিক থেকে পার্থক্য দেখে মুসলিম সমাজ আকৃষ্ট হন। বাল্যবিবাহের যুগে অনেক বিবাহিত বালিকা বধূও এখানে পড়তে আসত।[১১৩] ১৯৩৫ সালে জালালিয়া মক্তব শিক্ষার জন্য ইম্পেরিয়াল গ্রান্ড লাভ করে।

১৯৩২ সালে আইহো গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা আব্দুস সোবহান শাহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য একদিন পরিচ্ছন্নতা দিবস পালিত হত।[১১৪] মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য মৌলভী আব্দুল গনি মিরচক, বামনগ্রাম, চককীর্তি, চন্ডীপুর, বিরুয়া, চামাগ্রাম প্রভৃতি জায়গায়

জনসভা করে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। সেই সময় বার্ল গার্লস স্কুল থেকে তিনজন ছাত্রী মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরা হলেন হাসিনা খাতুন, আমেনা খাতুন ও জবা খাতুন।[১১৫]

মালদা কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম সানাউল্লাহ হিন্দু ছাত্রীদের পাশাপাশি মুসলিম ছাত্রীদেরও কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। দাদনচক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ইদ্রিশ আহমেদ মালদা কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। মালদা কলেজ প্রতিষ্ঠা মালদার মুসলিম ছাত্রীদের জীবনে আলোর দিশা নিয়ে আসে।এই কলেজের মুসলিম ছাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুজাপুরের হুমেরা খাতুন। তিনি মালদা কলেজের পড়াশোনা শেষ করে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন, পরে তিনি রংপুরে বিখ্যাত ডাক্তার হিসেবে পরিচিত হন।[১১৬]

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মালদহ জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান :

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ও শিক্ষিতের হার স্থান কাল সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন হতে পারে। শিক্ষার হার সাধারণত নির্ভর করে কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক,অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের ওপর। ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় হল মুসলিম। পশ্চিমবঙ্গেও দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রথম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিম। কিন্তু বর্তমানে মালদা জেলায় মুসলিম জনসংখ্যায় ভিন্ন চিত্র দেখা যায়।

২০১১ সেন্সাস অনুযায়ী মালদা জেলার বৃহত্তম জনসংখ্যা হল মুসলিম (৫১.৭৭%)। এই বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম জনজাতির অর্ধেক হচ্ছে নারী। স্বাভাবিকভাবে নারী শিক্ষা, নারী উন্নতি ব্যতীত সমগ্র জাতির উন্নতি অসম্ভব। স্বাধীনতার পূর্বে মালদায় মুসলিম জাতির শিক্ষা উন্নতি বিশেষ ঘটেনি। মধ্যযুগীয় মুসলিম সমাজ তখন নারী শিক্ষার বিরোধী ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে কিছু সমাজ সংস্কারক মুসলিম ব্যক্তিবর্গ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করে। ফলে নারী শিক্ষার খানিকটা অগ্রগতি ঘটলেও আশানুরূপ ফল হয়নি। ১৯৫১ থেকে ২০১১

পর্যন্ত ভারত, পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার শিক্ষার হার পর্যালোচনা করলে নারী শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ২৬

মালদা জেলার শিক্ষার হারের অগ্রগতি (শতকরা হিসেবে)

সাল	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
১৯৫১	২৭.২৩	৮.৯০	১৮.৩১	৩৪.৬০	১৩.২০	২৪.৯০	১৮.১০	৫.০০	১১.৬৮
১৯৬১	৪০.৪০	১৫.৪৭	২৮.৩০	৪৬.৫০	২০.৩২	৩৪.৫০	২৫.৭০	৭.০২	১৬.৬০
১৯৭১	৪৬.০০	২২.০০	৩৪.৪৫	৪৯.৫০	২৬.৫০	৩৮.৯১	২৯.৯০	১১.২০	২০.৮৬
১৯৮১	৫৬.৪০	২৯.৮০	৪৩.৬৫	৫৭.১০	৩৪.৪০	৪৬.৩৪	৩৬.১০	১৬.৩০	২৬.৫২
১৯৯১	৬৪.১০	৩৯.৩০	৫২.২১	৬৭.৮০	৪৬.৬০	৫৭.৭৩	৪৫.৬০	২৪.৯২	৩৫.৬২
২০০১	৭৫.৮০	৫৪.২০	৬৫.২০	৭৭.১০	৫৯.৬০	৬৮.৬৪	৫৮.৮০	৪১.২৫	৫০.২৮
২০১১	৮২.১৪	৬৫.৪৬	৭৪.০৪	৮১.৬৯	৭০.৫৪	৭৬.২৬	৬৬.২৪	৫৬.৯৬	৬১.৭৩

তথ্যসূত্রঃ সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৫১-২০১১, ভারতবর্ষ।

সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ সালে সারা ভারতের মোট জনসংখ্যার শিক্ষিতের হার ১৮.৩১ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২৪.৯০ শতাংশ এবং মালদা জেলায় ১১.৩৮ শতাংশ। মালদা জেলার শিক্ষিতের হার ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতের হারের থেকে অনেক কম। আবার ১৯৮১ সালে সেন্সাস রিপোর্ট এর দিকে তাকালে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের মোট শিক্ষার হার ৪৬.৪৮ শতাংশ এবং মালদা জেলা শিক্ষার হার ২৬.৫২ শতাংশ, যা অনেক কম। আবার ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের নারী শিক্ষার আর ৩৪.৪০ শতাংশ, মালদায় নারী শিক্ষার হার ১৬.৩০ শতাংশ। অতএব বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হলেও মালদা জেলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব কম ও ধীর গতিতে হচ্ছে। তবে ১৯৯১ থেকে ২০১১ সেন্সাস রিপোর্টের দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই সময়কালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি কিছুটা ত্বরান্বিত

হয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মালদা জেলার নারী শিক্ষার হার যথাক্রমে ২৪.৯২%, ৪১.২৫% এবং ৫৬.৯৬% যাপশ্চিমবঙ্গের নারী শিক্ষার হার (৪৬.৬০%, ৫৯.৯৬%, ৭০.৫৪%) এবং ভারতের নারী শিক্ষার হার (৩৯.৩০%, ৫৪.২০%, ৬৫.৪৬%) থেকে কম। বিগত তিন দশক থেকে মালদা জেলার নারী শিক্ষার হার খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবার উপরোক্ত সারণী থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যবধান নজরে আসে। ১৯৫১ সালে মালদা শহরে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল, সর্বমোট জনসংখ্যার ৩৬.৯৭ শতাংশ, পুরুষ শিক্ষিতের হার ১৮.১০% এবং নারী শিক্ষার হার ৫.০০ শতাংশ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম দিকে নারী শিক্ষারহার খুব কম ছিল। ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত সময়কালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব ধীরগতিতে হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সরকারি কমিশন ও কমিটি গুলি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যেসব সুপারিশ করেছে এবং সরকার কর্তৃক তা প্রয়োগের ফলে সমাজের নারী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠে, যার ফলস্বরূপ আমরা ১৯৯১- ২০১১ পর্যন্ত মালদা জেলার নারী শিক্ষার হারে বৃদ্ধি দেখতে পায়। সামগ্রিকভাবে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটলেও মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে হয়নি। ২০০১ এর সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় মালদা জেলায় মুসলিম স্ত্রী শিক্ষার হার ছিল ৩৮.৬৮ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ছিল ৫১.৫৬ শতাংশ। আবার ২০১১ রিপোর্টে মালদা জেলার মুসলিম নারী শিক্ষার হার ৫৭.২০ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার৬৬.৮০%। ২০০১ সালের স্ত্রী- পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান প্রায় ১৩% এবং ২০১১ সালে শিক্ষার হারের ব্যবধান প্রায় ১০%। এর থেকে বোঝা যায় মুসলিম নারীরা শিক্ষাগত দিক থেকে পুরুষদের সদস্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে এই চিত্র আরো প্রকট হয়ে ওঠে গবেষক নাজমুল হোসেন এর"*Muslim and Non-Muslim Differential in Education, Employment and Fertility in Malda District*". নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে।[১১৭] তিনি গবেষণা গ্রন্থটিতে ক্ষেত্র

সমীক্ষার দ্বারা মালদা জেলার ব্লক গুলিতে মুসলিম নারীর শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছেন।

সারণি ২৭

ব্লক অনুযায়ী লিঙ্গ ভেদে মালদা জেলার শিক্ষার হার ২০০৯ (শতকরা হিসেবে)

ব্লক	অমুসলিম			মুসলিম			মোট		
গ্রাম্য এলাকা	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
হরিশচন্দ্রপুর ১	৬৯.৩৮	৫৯.৬২	৬৪.৬৫	৫৯.৮৯	৫১.৬০	৫৫.৬৮	৬৩.৪৮	৫৪.৪৫	৫৮.৯৭
হরিশচন্দ্রপুর ২	৬৭.৫৯	৫৬.১৯	৬১.৯৭	৫৬.৬৪	৪৬.৮৯	৫১.৮৮	৫৯.৬৪	৪৯.৪৭	৫৪.৬৬
চাঁচল ১	৭৫.৬৩	৬৭.৩৮	৭১.৭৬	৭০.৬৭	৬২.৬০	৬৬.৮৫	৭২.৪৬	৬৪.৩০	৬৮.৬২
চাঁচল ২	৬৮.৪৭	৫৯.৭৭	৬৪.৬৫	৬২.৮২	৫২.১৮	৫৭.৬৩	৬৩.৯৭	৫৩.৫১	৫৮.৯৬
রতুয়া ১	৭২.৬৪	৬৪.১৫	৬৮.৮৯	৬১.৯৪	৫২.১২	৫৭.১৪	৬৬.৭৪	৫৬.৯৬	৬২.১৬
রতুয়া ২	৭১.৭০	৬২.৭১	৬৬.৯৬	৬৪.৭১	৫২.৭৮	৫৯.২৪	৬৬.৩৭	৫৫.৬৭	৬১.২৭
মানিকচক	৭৩.২২	৬২.৯৬	৬৮.৩৫	৬৫.৭০	৫৬.২৭	৬১.২২	৬৮.৯৮	৫৯.১৯	৬৪.৩৩
ইংরেজবাজার	৭৪.০৩	৬৪.৭৬	৭০.২৭	৬৫.৩৬	৫৭.৬৫	৬১.৬০	৬৯.৩৮	৬০.৩৬	৬৫.৩০
ওল্ডমালদা	৭১.৮৮	৫৮.৪৫	৬৫.৬৪	৬৬.৬৭	৫৯.৫৫	৬৩.৩০	৭০.৪২	৫৮.৭৭	৬৫.০১
হবিবপুর	৬৮.৪৪	৫৫.৪৫	৬২.৩৬	৬৭.৮৬	৫৬.০০	৬২.২৬	৬৮.৪১	৫৫.৪৮	৬২.৩৫
বামনগোলা	৬৯.৮৭	৫৭.১০	৬৩.৪৭	৬৭.০৬	৫৭.৩৩	৬২.৫০	৬৯.২৫	৫৭.১৪	৬৩.২৭
গাজল	৭০.৫৬	৫৫.৩২	৬৩.৬২	৬৭.৫৬	৫৮.৬১	৬৩.২৬	৬৯.৩৫	৫৬.৭২	৬৩.৪৭
কালিয়াচক ১	৭৫.৪১	৬৮.৬৩	৭২.৩২	৭০.৭৯	৬৩.৫৪	৬৭.৩৬	৭১.৮৬	৬৪.৬৬	৬৪.৪৮
কালিয়াচক ২	৭২.২২	৬৪.৫২	৬৮.৪০	৬৫.৭৪	৫৬.৪৮	৬১.৩৭	৬৮.১৩	৫৯.৬২	৬৪.০৪
কালিয়াচক ৩	৬৯.৩৫	৫৮.২৬	৬৪.০২	৬১.৬০	৫৩.৩৩	৫৭.৫৫	৬৫.৪৬	৫৫.৭৪	৬০.৭৪
মোট গ্রাম্য এলাকা	৭১.০০	৫৯.৪৯	৬৫.৬০	৬৪.৬২	৫৫.২৯	৬০.১৩	৬৭.৬৮	৫৭.২৫	৬২.৭২
শহরাঞ্চল (পৌরএলাকা)									
ইংরেজবাজার	৯৫.৯৬	৯১.৫৮	৯৩.৮১	৮৯.৮০	৮২.৬১	৮৬.৩২	৯২.৮৯	৮৭.১৭	৯০.১০
ওল্ডমালদা	৯০.২২	৮৭.০১	৮৮.৭৬	৮৬.১৪	৮১.০৫	৮৩.৬৭	৮৮.০৮	৮৩.৭২	৮৬.০৩
মোট শহরাঞ্চল	৯৩.১৯	৮৯.৫৩	৯১.৪৬	৮৭.৯৪	৮১.৮২	৮৪.৯৭	৯০.৫১	৮৫.৫২	৮৮.১২
মালদা জেলা মোট	৭২.৩৯	৬১.৪০	৬৭.২৩	৬৬.০২	৫৬.৯১	৬১.৬৩	৬৯.০৮	৫৯.০১	৬৪.২৯

উৎসঃ Hossain Najmul, *Muslim Non-Muslim Differentials in Education, Employment and Fertility in Malda District, West Bengal*, Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011, p.125 থেকে সংগৃহীত।

আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত অবস্থানও ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষাগত অবস্থান পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ধর্মীয় বাতাবরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরোক্ত সারণীতে নাজমুল হাসান কর্তৃক ক্ষেত্রসমীক্ষা তথ্য থেকে মালদা জেলার মুসলিম অমুসলিম জনগণের লিঙ্গভেদে শিক্ষার হার সম্পর্কে সম্যখ ধারণা পাওয়া যায়। উপরোক্ত সারণী থেকে জানা যায় মালদা জেলার মোট শিক্ষার হার ৬৪.২৯ শতাংশ, যার মধ্যে পুরুষ ৬৯.০৮ শতাংশ ও নারী ৫৯.০১ শতাংশ শিক্ষিত, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবধান ১০%। উপরোক্ত সারণিতে মালদা জেলার মুসলিম নারী পুরুষের শিক্ষার হারের যে চিত্র পায় তাতে দেখা যাচ্ছে মুসলিম নারী শিক্ষাগত দিক থেকে পুরুষদের থেকে পিছিয়ে, এমনকি তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীদের থেকেও পিছিয়ে রয়েছে। ২০১১ সেন্সাস অনুযায়ী সবথেকে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হল কালিয়াচক ১, হরিশ্চন্দ্রপুর ২, রতুয়া ২, কালিয়াচক ১ ব্লকে মুসলিম নারী পুরুষের শিক্ষার হার যথাক্রমে ৬৩.৫৪ শতাংশ ও ৭০.৭৯ শতাংশ। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকে নারী-পুরুষের শিক্ষার হার ৪৬.৮৯ শতাংশও ৫৬.৬৪ শতাংশ এবং রতুয়া ২ ব্লকে নারী-পুরুষের শিক্ষার হার যথাক্রমে ৫২.৭২ শতাংশ ও ৬৪.৭১ শতাংশ। রতুয়া ২ ও হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের নারী শিক্ষার হার খুব কম। আবার গ্রামাঞ্চল ও শরাঞ্চলের মধ্যেও শিক্ষার হারের তফাৎ নজরে পড়ার মত। শহরের জনগণ শিক্ষা সম্পর্কে যে সচেতন তা শিক্ষার হার দেখলেই বোঝা যায়। ইংরেজবাজার ও ওল্ডমালদা পৌরসভা এলাকায় নারী-পুরুষের শিক্ষার হার ৮৫.৫২ শতাংশ ও ৯০.৫১ শতাংশ, গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা অনেক বেশি। শহরাঞ্চলে মুসলিম নারী পুরুষের শিক্ষার হার যথাক্রমে ৮১.৮২ শতাংশ ও ৮৭.৯৪ শতাংশ, শহরাঞ্চলে নারী পুরুষের শিক্ষার ব্যবধানওকম বর্তমান। গ্রামাঞ্চলে মুসলিম নারী শিক্ষার হার কম থাকার কারণ হিসেবে নাজমুল হোসেন দূরবর্তী স্কুল, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, অর্থনৈতিক দূরাবস্থা প্রভৃতি কারণকে দায়ী করেছেন।[১১৮]

সারণি ২৮

২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মালদা জেলার লিঙ্গভেদে শিক্ষার হার (শতকরা হিসেবে)

ব্লক	মোট	পুরুষ	নারী	ব্যবধান
হরিশচন্দ্রপুর ১	৫২.৪৭	৫৭.৩৭	৪৭.২১	১০.১৬
হরিশচন্দ্রপুর ২	৫৪.৩৮	৫৭.২১	৫১.২৩	৫.৯৮
চাঁচল ১	৬৫.৯০	৬৮.৭৬	৬১.২২	৭.৫৪
চাঁচল ২	৫৭.৩৮	৫৯.৯৭	৫৪.৬৬	৫.৩১
রতুয়া ১	৬০.১৩	৬৪.১৭	৫৫.৮১	৮.৩৬
রতুয়া ২	৫৬.১৯	৫৮.৩১	৫৩.৯৮	৪.৩৩
গাজল	৬৩.৭০	৬৯.৭৯	৫৬.১৩	১৩.৬৬
বামনগোলা	৬৮.০৯	৭৫.৫২	৬০.২০	১৫.৩২
হবিবপুর	৫৮.৮১	৬৬.৬৯	৫০.৭৪	১৫.৯৫
ওল্ডমালদা	৫৯.৬১	৬৫.২৫	৫৩.৬৬	১১.৫৯
ইংরেজবাজার	৬৩.০৩	৬৬.৯৬	৫৮.৮৮	৮.০৮
মানিকচক	৫৭.৭৭	৬৪.১৮	৫০.৮৯	১৩.২৯
কালিয়াচক ১	৬৫.২৫	৬৮.১৩	৬২.২৫	৫.৮৮
কালিয়াচক ২	৬৪.৮৯	৬৯.৬০	৫৯.৯৩	৯.৬৭
কালিয়াচক ৩	৫৪.১৬	৫৯.৯১	৪৮..০৭	১.৮৪
অন্যান্য এলাকা	৮৩.১৫	৮৪.৪১	৮১.৭২	২.৬৯
মালদা জেলা	৬১.৭৩	৬৬.২৪	৫৬.৯৬	৯.২৪

উৎসঃ ২০১১ মালদা জেলা সেন্সাস রিপোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উপরোক্ত সারণী থেকে মালদা জেলার ব্লকগুলিতে নারী পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান স্পষ্ট বোঝা যায়। সবথেকে বেশি ব্যবধান বোঝা যায় হবিবপুর ব্লকে যেখানে পুরুষ শিক্ষার হার ৬৬.৭৯ শতাংশ ও নারী শিক্ষার হার ৫০.৭৪ শতাংশ। অপরদিকে সব থেকে কম শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবধান লক্ষ্য করা যায় রতুয়া ২ ব্লকে। এখানে পুরুষ ও নারী শিক্ষার হার যথাক্রমে ৫৮.৩১

শতাংশ ও ৫৩.৯৮ শতাংশ। সবগুলি ব্লকেই দেখা যাচ্ছে নারী, শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে পিছিয়ে রয়েছে।

মালদা জেলার নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান বিশেষ করে মুসলিম নারীর শিক্ষা গত অবস্থান পর্যালোচনা করার জন্য পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্ন সূচী অনুযায়ী ক্ষেত্র সমীক্ষা শুরু করাহয়। গবেষণার ক্ষেত্র যেহেতু মালদা জেলা তাই মালদা জেলা চারটি ব্লককে সমীক্ষা ক্ষেত্রে হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সমীক্ষার জন্য মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলের তিনটি ব্লক ও শহরাঞ্চলের একটি ব্লক (পৌর এলাকা)কে নির্বাচন করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের সব থেকে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে দক্ষিণ মালদার কালিয়াচক ১ ব্লক ও শহরাঞ্চলে ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা) এবং উত্তর মালদার মানিকচক ব্লক (মাঝারি মাপের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা) ও রতুয়া ১ ব্লককে সমীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে স্থির করা হয়।

২০১১ সেন্সাস অনুযায়ী কালিয়াচক ১ ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,৯২,৫১৭, তার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হল ৩,৫০,৪৭৪ (৮৯.২৯%)। দেখা যাচ্ছে কালিয়াচক ১ হল সবথেকে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এর মধ্যে ১,৭৮,৭৯৫ (৫১.০১%)। পুরুষ ও নারীর সংখ্যা হল ১,৭১,৬৮০ (৪৮.৯৯%)। গ্রামাঞ্চলের আরও একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হল রতুয়া ১ ব্লক। এর মোট লোক সংখ্যা হল ২,৭৫,৩৮৮, এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হল ১,৮৪,১৭৭ (৬৬.৮৮%)। মোট মুসলিম জনসংখ্যার পুরুষ সদস্য হল ৯৪,৬৯৫ (৫১.৮৪%) এবং নারীর সদস্য হল ৮৯,৪৮২ (৪৮.৫৮%)। মাঝারি মানের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা মানিকচক ব্লকের মোট জনসংখ্যা ২,৬৯,৮১৩। তার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হল ১,১৮,৩৯১ (৪৩.৮৮%)। মোট মুসলিম জনসংখ্যার ৬০,৮২৯ (৫১.৩৮%) পুরুষ ও ৫৭,৫৬২ (৪৮.৬৯%) হল নারী। আবার শহরাঞ্চল ইংরেজ বাজারের মোট জনসংখ্যা ২,৭৪,৬২৭ এর ১,৪১,৪১০ (৫১.৫০%) জন মুসলিম, অর্ধেক হল মুসলিম জনগন। মোট মুসলিম জনসংখ্যার ৭২,২৯৭ (৫১.১৩%) পুরুষও ৬৯,১১৮ (৪৮.৮৭%) নারী। মালদা জেলার সর্বমোট মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী।

স্বাভাবিকভাবেই এই নারী জাতির শিক্ষাগত অবস্থান জানা বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষেত্র সমীক্ষা দ্বারা ২০০০ জন মুসলিম মহিলাদের নমুনা হিসেবে সংগ্রহ নির্বাচন করা হয়েছে।

২০১১ আদমশুমারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মালদা জেলার মোট শিক্ষারহার ৬১.৭৩ শতাংশ। তার মধ্যে পুরুষ শিক্ষার হার ৬৬.২৪ শতাংশ ও নারী শিক্ষার হার ৫৬.৯৬ শতাংশ। কালিয়াচক ১ ব্লকের মোট শিক্ষিতের হার ৬৫.২৫% এবং নারী শিক্ষার ৬২.২৫% এবং পুরুষ শিক্ষার হার ৬৮.১৩ শতাংশ। রতুয়া ১ ব্লকে মোট শিক্ষিতের হার ৬০.১৩ শতাংশ, এর মধ্যে পুরুষ শিক্ষিতের হার ৬৪.১৭ শতাংশ এবং নারী শিক্ষার হার ৫৫.৮১ শতাংশ। মানিকচক ব্লকের মোট শিক্ষিতের হার৫৭.৭৭ শতাংশ, মোট পুরুষ শিক্ষিতের হার ৬৪.১৮ শতাংশ এবং নারীর শিক্ষার হার ৫০.৮৯%। একইভাবে ইংরেজবাজার পৌর এলাকায় মোট শিক্ষিতের হার ৬৩.০৩ শতাংশ, পুরুষ ৬৬.৯৬ শতাংশ এবং নারী ৫৮.৮৮ শতাংশ শিক্ষিতের হার পাওয়া যায়। উপরের পরিসংখ্যায়ন থেকে এটি পরিষ্কার যে নারী শিক্ষার হার পুরুষের থেকে অনেক কম। গবেষক নাজমুল হোসেনের *'Muslim Non-Muslim Differentials in Education, Employment and Fertility in Malda District'.*[১১৯] নামক গবেষণা পত্র থেকে কালিয়াচক ১ ব্লকের মুসলিম শিক্ষার হার পাওয়া যায় ৬৭.৩৬ শতাংশ, এর মধ্যে পুরুষ ৭০.৭৯ শতাংশ ও নারী ৬৩.৫৪ শতাংশ শিক্ষিত। আবার রতুয়া ১ এর মোট মুসলিম শিক্ষার হার ৫৭.১৪% এর মধ্যে পুরুষ ৬১.৯৪শতাংশ ও নারী ৫২.১২ শতাংশ শিক্ষিত। কম মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা মানিকচক ব্লকে ৬১.২২ শতাংশ শিক্ষিত, এর মধ্যে ৬৫.৭০ শতাংশ পুরুষ ও ৫৬.২৭ শতাংশ নারী শিক্ষিত। পৌর এলাকা ইংরেজবাজারে মোট মুসলিম শিক্ষিতের হার ৬১.৫% এর মধ্যে ৬৫.৩৬ শতাংশ পুরুষ ও ৫৭.৬৫ শতাংশ নারী শিক্ষিত। নাজমুল হোসেনের পরিসংখ্যায়ন থেকে নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান দেখতে পায় এবং নারী সব সময় শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে পিছিয়ে। এর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা শুরু করি।

সারণি ২৯

মালদা জেলার সামীক্ষা ক্ষেত্রগুলির মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান

শিক্ষাগত অবস্থান	কালিয়াচক ১	রতুয়া ১	মানিকচক	ইংরেজ বাজার (পৌর এলাকা)
অশিক্ষিত	০৯ (১.৮০%)	১২ (২.৪০%)	১৭ (৩.৪০%)	০৭ (১.৪০%)
প্রাথমিকের নিচে	৭৭ (১৫.৪০%)	৭১ (১৪.২০%)	৮০ (১৬.০০%)	৩০ (৬.০০%)
প্রাথমিক	১৩৯ (২৭.৮০%)	১১৭ (২৩.৪০%)	১৩৯ (২৭.৮০%)	১৫০ (৩০.০০%)
উচ্চপ্রাথমিক	৭৯ (১৫.৮০%)	১০১ (২০.২০%)	১১৩ (২২.৬০%)	১০৩ (২০.৬০%)
মাধ্যমিক	১১৪ (২২.৮০%)	১২৭ (২৫.৪০ %)	৯৭ (১৯.৪০%)	১১৯ (২৩.৮০%)
উচ্চমাধ্যমিক	৩৪ (৬.৮০%)	২৭ (৫.৪০%)	১৭ (৩.৪০%)	৫৬ (১১.২০%)
গ্রাজুয়েশন	১৬ (৩.২০%)	০৭ (১.৪০%)	০৯ (১.৮০%)	১০ (২.০০%)
পোস্ট গ্রাজুয়েশন	০৯ (১.৮০%)	০৬ (১.২০%)	০৬ (১.২০%)	০৮ (১.৬০%)
প্রযুক্তিবিদ্যা	০৪ (০.৮০%)	০১ (০.২০%)	০১ (০.২০%)	০৭ (১.৪০%)
শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা	২০ (৪.০০%)	২১ (৪.২০%)	২১ (৪.২০%)	১০(২.০০%)
মোট	**৫০০ (১০০%)**	**৫০০ (১০০%)**	**৫০০ (১০০%)**	**৫০০(১০০%)**

উৎস: ক্ষেত্র সামীক্ষা থেকে সংগৃহীত (১০ ডিসেম্বর ২০২১-২৫ মে ২০২২)।

কালিয়াচক ১, রতুয়া ১, মানিকচক, ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা) থেকে মোট ২০০০ নমুনা সংগ্রহ করি। শুধুমাত্র মুসলিম মেয়েদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্লকের নমুনাগুলোকে অশিক্ষিত, প্রাথমিকের নিচে, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্রাজুয়েশন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রকৃতি বিভাগে ভাগ করে আলোচনা করাহয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে কালিয়াচক ১ ব্লকের নমুনাগুলোর মধ্যে ১৫.৪০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষাও সম্পন্ন করেনি, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে ২৭.৭৮%, উচ্চ প্রাথমিক ১৫.৮০ শতাংশ

এবং মাধ্যমিক ২২.৮০ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক ৬.৮০ শতাংশ, গ্রাজুয়েশন ও পোস্ট গ্রাজুয়েশনে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩.২০ শতাংশও ১.৮০ শতাংশ। প্রযুক্তি বিদ্যাগত দিক থেকেও মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ কম দেখা যায় মাত্র ০.৪০ শতাংশ। কালিয়াচক ১ ব্লকে ধর্মীয় শিক্ষার অত্যাধিক প্রচলন রয়েছে। শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা জানে ৪.০০ শতাংশ মুসলিমনারী। রতুয়া ১ ব্লকের ক্ষেত্রে যে চিত্র দেখতে পায় তা হল প্রাথমিকে নিচে প্রায় ১৪.৩০ শতাংশ, প্রাথমিক ২৩.৪০ শতাংশ, উচ্চ প্রাথমিক ২০.২০ শতাংশ, মাধ্যমিক ২৫.৪০ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক ৫.৪০ শতাংশ, গ্রাজুয়েশন ১.৪০%, পোষ্ট গ্রেজুয়েশন ১.২০% এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা জানে যথাক্রমে ০.২০ শতাংশ ও ৪.২০ শতাংশ। মানিকচক ব্লকে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখা যায়। সারণীতে দেখা যাচ্ছে মানিকচক ব্লকে প্রাথমিক শিক্ষার নিচে ১৬.০০%, প্রাথমিক ২৭.৮০ শতাংশ, উচ্চ প্রাথমিক ২২.৬০ শতাংশ, মাধ্যমিক ১৯.৪০ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৩.৪০ শতাংশ মুসলিম মহিলা দেখা যায়। গ্র্যাজুয়েশন ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশনে ছাত্রী সংখ্যা কমতে থাকেযথাক্রমে ১.৪০ শতাংশ ও ১.২০ শতাংশ, প্রযুক্তিবিদ্যায় ০.২০ শতাংশ এবং ধর্মীয় শিক্ষায় ৪.২০% ছাত্রী দেখা যায়। ইংরেজবাজার পৌর এলাকাতেও মোটামুটি একই চিত্র দেখা যায়। প্রাথমিকের নিচে ৬.০০%, প্রাথমিকে ৩০.০০%, উচ্চ প্রাথমিক ২০.৬০ শতাংশ, মাধ্যমিক ২৩.৮০ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিকে ১১.০০%, গ্রাজুয়েশন ২.০০%, পোষ্ট গ্রাজুয়েশন ১.৬০ শতাংশ, প্রযুক্তিবিদ্যায় ১.৬০ শতাংশ ও শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছে ২.০০ শতাংশ মুসলিম মহিলা। ৪টি ব্লকেই অশিক্ষিতের হার যথাক্রমে ১.৮০ শতাংশ, ২.৪০ শতাংশ, ৩.৪০ শতাংশ ও ১.৪০ শতাংশ।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে বলা যায় চারটি ব্লকই প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক পর্যন্ত মুসলিম মেয়ের শিক্ষার হার বেশি, কলেজ স্তর ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশনে খুব কম সংখ্যক মুসলিম মেয়েদের দেখা যায়। গ্র্যাজুয়েশন ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশনে কালিয়াচক ১ ও ইংরেজ বাজারে প্রায় সমপরিমাণ ছাত্রীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রতুয়া ১ ও মানিকচকের প্রত্যন্ত

গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শুধুমাত্র স্কুল স্তরেইঅধিক্য দেখা যায়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি কম, এর কারণ সমীক্ষায় উঠে এসেছে বাল্যবিবাহের প্রবণতা ও শিক্ষার পরিকাঠামোগত অভাব, এছাড়া পারিবারিক দুরাবস্থা, পর্দাপ্রথা, দূরবর্তী স্কুল কলেজ প্রভৃতিও স্কুলছুটের অন্যতম কারণ।

অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কারণে মুসলিম পরিবারের পিতা-মাতারা সন্তানদের বিশেষ করে কন্যা সন্তানের লেখাপড়ার খরচ বহন করতে পারে না। এর সাথে যুক্ত হয় সামাজিক সংস্কৃতিক প্রথা গুলি যা নারী শিক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কালিয়াচক ১ এলাকায় অশিক্ষার মূল কারণ হলো স্বল্প আয়, গ্রামীণ দারিদ্রতা এবং জীবন যাপনের ও উপার্জনের অন্য পথ, যেমনবিড়ি শ্রমিক হিসেবে বহু মানুষ বিশেষ করে শিশু শ্রমিকদের দেখতে পাওয়া যায়। অশিক্ষিত অভিভাবকরা স্কুলে যাওয়াকে সময় নষ্ট হিসেবে মনে করে। কন্যা শিশুদের ক্ষেত্রে তা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। তাদেরকে বিবাহের পূর্বেই পারিবারিক কাজ শেখানোকেই আসল শিক্ষা বলে মনে করাহয়।

তা সত্বেও বিগত কয়েক দশক ধরে মালদা জেলার নারী শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষাগত ব্যবধান অনেকটাই দূর হয়েছে। তবে সমীক্ষা ক্ষেত্রগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় স্কুলছুটের হার মুসলিম ছেলেদের তুলনায় কন্যাদেরই বেশি,সেই কারণেই মুসলিম নারী শিক্ষার হার অনেক কম।এই পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে বলা যায় দারিদ্রতা, ধর্মান্ধতা ও তৎসহ বাল্যবিবাহ দায়ী। এই সকল প্রতিবন্ধকতা গুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে বহু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তার সাথে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানের উন্নয়নের জন্য বহু স্কলারশিপেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাইনোরিটি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতির জন্য মাইনোরিটি স্কলারশিপ, মৌলানা আজাদ স্কলারশিপ ও কন্যাশ্রী প্রকল্প, সবুজ সাথী প্রকল্পের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পঃ

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক মর্যাদার অন্যতম প্রতীক হল শিক্ষা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয়ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত বহু প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আধিক্যথাকায় সরকারের তরফ থেকে বহু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প গুলি বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে, যার দ্বারা মালদা জেলার মুসলিম মেয়েরা উপকৃত হচ্ছে ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। এরকম কিছু প্রকল্প নিম্নে আলোচিত হল।

মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন (M E F):

মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬০ সালে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষাগত ভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতি বিশেষ করে সমাজের দুর্বল সম্প্রদায়ের বালিকাদের জন্য আবাসিক স্কুলের ব্যবস্থা করা। এর পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আধুনিক ও উচ্চমানের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই প্রকল্পের দ্বারা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মালদা জেলার পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য স্কুল ও মাদ্রাসা সংলগ্ন আবাসিক ভবনের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তাদের মধ্যে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা যায়।

সর্বশিক্ষা অভিযানঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিশুদের সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় যা সর্বশিক্ষা মিশন নামে পরিচিত। এর দ্বারা মালদার গ্রামাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মেয়েরা শিক্ষার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। এই শিক্ষা মিশনের দায়িত্ব হল রাজ্যের সর্বত্র অবৈতনিক ও আবশ্যিক

শিক্ষার অধিকার প্রদান (RTE/ রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট ২০০৯) এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ২০০৯ (RMSA) মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন এর জন্য চালু হয়।

বিগত কুড়ি বছর ধরে সর্বশিক্ষা অভিযান ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে অশিক্ষা দূর করছে, তারফলেকেন্দ্র ও রাজ্যে শিক্ষার হার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার প্রমাণ আমরা জনগণনা রিপোর্ট পেয়ে থাকি। সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে বিদ্যালয়ে স্থাপনের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে যা এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তবে বর্তমান রাজ্য ওকেন্দ্র সরকারকে বিদ্যালয় ও পঠন-পাঠনের পরিকাঠামোর উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানের আরেকটি শাখা হিসেবে ভারত সরকার ২০১০ সালে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর এডুকেশন অফ গার্লস অ্যাট এলিমেন্টারি লেভেল (National Programme for Education of Girls at Elementary Level বা NPEGEL) চালু করে। এটি মূলত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও শিক্ষার পথের বাধা গুলি দূরীকরণের জন্য সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সচেষ্ট হয়ে থাকে। এই প্রকল্পটি শিক্ষাগত ভাবে পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য, যেখানে গ্রাম্য মহিলাদের শিক্ষার হার জাতীয় গড়ের থেকে অনেক কম এবং শিক্ষাগত লিঙ্গ ব্যবধান জাতীয়গড়ের থেকে অনেক বেশি, সেই সব এলাকা গুলিতেই এই প্রকল্প নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য চালু করা হয়, যা মালদা জেলার অনুন্নত ব্লকগুলিতে নারীশিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে চলেছে।

কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় প্রকল্পঃ

২০০৮ সালের ভারত সরকার তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতিও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় (OBC) সংখ্যালঘু ও দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত মেয়েদের শিক্ষার উন্নতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য কস্তুরবাগান্ধি বালিকা বিদ্যালয় প্রকল্প চালু করে। এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার মুসলিম মেয়েরা খুব উপকৃত হয় এবং তাদের শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়।

তবে মুসলিম মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তলার জন্য মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

মিড ডে মিল প্রকল্পঃ

১৯৯৫ সালের ১৫ আগস্ট মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও আর্থিক সাহায্যে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ নিউট্রিশনাল সাপোর্ট টু প্রাইমারি এডুকেশন (NP-NSPE) চালু হয়। এটি প্রাথমিকভাবে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের নাম নথিভুক্তকরণ বৃদ্ধি, হাজিরা বৃদ্ধি ও তার সাথে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে চালু করা হয়। পরে এর পরিসর বৃদ্ধি পায় ২০০৭ সালে এটি প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চ প্রাথমিক অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চালু করা হয় এবং এর সাথে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ মিড ডে মিল করা হয়। এর দ্বারা স্কুল গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা এবং হাজিরার পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৮ সালে এই প্রকল্পটির পুনরাবৃত্তি করে সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মক্তবগুলিতে মিড ডে মিল চালু করা হয়। মিডডে মিল প্রকল্পটি মালদা জেলায় শিক্ষাবিস্তারে বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে। কারণ এখানে স্কুল শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও প্রচলিত রয়েছে এবং মাদ্রাসাগুলির বেশিরভাগ গ্রাম্য এলাকায় অবস্থিত ও পিছিয়ে পড়া দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। যেহেতু এই প্রকল্পটি একবেলা আহারের ব্যবস্থা করে তাই গ্রাম্য এলাকা ও শহরের বস্তি এলাকার দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত ছেলেমেয়েরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। এর সাথে ছাত্রছাত্রীদের হাজিরাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাদ্রাসার মক্তবগুলোতে নাম নথিভুক্তকরণ এর পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন ও মাইনরিটি বিভাগ এবং ফিনান্স কর্পোরেশনঃ

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে সংখ্যালঘু কমিশন গঠিত হয়। সাংবিধানিক ও বিভিন্ন রাজ্য এবং ইউনিয়ন

গুলির দ্বারা প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা গুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কতটা স্বার্থরক্ষা করছে তা খতিয়ে দেখার জন্য কমিশন সংখ্যালঘুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা পর্যালোচনা করার প্রস্তাব দেয়। সেইমত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট সংখ্যালঘুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার সমীক্ষা করে ও তাদের স্বাস্থ্য, আয়, নারী-পুরুষের ঘনত্ব, অনুপাত, চাকরিতে ভূমিকা প্রভৃতির এক চিত্র প্রকাশ করে, যার দ্বারা মালদা জেলার মুসলিম সমাজের বাস্তব চিত্র উদ্ভাবন করতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গ অ্যাক্ট xviii ১৯৯৫ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সংখ্যালঘু বিভাগ ও ফিনান্স কর্পোরেশন ১৯৯৬ সালে গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শিল্প, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের দ্বারা সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো। WBMDFC, ওয়াকফ বোর্ড ও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং উর্দু একাডেমীর সাথে মিলিতভাবে তার উদ্দেশ্য গুলি বাস্তবায়িত করে ও পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করে। এটি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ, ভোকেশনাল ট্রেনিং, ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং ও সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। মাইনরিটি স্কলারশিপ দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের লেখা পড়া চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

প্রি ম্যাট্রিক ও পোস্টমেট্রিক স্কলারশিপঃ

পশ্চিমবঙ্গের সরকার পোষিত স্কুল ও মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই স্কলারশিপ ব্যবস্থা করে থাকে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তির পরিমাণ ১০০০ টাকা এবং ষষ্ঠ থেকে দশম পর্যন্ত ১২৪০ টাকা প্রিম্যাট্রিক স্কলারশিপ পেয়ে থাকে। যার ফলে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা ভীষণভাবে উপকৃত হয়। সেই রকমই দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রচলিত। একাদশ শ্রেণি থেকে পিএইচডি পাঠরত ৫০ শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা এই স্কলারশিপ

পেয়ে থাকে। এই বৃত্তির পরিমাণ শ্রেণী অনুযায়ী ২৭০০ থেকে ১০৮০০ টাকা হয়ে থাকে। এর দ্বারা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে।

হাজী মোহাম্মদ মহসিন ইনডউমেন্ট ফান্ড স্কলারশিপঃ

এটি মেধার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এককালীন ২০০০০ টাকার এই বৃত্তি পেয়ে থাকে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে দশম শ্রেণী পাস ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্ত ৭০ জনও মাদ্রাসা বোর্ড থেকে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ সর্বোচ্চ ২০জন ও আলিম উত্তীর্ণ সর্বোচ্চ ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই বৃত্তি পেয়ে থাকে।এর দ্বারা সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

কন্যাশ্রী প্রাকল্পঃ

নারী শিক্ষার উন্নতিতে কন্যাশ্রী প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনূর্ধ্ব ১৯ বছর অবিবাহিত ছাত্রীরা এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারে। এছাড়াও অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীরা বার্ষিক ৫০০ টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকেন এবং ১৮ বছরের উর্ধ্বে ও ১৯ অনূর্ধ্ব ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকে।এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক রয়েছে এর দ্বারা একদিকে যেমন দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত ছাত্রীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, তেমনি বাল্যবিবাহের প্রবণতাও কমছে এবং মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। মালদা জেলার মুসলিম পরিবারের ছাত্রীরা এর দ্বারা ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছে। তবে গ্রামেগঞ্জে বাল্যবিবাহের প্রবণতা থাকায় বহু ছাত্রী এর সুযোগ সুবিধায় লাভ করতে পারে না, আবার অনেক সময় এর অপপ্রয়োগও হতে দেখা যায়।

মাদ্রাসার ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদানঃ

প্রাথমিকভাবে সুন্দরবন এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলিম ছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য ও তাদের মাদ্রাসার সাথে যোগাযোগের সুবিধার্থে সাইকেল প্রদানের ব্যবস্থা করে, যা মুসলিম

ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করে। পরবর্তীতে এটি পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত সমস্ত মুসলিম ছাত্রী এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে থাকে। এর দ্বারা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়মুখী হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে তাদের মধ্যে সচেতনতা বোধ তৈরি হচ্ছে এবং তারা নিজের ভবিষ্যৎকে আরো উজ্জ্বল করার এবং গড়ে তোলার সুযোগও পাচ্ছে। মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে দূরবর্তী স্থানে স্কুল অবস্থিত হওয়ায় বহু ছাত্রী বিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় যাওয়ার সুযোগ পেত না। তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণের ব্যবস্থা করে যা নারী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. www.newworldencyclopedia.org,retrived on 22.9.2022.

২. Roy Shibani, *Status of Muslim Women in North India: A Study in Dynamics of Change*, New Delhi, B.R. Publishing Corporation, 1979, p.45.

৩. GOI, Justice Sachar (Chairperson), *High Level Committee Report on Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India*, Delhi, Akalank Publications, 2010, p.54.

৪. Census of India 2001.

৫. Sharma R. N., *History of Education in India*, New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 2003, pp.7-8.

৬. তদেব, পৃ. ১৮।

৭. Agarwal S P and Agarwal J C, *Women Education in India*, New Delhi, Concept Publishing Co.,1994, p.20.

৮. তদেব, পৃ.২০-২১।

৯. Jayapalan N, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯।

১০. তদেব, পৃ.১৫৯।

১১. ChowdhuryProbal Roy, *Community Profile of Madras Presidency in the Nineteenth and Early Twentieth Century: Part I:1825-85*, Indian Historical Review, Sage Publication,45(2), 2018, pp.189-212.

১২. Pal Dharm, *The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century*, Vol.III, Goa, India, Other India Press, 2000. pp.46-56.

১৩. Rokaiya Begum, *Education and Muslim Women in Rural West Bengal*, in Siddiqui M.K.A(ed.), *Muslims in Free India their Profile and Problems*, New Delhi, Institution of Objective Studies, 1998. P.65.

১৪. *Woods Dispatch Report.*

১৫. Bakhtwar Batool Sh. Mohammad, *The Right to Education& Status of Muslim Women: A Social Legal Study*, Veer Narmad South Gujrat University, Surat, Unpublished Thesis, 2019, p.114.

১৬. Rawat Hemant, *Women and Education*, New Delhi, Sports Publication, 2011, p.25.

১৭. Ishaque H.S.M., *Rural Bengal: Her Needs and Requirements*, Sirajganj, GauriprasannaBiswasPublications, 1938, p.71.

১৮. Bakhtwar Batool Sh. Mohammad, *প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯।*

১৯. *তদেব, পৃ.১২০-১২১।*

২০. www.sndt.digitaluniversity.ac.in,Retrived on 15.07.2022.

২১. GOI, *The Report of the University Commission*, Delhi, Manager of Publications civil lines, 1963, p.342-352.

২২. GOI, *Report of the Secondary Education Commission (1952-1953)*, p.192-207.

২৩. GOI, Ministry of Education, *Report of the National Committee on Women's Education*, New Delhi, Manager of Publication, 1959, pp.192-226.

২৪. Swarnika Pallavi, *Women Education in the Post Independence Era*, Univers International Journal of Interdisciplinary Research, ISSN (0)-2582-6417, Vol.1, issue 5, Oct.2020, pp.74-79.

২৫. https://www.millioncontent.com, retrived on 19.07.2022

২৬. GOI, *Report of the Committee to Look into the Cause for Lack of Public Support Parti1cularly in Rural Areas for Girls Education and to Enlist Public Cooperation*, New Delhi, Ministry of Education, Publication No. 736, 1965, pp.39-47.

২৭. NPE-1986, https://www.education.gov.in, retrived on 18.07.2022, pp.28-45.

২৮. https://www.org/en/globalissues/women,retrived on 16.07.2022.

২৯. GOI, *National Policy on Education 1986*, New Delhi, Ministry of Human Resource Development, New Delhi, Dept of Education, May 1986, p.6.

৩০. Rawat Hemant, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭-২৮।

৩১. AL-Quran, 96:1-5.

৩২. AlamDr. Jafar, *Islamic Education, Theory and Practice*, New Delhi, Publisher and Distributer, 1991, pp.25-25, 30.

৩৩. Mishkat, Mazhar- e Haq, *Kitab-ul-Ilm*, Vol.1, H.No.20, pp.274-275.

৩৪. Mishkat, Mazhar-e Haq, *Kitab-ul-Ilm*, Vol.1, H.No.19, p.274.

৩৫. Ali Syed Anwar, *The Spirit of Islam: A History of Evolution and Ideals of Islam*, Delhi, B. I. Publications, 1978, p.11.

৩৬. www.science.jrank.org, retrived on 23.09.2022.

৩৭. Alam Dr. Jafar, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩।

৩৮. Ali Syed Anwar, প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

৩৯. Sunan Ibn Majah, *Kitab-ul-Adab*, Vol.3, H.No.3670, p.258.

৪০. NasseefDr. Abdullah-o, *Encyclopedia of Seerah*, London, Seerah Foundation, Vol. III, 1983, p.290.

৪১. তদেব, পৃ.২৯০।

৪২. Al-Hakim al Nisaburi Muhammad, *al Mustadrak*, USA, Seller Inventory, Vol.4, 1917, p.334.

৪৩. Yadav Neelam, *Education for Women*, New Delhi, Reference Press, 2003, p.72.

৪৪. তদেব, পৃ.৭৯।

৪৫. Khurshid Fouzia, *Education and The Changing Status of Muslim Women: A Case Study of Srinagar District (Jammu and Kashmir)*, Unpublished Thesis in Aligarh Muslim University, 2013, p.165.

৪৬. Chaturvedi Archana(ed), *Encyclopedia of Muslim Women: Muslim Women and Society*, New Delhi, Commonwealth Publishers, 2003, p.8.

৪৭. Khurshid Fouzia, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮।

৪৮. Sharif Abusaleh, *India: Human Development Report: A Profile of Indian States in 1990s*, New Delhi, Oxford University Press, 1999, p.47.

৪৯. GOI, Justice Sachar, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২।

৫০. GOI, Justice Sachar, তদেব, পৃ.৫৮।

৫১. GOI, Justice Sachar, তদেব, পৃ.৬০।

৫২. GOI, Justice Sachar, তদেব, পৃ.৬২।

৫৩. GOI, Justice Sachar, তদেব, পৃ.৭৭।

৫৪. GOI, Justice Sachar, তদেব, পৃ.৮৫।

৫৫. GOI, Justice Sachar, তদেব, পৃ.২৪৩-২৪৪।

৫৬. GOI, Ministry of Minority Affairs, *Report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities,* New Delhi, Alknanda Advertising Pvt. Ltd., 2007, pp.16-17.

৫৭. তদেব, পৃ.৪৭।

৫৮. তদেব, পৃ.৪৭-৪৮।

৫৯. Sharma Usha and Sharma B N (ed), *Women Education in Modern India,* New Delhi, Commonwealth Publishers, 1995, p.73.

৬০. তদেব, পৃ.৭৪।

৬১. Ahmed Sufia, *Muslim Community in Bengal 1884-1922,* Dacca, Oxford University Press, 1974, p.399, Appendix D.

৬২. ওদুদ কাজী আব্দুল, *বাংলার জাগরণ,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৬, পৃ.২২।

-----হোসেন আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী,* কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৬, পৃ.৬৭।

৬৩. Ali Syed Ameer, *Muhammedan Education and Muhammedan Society, Presidential Address Delivered at the Muhammeda Educational Conference of 1899,* Calcutta, 1900.

৬৪. *ইসলাম প্রচারক,* অগ্রহায়ন- পৌষ ১৩১০,পৃ.৪১৮।

৬৫. *মিহির ও সুধাকর,* ১৪ আশ্বিন, ১৩১১।

৬৬. খাতুন নুরুন্নেসা, *নারী জাতির শিক্ষা,* সওগাত, জৈষ্ঠ্য ১৩২৬, পৃ.৫২১-৫২২।

৬৭. আহমেদ তাহেরুদ্দিন, *স্ত্রী শিক্ষা,* সওগাত, কার্ত্তিক ১৩৩৪, পৃ.৪৫১-৪৫৩।

৬৮. খাতুন কাশেমা, *নারীর কথা,* সওগাত, আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ.৪৮।

৬৯. রসিদ আব্দুল, *আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ৎ,* শিক্ষা, চৈত্র ১৩৩৩, পৃ৯৩।

৭০. হোসেন কাজী মোতাহের, *বাঙালী মুসলমানের দৈন্য,* সওগাত, মাঘ ১৩৩৭, পৃ.২০১।

৭১. ঘোষবিনয়, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১০৮৪, পৃ.২১৩।

৭২. রায় বিনয়ভূষণ, *অন্তঃপুরের স্ত্রী শিক্ষা,* কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৮, পৃ.১৩-১৪।

৭৩. ঘোষ বিনয়, প্রাগুক্ত,পৃ.২১৩।

৭৪. রায় বিনয়ভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩।

৭৫. বাগল যোগেশচন্দ্র, *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬,* কলকাতা, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ১৩৫৭, পৃ.৫।

---হোসেন আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩।

৭৬. রায় বিনয়ভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩-২৮।

৭৭. আলি খান ইউসুফজাই নৌসের, *বঙ্গীয় মুসলমান,* কলকাতা, হিন্দুপ্রেস, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪৩-৪৪।

৭৮. রায় বিনয়ভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩।

৭৯. উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় মেয়েদের গৃহের মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন দেখা যেত। পর্দার মধ্যে থেকে শিক্ষার প্রচলন করার জন্য জেনানা স্কুল স্থাপিত হয় এই সময়।

৮০. *বামাবোধিনী পত্রিকা,* ফাল্গুন ১২৮৬।

৮১. ঘোষ বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০,* ৫ম খণ্ড, কলকাতা, পাঠভবন, ১৯৬৮, পৃ.২১৯।

৮২. Report of the Committee Appointed by Bengal Governmant, *To Consider Questions Connected with Muhammadan Education,* Calcutta, Bengal Secratariat Book Depot, 1915, pp.14-15.

---হোসেন আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬।

৮৩. Keay F E, *A History of Education in India and Pakistan*, Calcutta, Oxford University Press, 1879, p.105.

৮৪. Ahmed Sufia, *Muslim Community in Bengal (1884-1912),* Dhacca, Oxford University Press, 1974, Chapter I, pp.26-47.

৮৫. আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা,* দ্বিতীয়খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ.৯৬।

৮৬. রফিকউল্লাহ, *হাদীস শরীফ,* কলকাতা, হরফ, ১৯৯৭, পৃ.৫।

৮৭. Md. Ali Azam, *Life of Maulavi Abdul Karim*, Calcutta, Author Publishers, 1939, p.70.

৮৮. রহমান হাবিব, *বাঙালি মুসলমান ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন,* কলকাতা, মিত্রম, ২০০৯, পৃ.৪৫-৪৬।

৮৯. আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা,* ১ম পুনঃমুদ্রন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০২, পৃ.১৮।

৯০. সিদ্দিকী এম কে এ, *সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাসমস্যা,* কলকাতা, মল্লিকব্রাদার্স, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ.৬৬।

৯১. হাসান মইনুল, *মুসলিম সমাজ এবং এই সময়,* প্রথমখণ্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২, পৃ.৫৫।

৯২. জোয়ারদার মানস, *শিক্ষা ও সমাজ গতি এবং দুর্গতি,* কলকাতা, বিসংবাদ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ.৩৬।

৯৩. https://www.wbbme.org, Retrived on 15.02.2023.

৯৪. GOWB, Directorate of Madrasah Education, WB, *Annual Report for 2011-2012,* Minority Affairs and Madrasah Education Department, WB, Kolkata, Bikash Bhavan, 2012, p.5.

৯৫. *Report of the Madrasah Education Committee*, West Bengal, 2002, p.32.

৯৬. সোম সুস্মিতা, *মালদহঃ ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি,*কলকাতা, সোপান, ২০১৬, পৃ.১২৫-১২৬।

৯৭. ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারাঃ প্রাক বৈদিক যুগ হতে স্বাধীনতার কাল অবধি,* কলকাতা, অক্ষরপ্রকাশনী, ২০২০, পৃ.২২৭-২২৮।

৯৮. তদেব, পৃ. ২৩০-২৩১।

৯৯. সোম সুস্মিতা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬।

১০০. ঘোষ তুষারকান্তি, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪১।

১০১. Majumdar R C, *History of Ancient Bengal*, Calcutta, G. Bharadwaj & Co., 1971, p.180.

১০২. ঘোষ তুষারকান্তি, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪-২৫৫।

১০৩. ঘোষ তুষারকান্তি, তদেব, পৃ.২৭৩।

১০৪. Mitra A(ed), *District Census Hand Book, Malda*, PCLXXXII, West Bengal, 1951.

--Sengupta J C, *West Bengal District Gazetter, Malda*, Calcutta, Esa. B.A., 1969, p.203.

১০৫. Mitra A, তদেব, পৃ.১৪৬-১৪৭।

১০৬. Sengupta J C, প্রাগুক্ত, পৃ.২২১।

১০৭. Sengupta J C, তদেব, পৃ. ২০৭।

১০৮. ঘোষ তুষারকান্তি, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৮-২৯৯।

১০৯. ঘোষ প্রদ্যোত, *বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)*, কলকাতা, ১৪১৩, পৃ.৫।

১১০. *মালদা টাউন হাইস্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক) ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব স্মরণিকা।*

১১১. Lambourne G E, *Bengal District Gazetter, Malda*, Esa. B. A., 1918, p.26.

১১২. স্যান্যাল রত্না রায়, *মালদা জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখাঃ আধুনিক যুগ (১৮১৩-১৯৪৭)*, ভট্টাচার্য মলয় শঙ্কর (সম্পাঃ), *মালদহ চর্চা*, কলকাতা, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ২০১১, পৃ. ১৯৯-২০৮।

১১৩. *স্মরণিকাঃ জালালিয়া গার্লস স্কুল প্ল্যাটিনাম জুবিলি, বিবি জয়নাবের স্মৃতিচারণ*, ১৯৯৪।

১১৪. *স্মরণিকাঃ আইহো গার্লস স্কুল সুবর্ণজয়ন্তী*, ১৯৮৩।

১১৫. আতাউল্লাহ এম., *মালদহের মুসলিম নারীসমাজঃ একটি পর্যালোচনা*, ভট্টাচার্য মলয়শঙ্কর (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮।

১১৬. আলি উমর, *মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাব্যবস্থাঃ একটি রূপরেখা (১৮৩৪-১৯৪৭),* বালা শচীন্দ্রনাথ ও গোস্বামী ঋতব্রত (সম্পাঃ), *মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২২, পৃ.৪৫০-৪৫৯।

১১৭. Hossain Najmul, *Muslim Non-Muslim Differentials in Education, Employment and Fertility in Malda District*, *West Bengal,* Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011, p.125.

১১৮. Hossain Najmul, তদেব, পৃ.৩৪৫-৩৪৬।

১১৯. Hossain Najmul, তদেব, পৃ.২১০।

তৃতীয় অধ্যায়

মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অবস্থান

তৃতীয় অধ্যায়

মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অবস্থান

যে কোনো রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের মতো নারীও সমান গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত এবং আশা করা হয় পুরুষদের মতো নারীরাও রাজনৈতিক কাজ কার্যক্রমে সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে। ইতিহাসের কাল প্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর কোনরূপ রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তবে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে রাজনীতিতে নারী পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণ জরুরি হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক রাজনৈতিক পরিকাঠামোয় নারী-পুরুষ সবাইকে সমান রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়নি। নারী প্রতিনিয়ত আন্দোলনের দ্বারা নিজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই নারী সমান অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়, এটি প্রতিভাত হয় যে আমেরিকা মহাদেশের নারীর রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে সুসান বি. অ্যান্টনির সংগ্রাম ও আন্দোলনের দ্বারা নারী তার রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেছে।[১] যা সমগ্র বিশ্বের মহিলা সংগঠনগুলিকে অধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি আরও বলেছেন সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও পেশায় নারীকে উচ্চ স্থান দিতে হবে ও সমস্ত প্রকার অসাম্য ও বিরোধিতা গুলি দূরীভূত করতে হবে,[২] তবেই নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আন্দোলন নারীর মধ্যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতা বোধ জাগিয়ে তুলেছে তাই নয়, নারীর মধ্যে আরও একটি বোধ জাগ্রত হয়েছে তা হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন ব্যতীত সামাজিক অসাম্য ও বাধা দূর হবে না।

১৯ শতকে শেষভাগ থেকেই বিভিন্ন দেশে নারী সংগঠনগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিতে শুরু করে ও নিজের দেশের সরকারকে দাবিদাওয়া পূরণের জন্য চাপ দিতে থাকে। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময় নারীর ভোটাধিকার কে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এশিয়া মহাদেশের বহির্ভূত দেশ গুলি	**নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতির বছর**
নিউজিল্যান্ড	১৮৯৩
অস্ট্রেলিয়া	১৮৯৯
ফিনল্যান্ড	১৯০৬
স্ক্যান্ডি নেভিয়া দেশ গুলি	১৯১৫
গ্রেট ব্রিটেন	১৯১৮
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৯২০
ফ্রান্স	১৯৪৪
এশিয়া মহাদেশের দেশগুলি	
মঙ্গোলিয়া	১৯২৪
ভারত	১৯২৯
শ্রীলংকা	১৯৩১
থাইল্যান্ড	১৯৩২
মায়ানমার	১৯৩৫
ফিলিপিন্স	১৯৩৭
জাপান	১৯৫৬
মুসলিম রাষ্ট্রগুলি	
তুর্কি	১৯৩৪
পাকিস্তান	১৯৪৭
মিশর	১৯৫৬
টিউনিসিয়া	১৯৫৬

ইসলামিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তুর্কিদেশ সর্বপ্রথম নারীর ভোটাধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সাথে সাথে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি দিয়েছে।[৩] তবে এখনও বহু ইসলামিক রাষ্ট্র নারীর ভোটাধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি অথবা আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতবর্ষের সমগ্র ১৯ শতক জুড়ে সমাজ সংস্কারকগণ স্ত্রীশিক্ষা, সামাজিক অধিকার, সম্পত্তির অধিকারকে কেন্দ্র করে সংস্কার আন্দোলন করেছে। কিন্তু নারী রাজনৈতিক অধিকার, উভয় লিঙ্গের মধ্যে সমতার অধিকার প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে কোন আন্দোলন দানা বাঁধেনি, এর কারণ হিসেবে বলা যাই ঐতিহ্যগত রক্ষণশীল মানসিকতা। বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলি গঠন হতে থাকে ও নারীর অধিকারের জন্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। তবে সক্রিয়ভাবে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ শুরু হয় ১৯৩০ এর দশকে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, তবে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের সংগঠনগুলিতে নারীর উপস্থিতি একেবারেই যে ছিল না, তা নয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে প্রথম নারী সভাপতি ছিলেন সরোজিনী নাইডু। তবে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল পেছনের শাড়িতে এবং শুধুমাত্র অভিজাত ও শিক্ষিত গৃহের নারীরা গৃহের চার দেয়ালের বাইরে এসে সামাজিক কাজকর্মে অংশ নিত, অবশ্য তাদের কর্ম পরিধি শুধুমাত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সীমিত ছিল। বৃহৎ রাজনৈতিক পরিসরে তাদের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য। এর পূর্বে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পর্বে স্বদেশী আন্দোলনের ধারায় সর্বস্তরের নারীর অংশগ্রহণ বৃহৎ মাত্রায় দেখা গেলও কোন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা নেত্রী হিসেবে নারীর ভূমিকা তেমন ছিল না।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে নারী খুব বেশি মাত্রায় না হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মূলধারা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের সূত্রপাত হয়। ১৯২০-৩০ দশকে নারী সংগঠনগুলির সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তারা নারীর বিভিন্ন সমস্যাবলী জনসমক্ষে তুলে ধরে আন্দোলন শুরু করে। তবে এই সময় সংগঠনগুলোতে সর্বস্তরের নারী অংশগ্রহণ ছিল না। ভারতের সংখ্যাধিক্য কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর নারীদের উপস্থিতি একেবারেই

ছিল নগন্য। এমনকি সংস্কারপন্থী পুরুষরা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে আবেদন নিবেদনের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। গান্ধীজীই সর্বপ্রথম নারীর অধিকারের জন্য আইন প্রণয়নের কথা বলেন এবং নারীরাও যে পুরুষের সমান স্বাধীনতা ও ক্ষমতার অধিকারী একথা তিনি সবার সামনে তুলে ধরেন।[৪] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য একেবারে দূর হয়নি, আবার সব শ্রেণীর উপস্থিতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখাও যায়নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বস্তরে নারীর উপস্থিতি দেখা গেলেও ভারতের সর্বাধিক কৃষক, শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত অশিক্ষিত গ্রামীণ সমাজের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপস্থিতি বা কোন নারী সংগঠনের সাথে সংযুক্তি একেবারেই ছিল না। উনিশ শতকের শেষ দিকে এই কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত নারীদের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং তারা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের অংশ হয়ে ওঠে। এরকম পরিস্থিতিতে গান্ধীজী প্রথম সর্বস্তরে নারীদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের যোগ দেবার আহ্বান জানান।[৫] তিনি ভারতের সর্বস্তরে নারীর মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের অনুভূতির সঞ্চারিত করেন। তিনি শহরের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর নারীদের সাথে গ্রামীণ সমাজের অশিক্ষিত, গরীব নারীদের একসঙ্গে আন্দোলনে শামিল করেন।

আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের উপস্থিতি আরো বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এই সময় গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন নারীর সংগঠনের মহিলারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে। তৎকালীন পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৩০ এর মার্চ মাসে গান্ধীজী ডান্ডি অভিযানের সময় বিভিন্ন জায়গার প্রায় ১০০০, ২০০০ কোথাও আবার ১০০০০ নারী বিভিন্ন সভা সমিতিতে অংশ নেয়।[৬] এই সভা গুলিতে গান্ধীজী নারীদের দেশাত্মবোধের উদ্বুদ্ধ করেন এবং পুরুষ সদস্যদের সাথে ডান্ডি অভিযানে পদযাত্রায় অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানান। স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদের তেমন উৎসাহ ছিল না এবং তারা বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের অধীনে এনে নারী শক্তিকে দেশের কাজে ব্যয় করতে আগ্রহী

ছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বোম্বে সহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নারী সংগঠনগুলিকে প্রত্যক্ষ এগিয়ে আসতে দেখা গেলেও এই সময় বাংলাতে এক ভিন্নরূপে নারীর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বাংলার নারীদের অংশগ্রহণ বেশি মাত্রাই দেখা যায়। অবশ্যই এর আগেও ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপে বাংলার নারীর অংশগ্রহণ দেখা গেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার চরিত্র ছিল বিপ্লবাত্মক। গান্ধীবাদী ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নারী আন্দোলন বা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ বাংলার রাজনীতিতে দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলায় যে সমস্ত নারী সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের অন্যতম কর্মসূচি ছিল নারীর অবস্থার উন্নতি, পুরুষদের সমান অধিকার আদায় প্রভৃতি। বাংলায় প্রথম থেকেই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯২৮) নারীরা নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা গুলি তুলে ধরেন। বাংলায় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন তারা নারী সংগঠনগুলিকে নিজেদের অভিভাবকত্বের অধীনে রেখে কাজে লাগিয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত বাংলায় নারীদের অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করার বা নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটনার বিষয়টি উহ্য থেকে গেছে। এই সময়কালের যে সমস্ত নারী রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছে তারা সকলেই ছিল সমাজের উচ্চশিক্ষিত, অভিজাত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমাজের অশিক্ষিত ছোট শহর বা গ্রামের নারীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ একেবারেই ছিল না। আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষরা তাদের গৃহের নারীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করেছে এবং তারাও বাড়ির পুরুষ সদস্যদের কথা মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ নিয়েছে। আবার যখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে তারা আবার গৃহকর্মে ফিরে এসেছে। যা আজও বর্তমান সমাজের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়। যাই হোক বিভিন্ন নারীর সংগঠন গুলি কংগ্রেসের অধীনে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেও কংগ্রেসের শীর্ষস্থানে নেতারা কখনোই নারী বিষয়ক সমস্যাগুলির উন্নতি, নারী ক্ষমতায়ন, নারী জাগরণ বিষয়ে মাথা ঘামায় নি। তার উদাহরণ হল ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক সরকার নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের অধিকার দেয়

নি। গান্ধীজিও কখনো নারীর সমস্যার সমাধান, আর্থসামাজিক উন্নতি বা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথা বলেননি। বরঞ্চ স্বাধীনতার প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে বলেছেন বারংবার। তা সত্ত্বেও এরূপ পরিস্থিতিতে প্রথমে বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ১৯২০-৩০ এর দশক ধরে বিভিন্ন টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিরবিচ্ছিন্ন বেড়াজাল ছিন্ন করে বিভিন্ন নারী সংগঠন গুলি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে পৃথক জায়গা করে নিয়েছে।

ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে যায় এবং সর্বস্তরের নারীর উপস্থিতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়। নারী সংগঠনগুলি আরও দৃঢ় ও সঙ্গবদ্ধ হয়। এই প্রথমবার জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা স্বীকার করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক বলে উল্লেখ করে।[৭] যেহেতু ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। তখন উত্তেজিত জনতা সদিচ্ছায় সমস্ত দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়ে সংগ্রাম চালাতে থাকে। এই প্রথম আন্দোলন গান্ধীবাদী ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। এই সময়ে বাংলার গান্ধী বুড়ি খ্যাত মাতঙ্গিনী হাজরা, বোম্বের উষা মেহতা, উত্তর ভারতের অরুনা আসফ আলি ও সুচেতা কৃপালিনীর মতো নারী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। এই প্রথম কংগ্রেস নারীর সমস্যাগুলি নিয়ে কৌতুহল প্রকাশ করে এবং নারীদের জন্য পৃথক দপ্তর স্থাপন করে। এই দপ্তর নারীর সমস্যা, নারীদের কাজের নির্দেশিকা, নারী সংগঠনগুলিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত বা নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা, নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ গড়ে তোলা প্রভৃতি কাজ করতে থাকে। এই সব কিছুর দ্বারা নারী সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের অধীনে এনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়।[৮]

একথা স্বীকার করতেই হয় যে অসহযোগ থেকে ভারতছাড়ো আন্দোলন বিভিন্ন সময় নারী আন্দোলন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেকটাই উন্নীত হয়েছে। রাজনীতিতে নারী-পুরুষের

বৈষম্যকে দূরে সরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষদের সমান নারীও অংশগ্রহণ করেছে। কখনো গান্ধীবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অহিংস পদ্ধতিতে আবার কখনো বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন নারীর সংগঠনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারীর রাজনীতিতে উপস্থিতি ক্রমশ কমতে থাকে এবং নারীর সংগঠনগুলির কার্যকলাপ আণুবীক্ষণিক হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নারীবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ১৯৭০ এর দশকে ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ে নারী আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তবে স্বাধীনতার আগে নারীর যে অবস্থান ছিল, পরে তার অবনতি ঘটতে থাকে। এর দায়িত্ব কার তা পর্যালোচনা করার জন্য বর্তমানে রাজনীতিতে নারীর অবস্থান আলোচনা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন নারীর সংগঠনগুলির ভূমিকা ও আলোচনার দাবি রাখে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী সংগঠনের ভূমিকা:

সমগ্র ঊনবিংশ শতক জুড়ে সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থার মানোন্নয়ন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, নারীর আর্থসামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজ সংস্কারের কাজ চলতে থাকে। ফলে ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে নারী গৃহের চার দেয়ালের গণ্ডি অতিক্রম করে সভা সমিতি গঠন, নারীর স্বাধীনতার দাবি করতে থাকে। এই সময় গড়ে ওঠা নারীর সংগঠনগুলির প্রথম দিকে লক্ষ্য ছিল স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক উন্নয়ন কারণ তারা বুঝেছিল নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য স্ত্রী শিক্ষার সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতার ও দরকার। তাই নারী সংগঠনগুলি নিজেদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ১৯২০-৩০ দশকে নারী সংগঠন গুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, ভোটাধিকার, স্ত্রীশিক্ষা, জীবনের মান উন্নত করা প্রভৃতি। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে এই সমস্ত উদ্দেশ্য গুলি পূরণ করার জন্য নারী সংগঠনগুলি কখনো নরমপন্থী কখনো চরমপন্থী আবার কখনো গান্ধীবাদীর ধারায় সাথে যুক্ত হয়ে জাতীয়বাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এরপর

থেকেই ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের জনগণ নারী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বিভিন্ন সমিতিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে নারী সংগঠনগুলি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ নারী সংগঠন গুলি হল ইন্ডিয়ান উইমেন্স কনফারেন্স (১৯০৪), ভারত স্ত্রী মহামন্ডল (১৯১০), উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স প্রভৃতি।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ইন্ডিয়ান উইমেন্স কনফারেন্স রামাবাই রানাডের নেতৃত্বে বোম্বেতে জনসভার আয়োজন করে। এখানে নারী বিষয়ক সমস্যাবলি ও তার সমাধানের উপায় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও নারী শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বিধবাদের সমস্যা, পণপ্রথা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এই সময় আরো অনেক নারী সংগঠন গড়ে ওঠে তার মধ্যে দ্য মুসলিম উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন উল্লেখযোগ্য।

১৯১০ সালে সরলা দেবী চৌধুরানী উদ্যোগে গড়ে ওঠা ভারত স্ত্রী মহামন্ডল নারীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি, রাজনৈতিক অধিকার, পারিবারিক সমস্যার সমাধানসহ দশটি মৌলিক অধিকার দাবি করে। এই সংগঠনের সদস্যগণ অভিজাত পরিবারের সদস্য হওয়ায় এর কর্মসূচি অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়াও যে সমস্ত সংগঠনগুলিকে কেন্দ্র করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্র আবর্তিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল মার্গারেট কজিন্স, অ্যানি বেসান্ত এর উদ্যোগে গড়ে ওঠা উইমেন্স ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (১৯১৭)। প্রাথমিকভাবে এই সংগঠনটি বিভিন্ন সামাজিক প্রথা যেমন পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহের বিরোধিতা, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, নারীর সম্পত্তিতে অধিকার প্রভৃতির ওপর জোর দেয়। কিন্তু কালক্রমে এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। উপনিবেশিক ভারতে নারীর ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাগণ তৎকালীন স্টেট সেক্রেটারি ই এস মন্টেগুর কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। সরোজিনী নাইডু সহ আরো ১৪ জন মহিলা দ্বারা লিখিত স্মারকলিপিটি উইমেন্স ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা মার্গারেট কজিন্স এর নেতৃত্বে জমা দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপিতে নারীর ভোটাধিকারের দাবিসহ স্ত্রীশিক্ষা, হস্তশিল্প, স্বায়ত্তশাসন, সামাজিক উন্নয়ন প্রকৃতির বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়।

স্মারকলিপিতে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার দাবি করতে থাকে।[৯] উইমেন্স ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের দাবিগুলি সেই সময়ের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং গান্ধীজী নারীর সম অধিকারের দাবিতে সরব হন।[১০]

১৯২৭ এর গড়ে ওঠা অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স ছিল সেই সময়ের অন্যতম মহিলা সংগঠন। এর প্রথম অধিবেশনে পুরুষদের সমান ও সম্পূরক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়, যাতে তারা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে।[১১] এছাড়াও সামাজিক সমস্যাবলী পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো বিষয়গুলি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৩০ এ এই সংগঠনটির কর্ম পরিধি আরো বিস্তৃত হয় এবং এটি নারীর রাজনৈতিক অধিকারের জন্য লড়াই শুরু করে। মহিলাদের সমস্যাবলী সমাধান ও দেশ সেবাকে কেন্দ্র করে সংগঠনের কার্যাবলী আবর্তিত হতে থাকে। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব কারীগণ রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার নয় নারীর সমস্ত রকম স্বাধীনতা তাদের কাম্য ছিল। সংগঠনটি নারী স্বাধীনতা নারীর আইনের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করলেও এটি কখনোই পুরুষ প্রাধান্যের উপরে উঠে বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সাথে কোন প্রকার বিরোধিতাই যায়নি বরং নারীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধান করার মধ্যে নিজেদের কর্ম পরিধি সীমাবদ্ধ রাখে।

শুধুমাত্র নারীর সংগঠনই নয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলিও নারীদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল অ্যানি বেসান্তের উদ্যোগে গঠিত হোমরুল লীগ। এটি নারীদের জন্য বিশেষ শাখা স্থাপন করে। জাতীয় মুক্তি সংঘ আরো একটি রাজনৈতিক দল, যেখানে বহু নারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত নারী সংগঠনগুলি ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং এই সংগঠনগুলিতে মুসলিমসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীরা অংশ নিত। ১৯১৭-১৯২৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে অ্যানি বেসান্ত ও সরোজিনী নাইডু দুই নারী সদস্য সভাপতিত্ব করেন। এর থেকে বোঝা

যায় জাতীয় কংগ্রেস নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিরোধী ছিল না, কিন্তু গান্ধীজীর আগমনের পর রাজনীতিতে নারীর প্রবেশের পথ সুগম হয়।

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যে সময় নারীর সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছে, বাংলাতেও সেই সময় কয়েকটি নারী সংগঠন নারী মুক্তি, নারী শিক্ষা, নারীর সামাজিক সমস্যা গুলি নিয়ে কথা বলা শুরু করে। বাংলায় প্রথম সংগঠন যারা নারীদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে তারা হল বামাবোধিনী সভা। এই সভার প্রকাশিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় সর্বপ্রথম নারীদের নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। এছাড়াও ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত আশ্রয়', 'আর্য নারী সমাজ' প্রভৃতি। নারীশিক্ষা, নারীর অধিকার গুলির স্বীকৃতি, অসহায় নারীদের সহায়তা প্রদান ও নারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে নারী কল্যাণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। যদিও পরবর্তীকালে সকল নারী সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতের মুক্তি, তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ শুরু হয় এবং গান্ধীজীর আহ্বানে ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে নারীর আগমন সূচিত হয়। ১৯৩০ দশকের সমগ্র বাংলায় যে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়, সেখানে ছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর অংশগ্রহণ ছিল বেশি। বীণা দাসের নেতৃত্বে গঠিত দিপালী সংঘ প্রভৃতি দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বাংলায় গড়ে ওঠা নারী সংগঠনগুলির রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্র হল স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তারা আশা করেছিল স্বাধীনতার পরে স্বাধীন ভারত সরকার নারী উন্নয়নের কথা ভাববে। কিন্তু তা না হওয়ায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারী সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে থাকে ও রাজনীতি থেকে ক্রমশ নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে থাকে।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কোন নারী প্রতিনিধি না থাকায় ভারতের নারী সংগঠন গুলি পরবর্তী গোলটেবিল বৈঠকে একজন নারী প্রতিনিধি দাবি করে এবং সরোজিনী নাইডুর নাম উপস্থাপন করে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে সরোজিনী নাইডু, নারীদের প্রতিনিধি হয়ে দাবি পত্র জমা দেয়। যেখানে সে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, যুগ্মনির্বাচন ও নারীদের জন্য কোন আসন সংরক্ষণ

থাকবে না বলে দাবি জানান।[১২] ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেন্স, অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স এর মতো নারী সংগঠনগুলি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপিত দাবি পত্রটি তৈরি করে। এই দাবিপত্রটি আলোচনার জন্য তিনজন মহিলা প্রতিনিধিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমন্ত্রণ জানানো হয়।[১৩] তারা কখনোই নারীদের আসন সংরক্ষণ দাবি করেননি কারণ তারা মনে করত দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য যুগ্ম নির্বাচন ব্যবস্থা প্রয়োজন। তারা পুরুষদের সমান নাগরিকত্বের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও সুযোগের অধিকার দাবি করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নারী বক্তা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন বেগম হামিদ আলী, রাজকুমারী অমৃত কর ও ডক্টর মুথলক্ষ্মী রেড্ডি।[১৪] দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় নারীরা বুঝে গিয়েছিল যে এটি একটি মোহ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ভারতবাসীকে নিজ উদ্যোগে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

যাই হোক নারীর সংগঠনগুলির পরিকাঠামোগত অসুবিধার জন্য নির্বাচনী ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে নির্বাচনে নারী ভোটারদের স্বীকৃতি দেওয়া হলে নারী ভোটারের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনের দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার কে স্বীকৃতি দেওয়া হলে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করে জাতীয় কংগ্রেস জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য কিছু মৌলিক অধিকার গুলিকে সংবিধানের স্থান দেওয়ার কথা বলে। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনে উইমেন্স কনফারেন্সের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং নারীর অধিকার গুলি সাংবিধানিক প্রাপ্তির জন্য উইমেন্স কনফারেন্সের তরফ থেকে নারীর অধিকারের চার্টার তৈরি করা হয়।[১৫] সেই সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বে ছিলেন জহরলাল নেহেরু। তিনি ওমেন্স কনফারেন্স এর কাজকে উৎসাহিত করেন। ভারতীয় নারীরা নিজেদের অধিকার, দাবীদাবা আদায়ের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম ও আন্দোলন এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও বিভিন্ন আন্দোলনের দ্বারা নিজ অধিকার আদায় করেছে।

মুসলিম নারী ও রাজনীতি:

গবেষণার ক্ষেত্র যেহেতু মুসলিম নারী তাই ইসলাম ধর্মে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা জেনে নেওয়া দরকার। ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই নারী রাজনীতি ও সামাজিক কাজকর্মে অংশ নিত। ইসলাম আবির্ভাবের পর আরব সাম্রাজ্যে নারীরা বিভিন্ন পদের অধিকারী ছিল, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও অংশ নিত। গবেষক আমির আলী তার গ্রন্থ 'উইমেন ইন ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন আরব সাম্রাজ্যের বহু বিদুষী নারী ইসলাম ধর্মের ছত্রছায়ায় লালিত পালিত হয় ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। যেমন বিবি আয়েশা উটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিজ বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন। হযরত কন্যা ফাতিমা খলিফা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর নাতনি জয়নাব তার ভাতুষ্পুত্রকে কারবালার প্রান্তরে উমাইদ খলিফা ইয়াজিদের অত্যাচার ও হত্যা লীলা থেকে রক্ষা করেন।[১৬] ইসলামের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে নারী বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক কাজকর্মে সক্রিয় ছিল।

ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই মুসলিম নারী দেশের রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশ নিত। মধ্যযুগীয় অভিজাত ও রাজ পরিবারে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন। তাদের মধ্যে সব শেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজিয়া সুলতানা, চাঁদ বিবি, নুরজাহান, জাহানারা প্রমুখ। যদিও তারা সকলেই ছিলেন রাজ পরিবারের তবে কালের অগ্রগতির সাথে সাথেই মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বহু নারী রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বাধীনতার সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে। রাজনীতিতে প্রভুত্ব কায়েমকারী পুরুষরাও এখন নারীদের জন্য সমরাজনৈতিক অধিকার দাবি করতে থাকে, তবে সমঅধিকার একদিনে আসেনি। বিগত ২০০ বছর ধরে বহু সমাজ সংস্কার, নারী সংগঠন, নারী আন্দোলনের ফলশ্রুতি হল এই সমঅধিকার। তবে এটি দুর্ভাগ্য যে বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অধিকারকে কখনোই উৎসাহ দেওয়া হয়নি। বিংশ শতকের প্রথম দিকে যখন ভারতের সর্বত্র নারীর ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হচ্ছে, তখন মুসলিম

মহিলারা ব্রাহ্ম হিন্দু মহিলাদের সাথে জোট বাঁধে এবং ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই সময় মুসলিম সমাজের কিছু পুরুষ সদস্যের একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও সরোজিনী নাইডু, মার্গারেট কজিন্স, অ্যানি বেসান্ত, পন্ডিত রামাবাই প্রমুখের সহযোগী হয়ে কিছু সংখ্যক মুসলিম নারী ভোটাধিকার আন্দোলন শুরু করে। মুসলিম নারীর ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯২১ সালে আইন পরিষদে মুসলিম নারীর ভোটাধিকার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হলে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এর বিরোধিতা করে এবং গৃহই নারীর একমাত্র স্থান এবং রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ করলে ইসলাম ধর্ম আঘাত প্রাপ্ত হবে বলে মত প্রকাশ করে। তা সত্ত্বেও আইনসভায় উত্থাপিত নারীর ভোটাধিকার প্রসঙ্গটি এস এম বোস দ্বারা সমর্থিত হয় এবং তিনি বলেন নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটবে যা জাতির উন্নয়নের সহায়ক হবে।[১৭] ডক্টর সহোরা ওয়ার্দি, এস এম বোসের বক্তব্যটি সমর্থন করেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর ও ভোটাভুটির পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সদস্যের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি নস্যাৎ করা হয়। তারপরে ১৯২৫ সালে বাংলার আইন পরিষদে মুসলিম নারীর ভোটাধিকার প্রসঙ্গটি আবার উত্থাপন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করলে পুনরায় প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। নারীর ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে এবার মুসলিম নারীরা বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের পথে এগোতে থাকে।

২০ শতকে গড়ে ওঠার মুসলিম নারী সংগঠন গুলির মধ্যে অন্যতম হল আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম।[১৮] ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০ শতকের প্রথম ভাগে মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন গড়ে তুললে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথমদিকে এই সংগঠনটি মুসলিম নারীর বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান শিক্ষা ও আইনি অধিকার নিয়ে সরব হয়েছে। বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম' কলকাতা ও তার আশেপাশে বস্তি এলাকায় নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করে। নারীদের সেলাই, শিশু পালন, ধর্মীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে। নারী মুক্তি ও নারী

কল্যাণের জন্য 'মহামেডান লেডিস অ্যাসোসিয়েশন' এর বক্তব্য তৎকালীন সরকারও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও সেই সময় মুসলিম নারীর কল্যাণের জন্য আরও কতগুলি সংগঠন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডঃ লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'নারীতীর্থ', নিখিল ভারত মহিলা সমিতি, বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সমিতি প্রভৃতি। লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'নারীতীর্থ' পতিতা মুসলিম নারীদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।[১৯] এছাড়া নিখিল ভারত মহিলা সমিতি ভারতের সমস্ত মেয়েদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। বেগম রোকেয়া এই সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯২৫ সালের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সমিতি মুসলিম মেয়েদের কল্যাণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। নারী ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বেগম রোকেয়া ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম সৈনিক। নারী মুক্তি আন্দোলন, মুসলিম নারীর ভোটাধিকার সহ অন্যান্য সমস্ত রকম অধিকার গুলি আদায়ের জন্য তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব মুসলিম নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আকিদা বানু, বাই আম্মা (আলী ভাতৃদ্বয়ের মাতা), বেগম শরিফা, হামিদ আলী বেগম, কুদসিয়া আইজাজ রসূল, নুরুন্নেসা খাতুন, শাসমুন্নাহার মাহমুদ প্রমুখ।

বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে মুসলিম নারীরা পুরুষদের সমান রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়। আঞ্চলিক প্রাদেশিক ও জাতীয় স্তরে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম নারী তার রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে। উদাহরণ হিসাবে মাইমুনা সুলতান, বেগম আবিদা আহমেদ, আজিজা ইমাম, নাজমা হেপতুল্লাহ, মহসিন কিডওয়াই, সৈয়দ তাইমুর প্রমুখ নারী লোকসভা ও রাজ্যসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।[২০] এই সমস্ত প্রথম স্তরের নারীরা পার্লামেন্টে গিয়ে নারী জীবনের বিভিন্ন সমস্যা গুলি তুলে ধরে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীর জীবনের সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল পর্দা প্রথা। পর্দা প্রথার কঠোরতার জন্য বহু মুসলিম বিদূষী নারী গৃহের চার দেওয়ালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এছাড়াও

অজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি মুসলিম নারীর জীবনকে অন্ধকারে পর্যবসিত করেছে। উপনিবেশিক কালে ভারত তথা বাংলায় বহু মুসলিম নারী পর্দা প্রথার কঠোরতা ছিন্ন করে মুসলিম নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য লড়াই করেছে, নারী রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বলতেই হয় যে অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে হিন্দু ও ব্রাহ্ম নারীরা তাদের পুরুষ সমাজকে যেভাবে পাশে পেয়েছিল মুসলিম নারীরা সেরূপ পুরুষ সমাজকে তাদের আন্দোলনের পাশে পাইনি। এমনকি মুসলিম নারীদের অধিকারের আন্দোলন ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। তারা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারেনি। কিছু সংখ্যক মুসলিম নারী নিজেদের গণ্ডি থেকে বাইরে বেরিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে অংশ নিলেও বৃহত্তর মুসলিম নারী সমাজ অন্ধকারেই রয়ে গেছে, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ জাগ্রত হয়নি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মূল ধারার রাজনীতিতে মুসলিম নারীদের উপস্থিতি একেবারেই আণুবীক্ষণিক। বর্তমান অধ্যায়ে সমীক্ষা দ্বারা মুসলিম নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হয়েছে। যেহেতু আলোচনার ক্ষেত্র মালদা জেলা তাই মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনার আগে স্বাধীনোত্তর ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজ ও মুসলিম নারী সমাজের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে নারীর রাজনৈতিক অবস্থান:

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সংগঠন গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও স্বাধীনোত্তর কালে এই সংগঠনগুলির মূল্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় নারী সচেতনতা বৃদ্ধি ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। মূলধারার রাজনীতিতে তাদের উপস্থিতি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। যে সমস্ত নারীর উপস্থিতি রাজনীতিতে দেখা যায় তাদের বেশিরভাগ কোন অভিজাত শিক্ষিত ও রাজনৈতিক পরিবার থেকে আগত। স্বাধীনতার পূর্বে নারী সংগঠন গুলির আন্দোলনের ফলে ১৯৫০ সালে সংবিধানে নারীদের সামান্যতম অধিকার দেওয়া হয়। যেমন সার্বজনীন ভোটাধিকার, সমঅধিকার প্রভৃতি। কিন্তু বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয় এবং বারবার এটি প্রতিভাত হয়েছে যে রাজনীতি

কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য নারীরা এখানে অপাংতেয়, তবে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও মূল ধারার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। ১৯৭০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী নারীবাদী ভাবধারার পুনঃজাগরন ঘটলে তার প্রভাব ভারতেও পরিলক্ষিত হয় এবং ভারতের তৎকালীন সামাজিক কাঠামোয় নারীদের প্রতি উদাসীনতা, অসাম্যের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে কথা বলা শুরু হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী ক্ষমতায়নের ধারণা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নারী এটি বুঝতে সচেষ্ট হয় যে ক্ষমতায়ন বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত নারী সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারীর যে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল তা বেশিরভাগ সময় পুরুষদের দ্বারা অস্বীকৃত ছিল এবং নারীর অধিকারের লড়াইয়ের বীজ রোপিত হয়েছিল নারীর সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।[২১] ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত ভারত সরকার কর্তৃক *'Towards Equality'* গ্রন্থে দেখা যায় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারীর অধিকারের যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তা সমাজের বিশেষত রাজনীতিতে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। মূলধারার রাজনীতিতে নারী ব্রাতই হয়ে রয়েছে।[২২] '*Towards Equality*'র বক্তব্যের সমর্থক আমরা গবেষক সুসান বোর্ক ও জিন গ্রসহল্টস এর লেখাতেও দেখতে পায়। তাদের মতে সমাজে দুই লিঙ্গের (নারী-পুরুষ) শারীরিক আকার, আকৃতি, কর্ম ক্ষমতা ও দক্ষতা ভিন্ন, তাই তাদের কাজের ক্ষেত্রও ভিন্ন। এর প্রভাব রাজনীতিতেও দেখা যায়।[২৩] পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কখনোই নারী ক্ষমতায়নের সমর্থক হয়ে উঠতে পারেনি, তাই নারী যেখানে সমাজে দেবী রূপে পূজিত হয় সেই নারী আবার অবহেলিত বঞ্চিত। সমাজবিদ রাকা রায় তার গ্রন্থে নারীর এই দ্বৈত চরিত্রের কথা তুলে ধরেছেন।[২৪] ভারতীয় সমাজ কাঠামো ও রাজনীতিতে লিঙ্গ বৈষম্য কঠোরভাবে বর্তমান। নারী ভোটাধিকার পেলেও পুরুষের সমান সমমর্যাদা, আইন পরিষদ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাজনীতিতে কিছু সংখ্যক নারী সরকার গঠন, মন্ত্রিত্ব লাভ করলেও বেশিরভাগ সময় তারা প্রথম

সারিতে উঠে আসতে পারেনি। আর যারা প্রথম সারির রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে তারা অধিকাংশই রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছে, ফলে তারা সব শ্রেণীর নারীর প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

এবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নারী অংশগ্রহণের দিকে নজর দেওয়া যাক। ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হলো পশ্চিমবঙ্গ। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পিঠস্থান কলকাতা হল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। তাই উপনিবেশিক ভারতের বিপ্লবী ভাবধারায় ও স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ তথা নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা কম হতে থাকে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিও পাল্টে যেতে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাও ভাগ হয়ে যায়, যার প্রভাব মানুষের জীবনযাত্রা ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর পড়তে থাকে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় খাদ্যের জন্য মিছিল শুরু হয়। এই সমস্ত মিছিল গুলিতে নারীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত, এসময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পালাবদল শুরু হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে চরম চরায় উতরায় ঘটতে।[২৫] এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালা বদলের সময় নারীর উপস্থিতি মানুষের নজর কাড়ে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যায় মানুষের পাশে থেকে বহু মহিলা ত্রাণে সাহায্য করে।[২৬] পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনেও নারীর ভূমিকা ছিল অবিস্মরনীয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী আন্দোলন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী ক্ষমতায়ন প্রভৃতি নিয়ে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৭৫ সালকে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নারী বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। জাতিসংঘ তার মেক্সিকো অধিবেশনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি সম্মেলনে বলা হয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী অসাম্যের শিকার এবং সম্মেলনে উপস্থিত সকলে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়নের

পক্ষপাতি। স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী থাকাকালীন তিনি নারীর অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য ফুলরেণু গুহর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন, এই কমিটি *'Towards Equality'* শীর্ষক একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়, সেখানে বলা হয় জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে তার মানে এই নয় যে সকল শ্রেণীর মানুষের স্ত্রী সন্তান সহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার মান উন্নত হচ্ছে। এই রিপোর্ট থেকে আরও প্রকাশিত হয় যে স্বাধীনতার অনেকগুলি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও নারীরা আজও দ্বিতীয় শ্রেণী বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং নুন্যতম চাহিদা থেকে বঞ্চিত। নারীর অবস্থানের দিকে তাকিয়ে কমিটি সুপারিশ করে যে কেন্দ্র, রাজ্য উভয় জায়গায় নারীদের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় কমিশন গঠন করতে হবে।[২৭] তবে ১৯৯২ এর আগে পর্যন্ত এরূপ কোন কমিটি গঠিত হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গের ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ উইমেন, অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স এবং উইমেন্স কংগ্রেস কমিটি একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক নারী বছর পালন করে এবং জাতিসংঘ দ্বারা ঘোষিত নারীদের প্রতি সমস্ত রকম বৈষম্যের বিরোধিতা করে। ১৯৭৫ সালে এই তিনটি কমিটি একত্রিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় মিটিং, মিছিল, সেমিনারের আয়োজন করে এবং নারীদের মধ্যে সচেতনতা বোধ জাগিয়ে তোলে। এই কমিটি ত্রয়ী সর্বপ্রথম কলকাতায় নেতাজি স্টেডিয়ামে মিছিলের ব্যবস্থা করে এবং এই মিছিলে গৃহবধূ, কর্মরত মহিলা, স্কুল কলেজের মেয়েরা সকলে একত্রিত হয়েছিল। এই একত্রিত কমিটি ত্রয়ী নারীদের জাগ্রত করার জন্য প্রদর্শনী, বুকলেট, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও নারীর অধিকারের কথা বলা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) তে প্রথমবার নারীর উন্নতির জন্য আলাদা ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে (১৯৮৫-৯০) নারীর আর্থিক অবস্থান পর্যালোচনা করার জন্য সেলফ এমপ্লয়েড উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও জাতীয় নারী কমিশন গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় নারী কমিশন গঠিত হয়

১৯৯৩ সালে। ফলে বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন ও আইন প্রণয়ন করেছে কিন্তু বাস্তবে নারী ন্যূনতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও একই রকম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সাংবিধানিক অধিকার (৭৩ তম ও ৭৪তম সংশোধনী ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা) :

প্রায় ২০০০ সাল পর্যন্ত নারীদের জন্য জাতীয় পার্সপেক্টিভ প্লান কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে ভারত সরকার দুটি সংবিধান সংশোধনের দ্বারা (৭৩তম ও ৭৪তম) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ ঘটান। এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল, কেন্দ্র সেখানে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করত না। কিন্তু সংবিধানের ৭৩ তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় তপশিলি জাতি, উপজাতিসহ নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[২৮] প্রথমদিকে কিছু রাজ্য সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও এই সংবিধান সংশোধনের বিরোধী ছিল। এই সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা পঞ্চায়েতে তিনটি স্তরেই আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ও সংবিধান সংশোধনী অনুসারে ১৯৯৩ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবিধানের ৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধনের গুরুত্ব বোঝার আগে আমাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতবর্ষে নির্বাচনী ব্যবস্থার তৃণমূল স্তর হল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, যা উপনিবেশিক ভারতবর্ষে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নামে পরিচিত ছিল। উপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় তাদের কোন নজর ছিল না বরং শহরাঞ্চলে শাসন ব্যবস্থার দিকেই তাদের বেশি নজর ছিল। তাই প্রাথমিকভাবে শহরাঞ্চলে শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। সেই অনুসারে ১৬৮৭ সালে মাদ্রাজ

কর্পোরেশন, ১৭২৬ সালে বম্বে ও কলকাতার মিউনিসিপাল গঠন করা হয়। প্রথমদিকে এই কর্পোরেশনগুলি রাজস্ব সংগ্রহ, প্রশাসনিক ও চৌকিদারী বিষয়গুলি দেখাশোনা করত। ১৭৭৩ এর রেগুলেটিং আইন অনুযায়ী প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭০ সালের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন এবং সেই অনুযায়ী ১৮৭০ সালের প্রণীত চৌকিদারী আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত স্থাপিত হয়। তবে এই সময় পঞ্চায়েতগুলির কাজ ছিল শুধুমাত্র খাজনা আদায় ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। ঐতিহাসিক আনন্দ বলেছেন এই সময় স্থানীয় জমিদার কতোয়ালদের মতো স্থানীয় ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা গ্রামের শাসন কার্য দেখাশোনা করত। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্মচারীদের সাথে গ্রামের লোকজনের কোন যোগাযোগ ছিল না।[২৯]

এর পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালের লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। ১৮৮২ সালকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ম্যাগনাকার্টা বলা হয়। এই সময় গ্রাম এলাকায় স্থানীয় বোর্ড গঠন করা হয়। ১৮৮৩-৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয়। এর পরবর্তীকালে ১৯০৯ সালে শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরনের জন্য রয়্যাল কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন স্থানীয় সরকারের হাতে কতগুলি অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন পাস করা হয়। এই আইন অনুসারে দুস্তর বিশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এক. গ্রামীণ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বোর্ড ও দুই. জেলায় স্তরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড,[৩০] যা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি শুধুমাত্র দেশের কিছু সংখ্যক লোক যারা সম্পত্তির অধিকারী ও খাজনা প্রদান করতেন তারাই শুধুমাত্র ভোটাধিকার পেয়েছিল। নারী ভোটাধিকারের বিষয়েও কোন রূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৯১৯ মন্টেগু চেমস ফোর্ড শাসন সংস্কার আইনের সুপারিশে সর্বপ্রথম নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় এবং বলা হয় ভারতে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক প্রায় নারী, তাই প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে পুরুষদের ন্যায় নারীদের ভোটাধিকার থাকা উচিত।

১৯৩০ এ দশকে স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী ও উন্নতি পর্যালোচনা করার দায়িত্ব সাইমন কমিশনের ওপর দেওয়া হয়। সাইমন কমিশন তার রিপোর্টে বলে উত্তরপ্রদেশ, বাংলা ও মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য কোন জায়গার কোনো প্রগতি দেখা যায়নি। ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের হাতে বহু ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতসহ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিকেন্দ্রীকরণ করার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে ১৯৪৭ এর ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত স্থানীয় স্বায়ত্ত সরকারের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। নারীর ভোটাধিকার দেওয়া হলেও খুব কম সংখ্যক নারী নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেত। স্বাধীনতার পরে নারীদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

১৯৫২ থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে গ্রামোন্নয়ন ও শাসন ব্যবস্থার বিকন্দ্রীকরণের জন্য বহু পরিকল্পনা গঠন করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা, ১৯৫৫ কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন বোর্ড ও জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়। স্বাধীন ভারতের প্রথম গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা, কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয় এবং রাজ্য সরকার এ বিষয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করতে থাকে। ১৯৫৫ সালে গঠিত কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন বোর্ড সর্বপ্রথম নারীদের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে এর দ্বারা প্রথম ব্লক স্তরে একটি করে নারী আধিকারিক রাখার কথা বলা হয় এবং তার অধীনে আরো দুজন গ্রাম সেবিকা নিয়োগ করা হয়। এরপর জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে ও নীতি নির্ধারণ করে।

১৯৫৭ সালের গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য অশোক মেহেতার নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ত্রিস্তরীয় স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব দেয়। যথা- গ্রাম স্তরের গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা স্তরে জেলা পরিষদ। এই কমিটি সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান করে। এর ফলে

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হয়। এই কমিটির সুপারিশ দ্বারা যে সমস্ত নারী, নারী ও শিশু কল্যাণের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে দু-একজনকে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।[৩১] এর দ্বারা কিছু সংখ্যক হলেও নারী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক বাধা, নেতৃত্বের অভাব ও বিভিন্ন প্রকল্পগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থের অপব্যবহারের ফলে কমিটির প্রস্তাবগুলি সফল হয়নি।[৩২] ১৯৭৭ সালে গঠিত অশোক মেহতা কমিটির দ্বারা স্থানীয় শাসন কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণের পথ আরও দৃঢ় হয়। এই কমিটি নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করার জন্য বলা হয় যে সমস্ত মহিলা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে অথবা পরাজিত হয়েছেন অথবা নির্বাচনের প্রতিনিধিত্ব করেননি অথচ যোগ্য তাদেরকে শাসন ব্যবস্থা সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।[৩৩] এর ফলেও নারীরা শাসনব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার সাহস পাবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কমিটির সুপারিশ গুলিও ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে জি. ভি. কে. রাও ও এল. এম. সিংভির নেতৃত্বে গঠিত আরো দুটি কমিটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার পক্ষে মত দেয়।[৩৪] ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৬৪ তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভাবে গঠনের পক্ষে মত দেওয়া হয়। ১৯৭০ এর দশকের আন্তর্জাতিক স্তরে নারী আন্দোলন শুরু হলে তার প্রভাব ভারতীয় রাজনীতিতেও পরে ও ভারতীয় নারীরা জাতীয় ও রাজ্যস্তরে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ নারীদের বৃহত্তর অংশকে রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের পদক্ষেপ আরও সুদৃঢ় হয় ১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে।

১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করে। সেই সময় কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিল। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী ১৯৯৩ এর ২৪ শে এপ্রিল কার্যকরী হয় এর ৯ নং ও ১১ নং অংশে পঞ্চায়েত সংক্রান্ত নিয়মাবলী বর্ণিত রয়েছে। এর দ্বারা ত্রিস্তরীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হয়। এর পূর্বে দ্বিস্তরীয় শাসন কাঠামো অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্য শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী হল শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের চূড়ান্ত রূপ। এর দ্বারা গ্রাম উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা যা আগে রাজ্য

সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল, তা এখন পঞ্চায়েতের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়।[৩৫] এই সংশোধনীতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় যেমন-

১. প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন বাধ্যতামূলক এবং জনগণ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে।
২. তপশিলি জাতী, উপজাতিসহ মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়।
৩. রাজ্য সরকার ও পঞ্চায়েতের মধ্যে অর্থের সমবন্টন।
৪. পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত হবে।

১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাকে স্বনির্ভর করার প্রয়াস করা হয়, কিন্তু তা এখনো সম্ভব হয়নি। এই সংশোধনীর দ্বারা প্রথম নারী ও তপশিলি জাতি, উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রান্তিক জনজাতি ও দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত নারীদের জন্য তৃণমূল স্তরের রাজনীতি রাঙিনা উন্মুক্ত হল। যা একটি বিকেন্দ্রিকৃত গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যিক ছিল। গবেষক নির্মলা বুচ বলেছেন যে এটি কোন নতুন ঘটনা নয়, যা নতুন ছিল তা হল সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার দ্বারা ত্রিস্তরীয় শাসনব্যবস্থায় নারীর সর্বাধিক অংশগ্রহণ।[৩৬] এর ফলে রাজনৈতিক দল গুলির অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহিলা সংরক্ষিত আসনে নারীদের অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এবং এরপর থেকেই নারীদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে রাজনীতি কেবলমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে নয়, নারীরাও সমানভাবে এর অংশীদার। এই আইনটি বলবৎ হওয়ার সাথে সাথে কিছু রাজ্য যেমন কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি তার প্রয়োগ ঘটাতে তৎপর হয়। এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে জানা দরকার কারণ মালদা জেলার রাজনৈতিক কাঠামো ও তাতে নারীর অংশগ্রহণ জানার জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস বিশেষ করার তৃণমূল স্তরে কিভাবে রাজনৈতিক বিবর্তন ঘটেছে তা জানা দরকার কারণ রাজ্য স্তরের রাজনৈতিক ঘটনাবলী জেলা স্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিবর্তন:

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য গুলির তুলনায় তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ হল দৃষ্টান্ত স্বরুপ। পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় উপনিবেশিক সময়কাল থেকেই এখানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিদ্যমান। ১৯১১ সালে গ্রামীন স্বায়ত্ত শাসন আইন পাশ হওয়ার পর থেকেই দ্বিস্তর বিশিষ্ট আইনসভা, যথা- জেলা স্তরের ডিস্টিক বোর্ড ও গ্রামীণ স্তরে ইউনিয়ন বোর্ড[৩৭] পশ্চিমবঙ্গেও বিদ্যমান ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে রূপান্তরিত হয়। নতুন গঠিত পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯৫৭ সালে পঞ্চায়েত আইন ও ১৯৬৩ সালে জেলা পরিষদ আইন পাস হয়। এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের চার স্তর বিশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, জেলা পরিষদ (জেলা স্তরের), আঞ্চলিক পরিষদ (ব্লক স্তরে), পঞ্চায়েত অঞ্চল (কতগুলি গ্রাম নিয়ে) ও গ্রাম পঞ্চায়েত (প্রতিটি গ্রামে)। ১৯৫৭ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের সংশোধন করে ত্রিস্তর বিশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা চালু হয়, যথা জেলা পরিষদ (জেলা স্তরে) পঞ্চায়েত সমিতি (ব্লক স্তরে) গ্রাম পঞ্চায়েত (কয়েকটি গ্রাম) নিয়ে যা বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি বহু পূর্বেই সুপারিশ করেছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্য দিয়ে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসে। কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কৃষি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে সচেষ্ট হয়। ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৩ এর পঞ্চায়েত আইন কে কার্যকরী করতে তৎপর হয় ও সেই অনুসারে প্রথম তিন স্তরে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই আইন অনুসারে বর্তমানেও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৭৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথম নিম্নশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য নির্বাচনের প্রতিটি ধাপেই তপশিলি জাতি, উপজাতি ও নারীদের মধ্যে থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন আবশ্যিক করা হয়। ফলে বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকেই নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পদ্ধতিতে পঞ্চায়েতে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ ১৯৯২ এর সংবিধান সংশোধনী পূর্ব পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। কারণ ১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের পর ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথম তা কার্যকরী করা হয় ও পঞ্চায়েত আইন ও বদল

করা হয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে ১ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য তা খুব দরকার ছিল। যাই হোক বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলার উন্নয়নের জন্য প্রতিটি গ্রামে উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এগুলিতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহন জরুরী। পঞ্চায়েত গুলি উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের চাহিদা সমস্যার সমাধান ও আর্থিক উন্নয়ন ঘটাবে। এই কমিটি গুলিতে মহিলা প্রতিনিধি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলেও সংবিধান সংশোধনী বা পঞ্চায়েত আইন তৃণমূল স্তরের নারীর ক্ষমতায়ন কতটা সুনিশ্চিত করেছে তা বলা কঠিন।

স্বাধীনোত্তর ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা ও পঞ্চায়েতে নারীর অংশগ্রহণ:

বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নারী ক্ষমতায়ন একটি বহুল আলোচিত বিষয়। নারী ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে নারীর শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অধিকারের মত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার হলো ভোট প্রদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে বহু নারী আন্দোলনের ফলস্বরূপ নারী ভোটাধিকার পেলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সার্বজনীন অধিকার পায়নি। স্বাধীনোত্তর ভারতে নারী এই অধিকার কতখানি পেয়েছে তা বোঝা যাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নির্বাচনের প্রতিটি স্তরে নারীর উপস্থিতির হার পর্যালোচনার মাধ্যমে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, বহু লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভা অতিক্রান্ত হয়েছে। তথাপি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায় নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম, এর থেকে রাজনৈতিক দলগুলির পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যারা রাজনীতিকে কেবলমাত্র নিজেদের অধিকার বলে মনে করে। ১৯৯২ এর সংবিধান সংশোধনী নারীর পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে কিন্তু লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় এরূপ কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের রাজনৈতিক দলগুলির কৃপার ওপর নির্ভর করতে হয়।

সারণি ৩০

লোকসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যার নিরিখে নারী প্রতিনিধির পরিসংখ্যান (১৯৫২-২০১৪)

লোকসভা নির্বাচন	আসন সংখ্যা	জয়ী মহিলা প্রতিনিধি	শতকরা হার
১৯৫২	৪৮৯	২২	৪.৪
১৯৫৭	৪৯৪	২৭	৫.৪
১৯৬২	৪৯৪	৩৪	৬.৭
১৯৬৭	৫২৩	৩১	৫.৯
১৯৭১	৫২১	২২	৪.২
১৯৭৭	৫৪৪	১৯	৩.৮
১৯৮০	৫৪৪	২৮	৫.১
১৯৮৪	৫৪৪	৪৪	৮.১
১৯৮৯	৫২৯	২৮	৫.৩
১৯৯১	৫০৯	৩৬	৭.০
১৯৯৬	৫৪১	৪০	৭.৪
১৯৯৮	৫৪৫	৪৪	৮.০
১৯৯৯	৫৪৩	৪৮	৮.৪
২০০৪	৫৪৩	৪৫	৮.১
২০০৯	৫৪৩	৫৯	১০.৯
২০১৪	৫৪৩	৬১	১১.২

উৎসঃ ভারতীয় নির্বাচন কমিশন, নিউ দিল্লী, ভারত।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৯২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৬টি লোকসভা নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিদের জিতে আসার হার পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে নারী ক্ষমতায়ন পরিকল্পনা করা যায়। ১৯৯২ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ৪৮৯ টি আসন সংখ্যার নিরিখে জয়ী নারী প্রতিনিধি ছিলেন ২২জন, যা প্রায় ৪.৪ শতাংশ। তবে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা সেভাবে বাড়েনি। ২০০৯ সালে পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে ৫৪৩ টি আসন সংখ্যা নিরিখে মাত্র ৫৯ জন নারী নির্বাচিত হয়েছে ও সংসদ পদ লাভ করেছে, যা ছিল পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের মোট আসন ক্ষমতার ১০.৯%। এর আগের লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যায় পূর্বের নির্বাচনের নারী প্রতিনিধির সংখ্যা

৫০ ও পেরোইনি। এর আগে থেকে বেশি নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ত্রয়োদশ নির্বাচনে ৪৮জন (৮.৪ শতাংশ)। ষষ্ঠদশতম লোকসভা নির্বাচনে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি ৫৪৩ টি আসনে নিরিখে প্রায় ৬১ জন শতকরা হিসেবে ১১.২০ শতাংশ।[৩৮] এই লোকসভা নির্বাচনের শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ১২ জন নারী প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং এই প্রথম কোন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল।

সারণি ৩১

লোকসভা নির্বাচনে নারী পুরুষ ভোটদাতার পরিসংখ্যায়ন ১৯৫২-২০১৪ (শতকরা হারে)

লোকসভা নির্বাচন	মোট ভোটদাতা	পরুষ ভোটদাতা	নারী ভোটদাতা	ব্যবধান
১৯৫২	৬১.২	-	-	-
১৯৫৭	৬২.২	-	-	-
১৯৬২	৫৫.৪	৬৩.৩	৪৬.৬	১৬.৭
১৯৬৭	৬১.৩	৬৬.৭	৫৫.৫	১১.২
১৯৭১	৫৫.৩	৬০.৯	৪৯.১	১১.৮
১৯৭৭	৬০.৫	৬৬.০	৫৪.৯	১১.১
১৯৮০	৫৬.৯	৬২.২	৫১.২	১.০
১৯৮৪	৬৪.০	৬৮.৪	৫৯.২	৯.২
১৯৮৯	৬২.০	৬৬.১	৫৭.৩	৮.৮
১৯৯১	৫৭.০	৬১.৬	৫১.৪	১০.২
১৯৯৬	৫৮.০	৬২.১	৫৩.৪	৮.৭
১৯৯৮	৬২.০	৬৬.০	৫৮.০	৮.০
১৯৯৯	৬০.০	৬৪.০	৫৫.৭	৮.৩
২০০৪	৫৮.৮	৬১.৭	৫৩.৩	৮.৪
২০০৯	৫৮.৮	৬০.২	৫৫.৮	৪.৪
২০১৪	৬৬.৪	৬৭.১	৬৫.৬	১.৫

উৎসঃ ভারতীয় নির্বাচন কমিশন, নিউ দিল্লী, ভারত।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে ১৯৯২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ১৬ টি সাধারণ নির্বাচনে নারী-পুরুষ ভোট দাতার সংখ্যার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল। যদিও নারী উপনিবেশিক ভারতেই ভোটাধিকার পেয়েছে, স্বাধীনোত্তর ভারতে নারী-পুরুষ ভোটদাতার সংখ্যার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। নারী ভোট

দাতার সংখ্যা পুরুষ ভোট দাতার সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। ১৯৫২ থেকে ২০১৪ সালের নির্বাচনের ধারাবাহিক পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বোঝা যাবে এই ব্যবধান ক্রমশ কমছে। ১৯৫২ সালের লোকসভা নির্বাচনে যেখানে নারী-পুরুষ ভোটদাতার সংখ্যার ব্যবধান ছিল সর্বাধিক ১৬.৭ শতাংশ, ১৫৯৯ সালে এই ব্যবধান ১০% নিচে নেমে আসে ৮.৩ শতাংশ ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৪.৪ শতাংশ নেমে আসে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নারী পুরুষ ভোট দাতার পরিসংখ্যান এর মধ্যে তফাৎ খুব কম দেখা যায় মাত্র ১.৫ শতাংশ। তাহলে সহজে প্রতিভাতও হচ্ছে যে নারীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ জাগ্রত হচ্ছে এবং নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়েছে। ভোট দান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের যে সাংবিধানিক অধিকার নারী লাভ করেছে সেই বোধ ভারতবর্ষের প্রত্যেক নারীর মধ্যে জেগে উঠেছে।

রাজ্যসভা: পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা নামে পরিচিত। রাজ্যসভার সদস্যরা পরোক্ষ ভোট দানের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের দ্বারা মনোনীত হন। বর্তমানে ২৪৫টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩০ জন মহিলা সংসদ রাজ্য সভায় আছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় মোট ১৬ টি আসন রয়েছে। বিগত কুড়ি বছরে রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট মহিলা সংসদ ছিলেন মাত্র চারজন। ২০১১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ছয় জন। ২০১৪ সালের রাজ্যসভায় যে সমস্ত মহিলা সংসদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে মনোনীত হয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ মহিলা নন।

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের নারী প্রতিনিধি:

লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে প্রার্থীরা সংসদ পদে নির্বাচিত হন। যে সমস্ত মহিলা প্রতিনিধি সংসদ পদে নির্বাচিত হন স্বাভাবিকভাবেই তারা সমগ্র দেশ তথা রাজ্যের নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৯২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৬টি লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধিত্বের পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় আসন সংখ্যার নিরিখে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা নিতান্তই কম। ১৯৬৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন পাঁচজন। এরপরে ১৯৮৪ সালে ৪২ টি আসন সংখ্যা নিরিখে পাঁচ জন মহিলা লোকসভায় সাংসদ পদ লাভ করেছেন। পরে ১৯৮৯, ১৯৯১ ও ১৯৯৪ সালে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা খানিকটা কমে

যায়। ১৯৯৮, ১৯৯৯ সালে পরপর দুবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পাঁচ জন মহিলা প্রতিনিধি পার্লামেন্টে গেছেন, এর মধ্যে তিনজন বামফ্রন্ট প্রার্থী ও দুজন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি। ১৯৭১ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত লোকসভায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে পাঁচ জন হয়। ২০০৯ সালের নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সাত জন, যা শতাংশের হারে ১৬.৬৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে সর্বাধিক সংখ্যক নারী লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন।

সারণি ৩২

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মহিলা প্রতিনিধিদের পরিসংখ্যায়ন (১৯৫২-২০১৪)

সাল	মোট আসন সংখ্যা	পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় মহিলা প্রতিনিধি	শতাংশে পরিসংখ্যান
১৯৫২	৩৪	১	২.৯৪
১৯৫৭	৩৬	২	৫.৫৫
১৯৬২	৩৬	১	২.৭৮
১৯৬৭	৪০	৫	১২.৫
১৯৭১	৪০	২	৫.০০
১৯৭৭	৪২	২	৪.৭৬
১৯৮০	৪২	২	৪.৭৬
১৯৮৪	৪২	৫	১১.৯
১৯৮৯	৪২	২	৪.৭৬
১৯৯১	৪২	৩	৭.১৪
১৯৯৬	৪২	৪	৯.৫২
১৯৯৮	৪২	৫	১১.৯
১৯৯৯	৪২	৫	১১.৯
২০০৪	৪২	৪	৯.৫২
২০০৯	৪২	৭	১৬.৬৭
২০১৪	৪২	১২	২৮.৫৭

(উৎস: পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা গ্রন্থাগার এবং Vidya Munshi, *'Political Participation'* in Jasodhara Bagchi and Sarmistha Dutta Gupta (eds.), '*The Changing Status of Women in West Bengal, 1970-2000: The Challenges Ahead*, Sage, New Delhi, 2005, p.87. থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে)

বিধানসভাঃ ১৯৭১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নারী প্রতিনিধির সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৭১ সালে যেখানে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৬ সেখানে ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩ জন। ১৯৯১ এর মহিলা বিধায়কের শতকরা হার ছিল ৭.৮২ শতাংশ। ২০০১ সালে বিধানসভায় নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে ৩০ জন এবং এর শতকরা হার ১০.২ শতাংশ দাঁড়ায়। ২০০১ এর ৩০ জন মহিলা বিধায়কের মধ্যে একজন তপশিলি উপজাতি ও চারজন তপশিলি জাতিভুক্ত ছিলেন।[৩৯] ২০১১ সালে ২৯৪ আসনের মধ্যে মহিলা বিধায়কের আসন দখল করেন ১২.২৪ শতাংশ।

সারণি ৩৩

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধির পরিসংখ্যায়ন (১৯৭১-২০১১)

সাল	মোট আসন সংখ্যা	বিধান সভায় মহিলা প্রতিনিধি	শতাংশে পরিসংখ্যান
১৯৭১	২৮০	৬	২.১৮
১৯৭৩	২৮০	৫	১.৭৮
১৯৭৭	২৯৪	৪	১.৩৬
১৯৮২	২৯৪	৭	২.৩৮
১৯৮৭	২৯৪	১২	৪.০৮
১৯৯১	২৯৪	২৩	৭.৮২
১৯৯৬	২৯৪	২২	৭.৪০
২০০১	২৯৪	৩০	১০.২
২০০৬	২৯৪	৩৭	১৩.০
২০১১	২৯৪	৩৬	১২.২৪

(উৎস: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা গ্রন্থাগার এবং Vidya Munshi, '*Political Participation*' in Jasodhara Bagchi and Sarmistha Dutta Gupta (eds.), '*The Changing Status of Women in West Bengal, 1970-2000: The Challenges Ahead,* Sage, New Delhi, 2005, p.87. থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে)

১৯৫২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত রাজ্যের মন্ত্রিসভার দিকে তাকালে দেখা যাবে ১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৯৭১ সালে রাজ্য মন্ত্রিসভায় কোন মহিলা প্রতিনিধির অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৫২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহু রাজনৈতিক দল যেমন কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তারা কেউই মহিলা মন্ত্রীসংখ্যার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করেনি। ২০১১ সালে আমরা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সহ আরো ৪৪ জন মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভায় পেয়েছি। কিন্তু সেখানে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন, এখানে পুরুষ প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক।

সারণি ৩৪

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় মহিলা মন্ত্রীর পরিসংখ্যান (১৯৫২- ২০১১)

সাল	মহিলা ক্যাবিনেট মন্ত্রী	মহিলা রাষ্ট্রমন্ত্রী	মহিলা উপমন্ত্রী	মোট মহিলা মন্ত্রী	রাজ্যের মোট মন্ত্রীসংখ্যা	মহিলা মন্ত্রীর শতাংশে পরিসংখ্যান
১৯৫২	১	-	১	২	৩০	৬.৬৬
১৯৫৭	-	১	১	২	৩০	৬.৬৬
১৯৬২	২	-	৩	৫	৩৭	১৩.৫১
১৯৬৭	-	-	-	-	১৯	০
১৯৬৭	-	-	-	-	৩	০
১৯৬৮	-	-	-	-	১৭	০
১৯৬৯	১	১	-	২	৩১	৬.৪৫
১৯৭১	-	-	-	-	২৬	০
১৯৭২	-	-	১	১	২৮	৩.৫৭
১৯৭৭	-	১	-	১	৩০	৩.৩৩
১৯৮২	-	২	-	২	৪৫	৪.৪৪
১৯৮৭	১	-	-	১	৩২	৩.১২
১৯৯১	১	৩	-	৪	৪৪	৯.০৯
১৯৯৬	১	৩	-	৪	৪৮	৮.৩৩
২০০১	১	৩	-	৫	৪৮	১০.৪১
২০০৬	১	২	-	৩	৪৪	৬.৮১
২০১১	৩	১	-	৪	৪৪	৯.০৯

(উৎস: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েবসাইট এবং Vidya Munshi, '*Political Participation'* in Jasodhara Bagchi and Sarmistha Dutta Gupta(eds.), '*The Changing Status of Women in West Bengal, 1970-2000: The Challenges Ahead,* Sage, New Delhi, 2005, p.88. থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে)

সারণি ৩৫

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধির পরিসংখ্যায়ন

পঞ্চায়েত নির্বাচন	মোট আসন	মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা	শতকরা
১৯৯৩	৭১১২২	২৪৭৯৯	৩৪.৮৬
১৯৯৮	৫৮৪৩০	২০৮৩০	৩৫.৬৫
২০০৩	৫৮৩৫৩	২০৮০২	৩৫.৬৪
২০০৮	৫১৪৯৯	১৯১২৪	৩৭.১৩
২০১৩	৫৮৪৬৫	২২৮১৮	৩৯.০২

উৎসঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন, নির্বাচন কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত, ১৯৯৩ থেকে ২০১৩।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হল শাসন ব্যবস্থা তৃণমূল স্তর। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিকে নজর দিলে দেখা যায় ১৯৯২ এর সংবিধান সংশোধনের দ্বারা নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর ভিত্তিতে ১৯৯৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগেও ১৯৭৩ এর পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত অনুসারে সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে দুজন করে মহিলা প্রতিনিধি রাখার কথা বলা হয়। এরপর ১৯৯৩ এ পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন দেখা যায় মোট আসন ৭১,১২২ এর নিরিখে মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ২৪,৭৯৯ জন, যা প্রায় ৩৪.৮৬ শতাংশ ছিল। ১৯৯৮ সালে ৫,৮৪,৩০৩ আসন সংখ্যা নিরিখে মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ২০,৮৩০ জন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা হার বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫.৬৫ শতাংশ। ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫৮,৩৫৩ আসনের ভিত্তিতে ২০,৮০২ টি আসনে মহিলা প্রার্থী জয় লাভ করে, যা ছিল প্রায় ৩৫.৬৪ শতাংশ। ২০০৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে মহিলা প্রতিনিধির পরিমাণ ছিল ৫১,৪৯৯ জন, যা ছিল প্রায় ৩৭.১৩ শতাংশ। ২০০৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ৩৩ শতাংশেরও

বেশি হয়ে যায়। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে তৃণমূল স্তর থেকেই নারীর মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারবোধ জাগ্রত হয়েছে। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫০ শতাংশ আসন মহিলা সংরক্ষণের কথা বলা হয়। এই নির্বাচনে ৫৮,৪৬৫ আসন সংখ্যা নিরিখে মহিলা প্রার্থী ছিলেন ২২,৮১৮ জন, যার শতকরা হিসেব হল ৩৯.০২ শতাংশ। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়। ফলে ২০১৩ সালের ৩,৩৪৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান হল আনুমানিক ৬৭৫ জন। পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সভাপতি ও জেলা পরিষদের মহিলা সভাধিপতির সংখ্যা যথাক্রমে ১৬৭ জন ও ৯ জন। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরও শুধুমাত্র নারী পরিচালিত কোন গ্রাম পঞ্চায়েত নেই। সর্বপ্রথম পঞ্চাশ শতাংশ আসন সংরক্ষণ নারীদের জন্য করা হয়নি। আবার তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য যে আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয় তা নির্ভর করছে অঞ্চলের তাদের উপস্থিতির হারের ওপর। নারীসহ পিছিয়ে পড়ার সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতির জন্য আরও অনেক নতুন প্রকল্প ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েতে স্তরে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে বহু সময় কেটে গেছে, তথাপি রাজনীতিতে নারীর উপস্থিতি একেবারেই আণুবীক্ষণিক। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের ফলে তপশিলি জাতি, উপজাতিসহ নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে এই পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনজাতির অস্তিত্ব রাজনীতিতে আর খুঁজেই পাওয়া যেত না। তৃনমূল স্তরে সংরক্ষণ প্রথা থাকায় রাজনীতিতে নারীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলেও লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় নারীর অবস্থিত একেবারেই নগণ্য। তাই তৃণমূল স্তর থেকে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা সর্বত্রই নারীর জন্য রাজনৈতিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। আজও বিধানসভা ও লোকসভায় নারী পুরুষের বৈষম্য চোখে পড়ার মত, যা পুরুষ প্রাধান্যের পরিচয়ক। কিন্তু নারীদের সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন? সেই প্রসঙ্গে গবেষক শমিতা সেন বলেছেন সমাজের সমতা সৃষ্টির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। নারীকে যখন নারী হিসেবে বিচার করা হয় তখনই সে বৈষম্যের শিকার হয়, তার যোগ্যতা ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়।[৪০] আবার গবেষক সুসান বোর্ড ও জিন গ্রসহল্টস বলেছেন সমাজে

রাজনীতি ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে, এই ভুল ধারণাই রাজনীতি থেকে নারীদের দূরে সরিয়ে রাখে।[৪১] নারীর নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন।

আজকাল নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে বহু আলোচনা ও লেখালেখি হতে দেখা যায় এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়েও বহু চর্চা হয়। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা নারী আসন সংরক্ষণ যদি নারী ক্ষমতায়নের বার্তা বহন করে তাহলে বলতেই হয় ক্ষমতায়ন তখনই কার্যকর হবে যখন তা দেশ ও সমাজের উন্নয়নের কাজে ব্যয় হবে। এ বিষয়ে গবেষক প্রভাত দত্ত ও পাঞ্চালি সেন বলেছেন রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দ্বারা একদিকে যেমন নারী ক্ষমতা অর্জন করবে, সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেরদের উন্নয়ন, হিতকর ও প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করবে, তেমনি দেশ ও সমাজের উন্নয়নে তা ব্যয় করবে।[৪২] যাই হোক রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি সুক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা মালদা জেলাকে সমীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেছি। মালদা জেলার রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা কি? মালদা জেলার সার্বিক কল্যাণে নারী কি ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। তাই মালদা জেলার রাজনীতিতে নারীর অবস্থান বিশেষ করে মুসলিম নারীর অবস্থান পর্যালোচনার জন্য মনোনিবেশ ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গৌড় জনপদ সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয়। পৌণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্রী অঞ্চলের কিছু অংশ মালদা জেলার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকালের বঙ্গ দেশের রাজধানী গৌড়, পান্ডুয়া, ট্যাঁড়া প্রভৃতি বর্তমান মালদা জেলাতেই অবস্থিত। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মালদা জেলাতেও (যা সে সময় গৌড়বঙ্গ নামে পরিচিত) মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মধ্যযুগের ভারতে গৌড় ভূমির পরিবর্তে মালদা নামের পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানি বংশের শাসক নাসির উদ্দিন মাহমুদ এর শাসন কালে প্রাপ্ত শাহগদা নামে এক ফকির দরবেশের সমাধির প্রবেশদ্বারে মালদা নামের উল্লেখ রয়েছে।[৪৩] আবার সুলতান হোসেন শাহের আমলে প্রাপ্ত নয় খানী লিপিতেও মালদা নামের উল্লেখ রয়েছে।[৪৪] আইন-ই- আকবরীতেও মালদা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তখনকার মালদা আসলে বর্তমান পুরাতন মালদাকেই বোঝায়। বহু বিদেশি পর্যটকও মালদায়

এসময় এসেছিলেন। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন লিখেছেন, Malda was a large town, well inhabited and frequented by marchants of the different nations.[৪৫] অপরদিকে রেনেল মালদহের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশংসা করে লিখেছেন Malda is a pretty neat city. This as well as Cossim Bazar is a place trade.[৪৬] ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালদা জেলায় আসার পূর্বেই মালদহের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত মালদা ভৌগোলিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চারদিকে নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত মালদা জেলার নদীপথ ও সড়কপথে বাণিজ্যিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে বহু বিদেশি এখানে বাণিজ্য করতে এসেছেন। কিন্তু সব থেকে শক্তিশালী দেশ হিসেবে ইংরেজরা মালদাতে সর্বপ্রথম বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে ও ১৬৮৬ সালে ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। তবে তারা স্থায়ী ভাবে মালদাতে বাণিজ্য স্থাপন করতে পারেনি। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজবাজারকে কেন্দ্র করে ফ্যাক্টরি স্থাপন করে ফলে তৎকালীন মালদা যা বর্তমানে পুরাতন মালদা নামে পরিচিত তার গুরুত্ব হারাতে থাকে। অবশেষে ১৮১৩ সালে ইংরেজ বাজারকে কেন্দ্র করে মালদা জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটলে পুরাতন মালদার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে।

১৮১৩ এর চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী মালদা জেলা গঠিত হলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৫৯ সালে। এর আগে দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ বামনগোলা থানা এবং রাজশাহীর রোহানাপুর ও চাপাই থানা সহ মোট আটটি থানা নিয়ে মালদা জেলা গঠিত ছিল।[৪৭] এই নতুন প্রকাশিত মালদা জেলার নতুন সদর হল ইংরেজবাজার। ১৮৭৬ থেকে ১৯০৫ সাল অব্দি মালদা জেলা ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৮] ১৯০৫ সালে বাংলা বিভক্ত হলে মালদা জেলাও তখন রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয় যা ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বঙ্গভঙ্গ রোধ হলেও বাংলা রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থেকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশভাগের সময় মালদার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ভারতবর্ষের বিভাজন হলে বাংলা তথা মালদা জেলাও বিভাজনের শিকার হয়। এই সময় উত্তরবঙ্গসহ মালদা জেলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের লোকজন

মালদার হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার মত প্রকাশ করেন। স্যার যদুনাথ সরকার মালদা ও রাজশাহীকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার আবেদন জানিয়ে সীমানা নির্ধারক কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি জমা করেন।[৪৯] ইংরেজবাজার বাদে সমগ্র মালদায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে তাই দেশ ভাগের সময়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মালদা জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই খবর জনসম্মুখে আসতে সমগ্র মালদা জেলা জুড়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক উৎকণ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, কারণ মুসলিম লীগ সহ মালদার মুসলিম লোকজন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে থাকায় ভীষণ আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু প্রধান অঞ্চলের লোকজন মালদার ভারতভুক্তির পক্ষে ছিলেন শেষ পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড ঘোষণার দ্বারা মালদা জেলাকে ১৯৪৭ সালের ১৭ ই আগস্ট ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫০] সেই দিনই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক আদেশ জারি করে মালদা জেলার ১৫ টি থানার মধ্যে দশটি থানাকে কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, মালদা, মানিকচক, হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল, রতুয়া, খরবা (বর্তমান মালতিপুর), হরিশ্চন্দ্রপুর নিয়ে গঠিত মালদা জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হল। আর পূর্বের মালদার ৫ টি থানা নবাবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর অন্তর্ভুক্ত করা হল। ১৯৪৭ এর ১৮ আগস্ট মালদার কালেক্টরেট ভবনে স্বাধীন ভারতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়। মালদা বাসী আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতা পায়। বর্তমানে মালদা জেলার দুটি মহাকুমা (মালদা সদর ও চাচোল), ১৪ টি থানা, ১৫টি ব্লক, ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতি, ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, একটি জেলা পরিষদ, ও দুটি পৌরসভা, ১২টি বিধানসভা কেন্দ্র ও দুটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে।[৫০]

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মালদা জেলার ভূমিকা:

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভারতের অন্যান্য জায়গার ন্যায় মালদা জেলার ও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ থেকে শুরু করে নীলবিদ্রোহ সবগুলিতেই মালদার মানুষ জমিদার, জোতদার ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়েছিল, তবে সেগুলো ছিল বিক্ষিপ্তভাবে। কিন্তু ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জন দ্বারা বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে বাংলার মাটিতে

তীব্র বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার আসে, সেই সূত্র ধরে মালদার মানুষ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সামিল হয়। বঙ্গভঙ্গের দ্বারা মালদা জেলাকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অপরদিকে কার্জনের মনে মুসলিম প্রধান অঞ্চল গঠন করে হিন্দু মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের পরিকল্পনা ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে মালদহ নেতৃবৃন্দ যথা রাঁধেশচন্দ্র শেঠ, বিনয় কুমার সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, প্রাণ কৃষ্ণ ভাদুড়ী, মোহাম্মদ নূরবক্স প্রমুখ ব্যক্তিরা আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৫২] বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য সভা সমিতির আয়োজন করা হয়। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন মালদার সর্বোচ্চ শ্রেণীর মানুষ শিক্ষক, উকিল, ছাত্র সমাজ সকলে সামিল হয়। বঙ্গভঙ্গের ক্ষোভে উদ্বুদ্ধ মালদাবাসীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন গভর্নর ব্যমফিল্ড ফুলার মালদহে আসেন। স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মালদহের ছাত্ররা এক আনা করে দিয়ে ‘স্টুডেন্ট আনা ফান্ড’ গঠন করে এবং সেই অর্থ দিয়ে স্বদেশী জিনিসপত্র বিক্রি করে।[৫৩] দ্য মুসলমান পত্রিকাতেও মালদায় অনুষ্ঠিত স্বদেশী সভার বর্ণনা রয়েছে। এই সভাগুলিতে প্রায় অর্ধেক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।[৫৪] স্বদেশী আন্দোলন পর্বে মালদার হিন্দু মুসলমান ঐক্য দেখা দেয়, ব্যমফিল্ড ফুলার এই ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করলে মালদা বাসী ব্যাপক বয়কট আন্দোলন শুরু করে। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশী বস্ত্র বয়কট, বিদ্যালয় বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার শুরু করে। এই সময় দেশীয় শিক্ষার জন্য বিনয় সরকারের উদ্যোগে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রধান সভাপতি হন প্রাণ কৃষ্ণ ভাদুড়ি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুরুষদের সাথে মহিলারাও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়। এই সময় বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিন সর্বত্র অরন্ধন পালিত হয় ও মালদার নারীরা রাখি বন্ধন উৎসবের শামিল হয়ে বয়কট আন্দোলন জোরদার করে। যদিও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী পর্বে মুসলিম পরিবারের মেয়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কোন চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হলে তার ঢেউ বাংলাতেও আছড়ে পারে। এই সময় লালা লাজপাত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের কলকাতা

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়[৫৫] এবং কোন রকম বিরোধিতা ছাড়াই গান্ধীজীর প্রস্তাব চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপাত রায়, মদনমোহন মালব্য সহ অনেকেই গ্রহণ করে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে এটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৫৬] নারী পুরুষ হিন্দু মুসলিম কৃষক শ্রমিক ছাত্র-ছাত্রী সকল শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতিতে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। খিলাফত আন্দোলনের সাথে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যুক্ত হওয়ায় আন্দোলনের গতিবৃদ্ধি পায়। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কলেজ বয়কট করে, উকিল আদালত বয়কট করে, মদের দোকান, বিদেশি দ্রব্যের দোকানের সামনে পিকেটিং শুরু হয় এবং মানুষ দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত হয়।[৫৭]

ভারতের সর্বত্র অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তার ঢেউ মালদা জেলাতেও দেখা দেয়। অসহযোগ আন্দোলনের সাথে খেলাফত আন্দোলন যুক্ত হওয়ায় হিন্দু মুসলিম সকল ধর্মের মানুষ এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। মালদহের সরকারি অফিস, আদালত, স্কুল কলেজে বিদেশি দ্রব্য বয়কট শুরু হয়। এই সময় মালদা জেলা কংগ্রেস দেশীয় পদ্ধতিতে শস্য চাষ, মাদকদ্রব্য বর্জন, বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন করে। ফকীর সরকার নামে এক ব্যক্তি সামসীর কাছে একটি স্বদেশী দ্রব্য তৈরির মিল স্থাপন করেন।[৫৮]

মালদায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, কলিগ্রাম, নবাবগঞ্জ, কালিয়াচক ইত্যাদি। এই সময় মালদহের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ হলেন বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, ভুপেন্দ্র কৃষ্ণ মিশ্র, শচীন্দ্রনাথ মিশ্র, চারুচন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র ঘোষ, সুধারানী মিশ্র, বিপিনবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণগোপাল সেন ও তার স্ত্রী তরুবালা সেন, সরযু প্রসাদ বিহানি প্রমুখ।[৫৯] অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেহেতু স্কুল কলেজ বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তাই স্বদেশী স্কুল কলেজ স্থাপনের প্রবণতা দেখা যায়। এই সময় মালদায় ১৯২১ সালে জাতীয় শিক্ষা মন্দির স্থাপিত হয় এবং কলিগ্রামে আরো একটি স্কুল স্থাপিত হয়।[৬০] মালদা জেলার বিশিষ্ট আইনজীবী বিপিনবিহারী ঘোষ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের সঙ্গে যুক্ত হন।[৬১] ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন দাস যখন মালদায় আসেন তিনি মালদাহের জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন।[৬২] গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে মালদা বাসী অসহযোগ আন্দোলনের ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সময় তারা মকদমপুরে 'স্বরাজকুঠির' নামে একটি স্বদেশে চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৯২২ এর আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে জেলা কংগ্রেস নেতা সত্য রঞ্জন সেনের উদ্যোগে শহরে খাদি ভান্ডার স্থাপিত হয়। এই সময় মালদাবাসী খদ্দের কাপড় পড়ার রেওয়াজ চালু করে।[৬৩]

গান্ধীজি ১৯৩০ এর ১২ই মার্চ গুজরাটের সবরমতি আশ্রম থেকে নারী-পুরুষ সহ ৭৮ জনকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলে সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত হয়ে লবণ তৈরির মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করলে,[৬৪] সেই সূত্র ধরে মালদাতেও আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৩০ এর ১২ই মার্চ আশুতোষ কুমার আড়াই ডাঙ্গায় একটি জনসভার আয়োজন করেন এবং গান্ধীজীর সফলতা কামনা করেন। এই সভায় জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছাত্র ও যুবসমাজকে দেশ ও জাতির জন্য সংঘটিত হওয়ার আহ্বান জানান।[৬৫]

১৯৩০ এর ১২ই মার্চ ব্রিটিশ সরকার সমস্ত রকম সভা সমিতি মিটিং মিছিল বন্ধের জন্য ১৪৪ ধারা চালু করে। এই সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে মালদায় সুবোধকুমার মিশ্রকে গ্রেফতার করে ও তার ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়।[৬৬] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র ইংরেজবাজারের ২০০ জন ভলেন্টিয়ার্স নিয়োগ করে পিকেটিং এর জন্য।[৬৭] মালদা জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্থানীয় জমিদার ব্যবসায়ীদের বিদেশি দ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে পেরে তাতে রাজি হয়।[৬৮] পিকেটিং এর জন্য মালদা অক্রূরমণি করণেশন স্কুল ও চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউট ছাত্রদের ব্যাপক পুলিশে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কংগ্রেস ভলেন্টিয়ার্সদের বিক্রি করা লবণ কিনতে সাধারণ মানুষের আগ্রহ দেখা যায়। এর জন্য পুলিশ ১২ জন ভলেন্টিয়ার্স কে গ্রেফতার করে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ সালে গান্ধীজীর নির্দেশে যখন আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয় মালদহবাসীর মধ্যে চরম হতাশা নেমে আসে।[৬৯] মালদায় যে সমস্ত যুবকরা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল তারা হলেন ক্ষিতীশ চৌধুরী, নরেন্দ্র চক্রবর্তী, বাঙ্গিটোলা গ্রামের

ভূপেন্দ্রনাথ ঝা ও নৃপেন্দ্রনাথ ঝা, ভালুকার দ্যুতিধর রায় ও তার স্ত্রীর সুরেন্দ্রবালা রায়, এছাড়াও শহর গ্রামে বহু নারী-পুরুষ, ছাত্র, যুবক সকলে আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর যখন সারা ভারতবর্ষে গান্ধীজির ডাকে ভারতছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয় ঠিক তখনই মালদাতেও ভারতছাড়ো আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে মালদার সাধারণ মানুষ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। মালদায় ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল ইংরেজবাজার, হরিশ্চন্দ্রপুর, ভালুকা, সিংহাবাদ, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, হবিবপুর, আদিনা প্রভৃতি। সাধারণ মানুষ ১৯৪২ এর ৯ মার্চ মালদা শহরে বিশাল মিছিলের আয়োজন করে ও মিছিলে স্লোগান তোলে ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। মিছিলের শেষে বক্তৃতা দেওয়ার সময় কালীরঞ্জন দাস ও দেবেন ঝাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর আন্দোলনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন রামহরি রায়। তিনি তার মকদমপুরের বাড়ি থেকে আন্দোলন চালানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেন ও মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় কেরোসিন ও পেট্রোল লাগিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। মিটিংয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পুলিশ রামহরি রায়কে গ্রেপ্তার করলে তার স্ত্রী উমা রায় আন্দোলনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। সিংহাবাদ রেলস্টেশনসহ হরিশচন্দ্রপুর, ভালুকা, কুমেদপুর প্রভৃতি জায়গায় রেলস্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সাংবাদিক সুধীর চক্রবর্তীকেও সেই সময় গ্রেফতার করা হয়।[৭০]

১৯৪২ এর আগস্ট এর মাঝামাঝি সময়ে দ্বিগেন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য মকদমপুরে গোরাঙ্গ মিশনের ব্যবস্থা করে আন্দোলন চালানোর মনস্থির করেন। সারা মালদা জেলায় আন্দোলন চালানোর কর্মসূচি গৃহীত হয়। শ্রী বিজয় কুমার দাশগুপ্ত, কালিরঞ্জন দাস, ধীরেন্দ্রনাথ পোদ্দার শিবগঞ্জ ও গোমোস্তাপুরের দায়িত্বে ও রমেশচন্দ্র বাগচি ও রমেশ চন্দ্র ঘোষ নবাবগঞ্জের আন্দোলন চালানোর দায়িত্বে ছিলেন। ছাত্ররা মিছিলের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করে। জেলা স্কুলের ছাত্র বিনয় সাহা ও দৈবেন্দ্রনাথ সেনকে পুলিশ গ্রেফতার করে ও দু মাসের কারাদন্ডে দণ্ডিত করে।[৭১] আন্দোলন কর্মসূচীর মূলমাথা ভালুকা ও হরিশ্চন্দ্রপুরের সত্যরঞ্জন সেন নিজেকে পুলিশের দৃষ্টি

এড়িয়ে সাদুল্লাপুরে গৃহবন্দী রাখেন। এখান থেকেই তিনি পরবর্তী বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দিগেন্দ্র নারায়ণ ও উপেন্দ্রনাথ ঝাকে নিয়ে তিনি পড়ে কাহালাতে আশ্রয় নিলে গ্রামবাসীদের প্রতারণায় পুলিশের কাছে ধরা পড়েন।[৭২]

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মালদা জেলার ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই মালদহের ইংরেজবাজার বাদে অন্যান্য অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের আধিক্য রয়েছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দেখা গেলেও ব্রিটিশ শাসকদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেওয়া। তাই সেই সময় মুসলিম লীগ গঠনকে উৎসাহ দেওয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলন পর্বে খেলাফত সমস্যা যুক্ত হওয়ায় মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের সম্পূর্ণভাবে দূরে রাখতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীতে আইন অমান্য ও ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় মালদার মুসলিম সমাজ নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব জেলার কালিয়াচক, সুজাপুর, ইংরেজবাজার ও নবাবগঞ্জ থানার মুসলিম সম্প্রদায় এই আন্দোলনে কোন অংশগ্রহণ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে সাতটি প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পদত্যাগ করায় মুসলিম লীগ নেতৃত্বরা খুব খুশি হয় ও ঐ দিনটিকে মুক্তি দিবস হিসেবে পালন করে। এই সময় মালদা জেলা মুসলিম লীগ সদস্য ছিলেন জহুর হোসেন, আব্দুল গনি, আব্দুর রহমান, রইসউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।[৭৩]

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মালদা জেলার নারী সমাজের ভূমিকা:

১৯ শতকের প্রচলিত সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারী সমাজের মধ্যে আধুনিকতার জাগরণ ঘটতে শুরু করে। শিক্ষা সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কারের ঢেউ নারী জীবনকে নতুন চেতনায় উজ্জীবিত করে। তারই ফলে নারী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। উপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক কাজকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা ও ভারতকে স্বাধীন করা। ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যেই ভারতীয় নারী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, মালদা জেলাও তার ব্যতিক্রম

নয়। খুব কম সংখ্যক হলেও মালদা জেলার নারীরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মালদার কালিয়াচক থানার সুধারানী মিশ্র, বাচামারি গ্রামের তরুবালা সেন, সুরেন্দ্র বালা রায়, উমা রায় প্রমুখ ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পর্বে স্বদেশী আন্দোলনে মালদার নারীরা অংশগ্রহণ করলেও প্রথম সারিতে তাদের নাম উঠে আসে না। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পর্বে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে বহু নারী আন্দোলনের সামিল হয়। এই সময়ে মালদার কালিয়াচকের শেরশাহীর জমিদার পরিবারের গৃহবধূ শুধারানী মিশ্র জাতীয় কংগ্রেসের যোগদান করেন। তিনি কখনোই বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতেন না। তিনি নিজে গৃহে চরকার প্রবর্তন করেন এবং স্থানীয় মেয়েদের হাতের কাজ, সেলাই ফোর ইত্যাদির কাজে লিপ্ত রাখতেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি নিজ হাতে তৈরি খদ্দর গান্ধীজিকে উপহার দেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের বহু গোপন বৈঠক তার জমিদার বাড়িতে আয়োজিত হতো। বহু বিপ্লবী সুধারানী দেবীর কাছে খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ সাহায্য পেত। একবার তিনি কংগ্রেস নেতা ভূপেন ঝা কে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেন। পরে অবশ্য ভূপেন ঝা ও দেবেন ঝা পুলিশের কাছে ধরা পড়ে ও বিচারে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া।[৭৪]

অসহযোগ আন্দোলনে আরও এক নারী সৈনিক হলেন বাচামারি গ্রামের কৃষ্ণ গোপাল সেনের স্ত্রী তরুবালা সেন। তিনি পুরাতন মালদা ও ইংরেজবাজার এলাকায় বিদেশী দ্রব্য বর্জন, মাদক বর্জন, পিকেটিং ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার, চরকা ও খাদির প্রচলন করে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।[৭৫]

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় নারীর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এই পর্বে ভালুকার দ্যুতিধর রায়ের স্ত্রী সুরেন্দ্রবালা রায়ের নাম বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। সেই সময় মালদা জেলা কংগ্রেসের সাথে দিনাজপুর কংগ্রেসের গোপন যোগাযোগ থাকত। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রবালা নিজেও দিনাজপুর আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। মুক্তি পাওয়ার পরেও তিনি গোপনে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতে থাকেন। সেই সময় নারীদের বাড়ির বাইরে বেরোনো

ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়ে কাজ করা অপরাধ বলে মনে করত। সুরেন্দ্রবালা দেবী তার সাহস ও উৎসাহের জন্য জেলা কংগ্রেস সভানেত্রীর দায়িত্ব পান এবং তিনি মালদহে লাবণ্যলতা চন্দ্রের সহযোগিতায় কংগ্রেস মহিলার সংঘ স্থাপন করেন। এই সংঘ মহিলাদের গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করে। এর মহিলা সদস্যদের লাঠি খেলা ও ছোরা খেলা ও বাঘ নাখের দ্বারা আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালে মালদা জেলা মহিলা সংঘের সভানেত্রী ছিলেন সুরেন্দ্রবালা ও সম্পাদিকা উমা রায়।[৭৬] একসময় এই সংঘের ডাকে সুভাষচন্দ্র বসু তার নারী ভলেন্টিয়ার্স বিজলিপ্রভা দেবী, অতুল কুমারের স্ত্রী মহামায়া দেবী, মহাদেব কুমারের স্ত্রী ও অন্যান্যদের নিয়ে জেলা কৃষক কনফারেন্সে যোগদানের জন্য নঘরিয়া স্কুলে আসেন।[৭৭] শুধু তাই নয় এই সংঘ মালদা জেলার গ্রামোন্নতি, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, খাদি ও চরকার প্রচলন প্রভৃতি কর্মসূচির দ্বারা নারী সমাজের মনে দেশের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করেন। এছাড়া যে সব মহিলা কংগ্রেস সংঘের সদস্য ছিলেন তারা হলেন গঙ্গামনি ব্যানার্জি, সুপ্রভা সেন, সাবিত্রী গোস্বামী, কমলা মৈত্র, হেনা চক্রবর্তী প্রমুখ।

এ বিষয়ে একটি কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, মালদা জেলার প্রায় অর্ধেক মুসলিম ধর্মাবলম্বীর মানুষ হওয়া সত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ একেবারেই দেখা যায় না। হিন্দু ধর্মে নারীদের অংশগ্রহণ সামান্যতম দেখা গেলেও তারা বেশির ভাগই রাজনৈতিক পরিবার থেকে আগত, কারো স্বামী বা পিতা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শামিল ছিল। খুব সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ মালদা জেলার প্রেক্ষিতে একেবারেই নগন্য।

স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি ও মুসলিম নারীর অংশগ্রহণঃ

১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের স্বাধীনতা আইন পাস করে ভারতকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে মুক্তি দিলেও মালদাহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ জেলাগুলি তখনও পাকিস্তানি সৈন্য মোতায়েন ছিল এবং খবর হয়েছিল এই তিনটি জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেই মুহূর্তে মালদহের মানুষ ভীষণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিল এবং দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট বিখ্যাত র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণা দ্বারা রাজশাহী জেলার কয়েকটি থানা বাদে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত করা হয়। মোট ১০ টি থানা কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, মালদা, মানিকচক, হবিবপুর, বামন গোলা, গাজোল, রতুয়া, খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর নিয়ে গঠিত হয় মালদা জেলা এবং ১৮ই আগস্ট মালদার কালেক্ট রেট ভবনে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট প্রকৃত অর্থে মালদা বাসী স্বাধীনতা পেল।[৭৮]

স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গের মত মালদা জেলার রাজনীতিতে বড় সমস্যা হল উদ্বাস্তু সমস্যা। স্বাধীনোত্তর কালে দেশভাগের সাথে সাথে বাংলাও ভাগ হয়ে যায়। মালদা জেলার পাঁচটি থানা মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন এপারে বর্ধিষ্ণু মুসলিম পরিবারগুলি ক্ষমতা লাভের আশায় ওপার বাংলায় চলে যায়, ঠিক সেই ভাবেই ওপার বাংলায় থাকা হিন্দু পরিবার গুলি পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদের প্রাণের সংশয় অনুভূত হওয়ায় এপার বাংলায় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের চলে আসে। ১৯৫৪ সালে আগত মালদা জেলায় উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ৬৩,৫০০,[৭৯] তারা বামনগোলা, হবিবপুর, মালদায় এসে হাজির হয়। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য মালদা শহরে ১ন, ২নং ও ৩নং গভঃকলোনি গুলি গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও তারা সাহাপুর, মঙ্গলবাড়ী, মুচিয়া, বাচামারি এলাকায় বসবাস শুরু করে। এছাড়াও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সহ মালদা জেলাতেও তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এর দায় এসে পড়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ওপর। খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করার জন্য তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ থানা কর্ডনিং ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু তিনি মজুতদারদের সৃষ্ট কৃত্রিম খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে পারেননি, যার প্রভাব পরবর্তী নির্বাচনে পড়তে দেখা যায়।

স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার রাজনীতি ছিল মূলত নির্বাচন কেন্দ্রিক। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে থাকে, এই সময় প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল জাতীয় কংগ্রেস ও মার্কসবাদ কমিউনিস্ট পার্টি। এছাড়াও স্বাধীনোত্তর কালে ফরওয়ার্ড ব্লক,

ওয়ার্কাস পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কখনো আদর্শগত কারণে আবার কখনো শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য এককভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে, সেই মত মালদা জেলাতেও প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মালদা জেলায় কংগ্রেস আবারও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাই। তবে এই সময় বিরোধীদল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী শ্রীমতি রেনুকা রায় বিজয়ী হন, তিনি সমগ্র মালদা জেলার মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ পদ লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে পরবর্তী সময়ে দেশ ও রাজ্যের রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মালদা জেলার রাজনীতি ও প্রভাবিত হয়। ১৯৬২ সালে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। গান্ধীবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এর সময় বিরোধীপক্ষের আন্দোলন, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ফলে রাজ্যের রাজনীতির সাথে জেলার রাজনীতি ও প্রভাবিত হতে থাকে। তার সাথে যুক্ত হয় খাদ্য সংকট, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ধান চালের কর্ডনিং ও রেশনের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্য বন্টনের ব্যবস্থা করলেও মজুতদারদের কৃত্রিম খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে পারেনি। খাদ্য সংকট প্রসঙ্গে সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লেখেন স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা বাড়িতে ভাত পায় না, রেশনিং এর নামে ভন্ডামি চলছে। রাজ্যে ধান চাল সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, মানুষ কতদিন এই অনাচার অত্যাচার সহ্য করবে?[৮০] এর দ্বারা তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশিত হয়।

১৯৬৭ সালের বিধানসভা ও লোকসভা একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এই সময় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিশাল নির্বাচনী কর্মসূচি গ্রহণ করে সবকটি দলই নিজের দলের ফলে প্রচার চালাতে থাকে। এই সময় রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আধিক্য দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের

সমর্থনে জ্যোতি বসু মালদা টাউন হলে বিশাল জনসভায় স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন।[৮১] শেষ পর্যন্ত কুড়ি বছরের কংগ্রেস সরকারকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা দখল করে। যদিও ১৯৬৭ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মালদা জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, লোকসভা কেন্দ্রটি ও কংগ্রেসের দখলে থাকে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সিপিএম কৃষক সংগঠনগুলি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬৯ সালে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এলেও তা বেশিদিন টেকেনি। ১৯৭১ ও ১৯৭২ পরপর দুবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার পরাজিত হয়, এই সময় রাজ্যে বামপন্থী দলগুলির সমন্বয়ে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এরপর দীর্ঘ ৩৪ বছর বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের রাজত্ব করেন। ১৯৭৭ সালে মালদা থেকে নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে রাজ্য মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন শৈলেন সরকার। এরপর ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘ ৩৪ বছরের ক্ষমতায় থাকা বামফ্রন্ট সরকারের অবসান ঘটে ও সম্পূর্ণ নতুন একটি দল ক্ষমতা ভোগ করে।

দেশ ও রাজ্যের রাজনীতি মালদা জেলার রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করলেও তা মালদা জেলায় নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যেহেতু এই অধ্যায়ে মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে আমরা কতগুলি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে মালদা জেলার রাজনীতিতে মুসলিম নারী অংশগ্রহণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছি। উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে মালদা জেলার রাজনৈতিক দলগুলি কখনোই মহিলাদের বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কোন রূপ উৎসাহিত করে নি। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত জেলা গুলির মধ্যে অন্যতম মালদা জেলা। ২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মালদা জেলার মোট জনসংখ্যা হল ৩৮,৮৮,৮৪৫ জন, যার মধ্যে প্রায় ৫১.২৭ শতাংশ মুসলিম জনগণ এবং বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগণের অর্ধেক নারী। এই বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর নারী সম্প্রদায়ের উন্নতি ব্যতীত সমগ্র জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। নারীর নিজের দাবি দাবা চাহিদার কথা জনসম্মুখে

আনার জন্য রাজনীতির মূল স্রোতে আসা প্রয়োজন। স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার বিধানসভা নির্বাচনের ফলের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ কতখানি ছিল।

সারণি ৩৬

বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম মহিলা প্রতিনিধির পরিসংখ্যায়ন (১৯৫২-২০১৬)

সাল	মোট আসন সংখ্যা	বিধান সভায় মুসলিম মহিলা প্রতিনিধি	শতকরা পরিসংখ্যান
১৯৫২	৯	-	০
১৯৫৭	৯	-	০
১৯৬২	৯	-	০
১৯৬৭	১০	-	০
১৯৬৯	১০	-	০
১৯৭১	১০	০১	০.০১
১৯৭২	১০	-	০
১৯৭৭	১১	-	০
১৯৮২	১১	০১	০.০১
১৯৮৭	১১	০১	০.০১
১৯৯১	১১	০২	০.০২
১৯৯৬	১১	০২	০.০২
২০০১	১১	০২	০.০২
২০০৬	১১	০২	০.০২
২০১১	১২	০৩	০.০৩
২০১৬	১২	০২	০.০২

(উৎস: রূপান্তরের পথে সংবাদপত্র ও সমর কুমার মিশ্র, *স্বাধীনোত্তর কালে মালদহ জেলার রাজনীতি ও নির্বাচন,* কলকাতা, অক্ষরবিন্যাস, ২০২১, পৃ. ৯৪-১৪৯ থেকে সংগৃহীত)

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার যে স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম আট বছর কোন মুসলিম মহিলা প্রার্থী ছিল না। ১৯৫২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত স্বাধীনতার ৬৪

বছর সময়কালে মোট ১৬টি বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ওই সময়কালের মোট আসন সংখ্যা ছিল ১৬৮টি। এই আসন সংখ্যার নিরিখে পুরুষ প্রার্থীরা ১৫৩ আসন ও মহিলা প্রার্থীরা মাত্র ১৫ টি আসনে জয় লাভ করে এবং এর মধ্যে আটটি আসন দখল করে মুসলিম মহিলা প্রার্থীরা। ১৯৮৭ ও ১৯৯১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মমতাজ বেগম দুইবার জয়ী হয়। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৬ সালের নির্বাচনে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গনি খান ভগিনী রুবি নূর চারবার জয়ী হন। ২০০৮ সালে তিনি মারা গেলে একই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয় এবং তার কন্যা মৌসুম নূর জয় লাভ করেন। পরে অবশ্য তিনি লোকসভা প্রার্থী হওয়ায় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২০১১-২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সাবিনা ইয়াসমিন মোথাবাড়ি কেন্দ্র থেকে দুবার জয়লাভ করেন। এই সকল মহিলাপ্রার্থীরা কোন না কোন ভাবে পারিবারিক সূত্রে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত।[৮২]

১৯৫২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ১৭ টি লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে মালদা জেলায় দুটি লোকসভা কেন্দ্র (উত্তর মালদা ও দক্ষিণ মালদা), তবে ২০০৯ এর আগে পর্যন্ত একটি লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্র ছিল। তবে লোকসভা কেন্দ্রগুলির আয়তন বিভিন্ন সময় বদলেছে।

সারণি ৩৭

লোকসভা নির্বাচনে মালদা জেলার মুসলিম মহিলা প্রতিনিধির পরিসংখ্যায়ন (১৯৫২-২০১৯)

সাল	কেন্দ্র সংখ্যা	মুসলিম মহিলা প্রতিনিধি
১৯৫২	১	-
১৯৫৭	১	-
১৯৬২	১	-
১৯৬৭	১	-
১৯৭১	১	-
১৯৭৭	১	-
১৯৮০	১	-
১৯৮৪	১	-
১৯৮৯	১	-
১৯৯১	১	-
১৯৯৬	১	-
১৯৯৮	১	-
১৯৯৯	১	-
২০০৪	১	-
২০০৯	২	১(জয়ী)
২০১৪	২	১(জয়ী)
২০১৯	২	১ (পরাজিত)

(উৎস: *রুপান্তরের পথে* সংবাদপত্র ও সমর কুমার মিশ্র, *স্বাধীনোত্তর কালে মালদহ জেলার রাজনীতি ও নির্বাচন*, কলকাতা, অক্ষরবিন্যাস, ২০২১, পৃ. ১৫৬-১৬৯ থেকে সংগৃহীত)

সারণীতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ১৯৫২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনে কোন মুসলিম মহিলা প্রার্থী প্রতিনিধিত্ব করেনি। ২০০৯ সালে লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দুটি হয় এবং উত্তর মালদা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে মৌসুম নূর, বর্ষীয় নেতা শৈলেন সরকারকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জয় লাভ করেন। ঠিক পরের ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে মৌসম নূর পুনরায় উত্তর মালদা কেন্দ্র থেকে মহিলা প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। তিনি প্রথম মালদা জেলার মুসলিম মহিলা যিনি সংসদ হয়েছেন এবং নারী জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে মৌসুম নূর মহিলা প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেন এবং খগেন মুর্মুর কাছে পরাজিত হন।[৮৩] তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে লোকসভা নির্বাচনে পুরো মালদা জেলা থেকে মুসলিম মহিলা প্রার্থী শুধুমাত্র একজনই হয়েছেন।

শাসনব্যবস্থার তৃণমূল স্তর হল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন পাস হয়, কিন্তু বাস্তবে গুরুত্ব সহকারে এই আইন প্রণয়ন হয় ১৯৭৭ সালে এবং প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৮ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৯টি পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯২ সালের ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকরী হয় এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব আবশ্যিক করার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়। ৭৩তম সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি ও মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিনটি স্তর হল- জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত। জেলা পরিষদ হল সর্বোচ্চ স্তর। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেহেতু জনগণ নিজ নিজ এলাকার প্রার্থীদেরই নির্বাচিত করে থাকেন তাই জনগণের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে প্রচন্ড উন্মাদনা থাকে। নিম্নে কয়েকটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মুসলিম মহিলা প্রতিনিধির বিবরণ দেওয়া হল।

১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত জেলা পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম মহিলা প্রার্থী সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে। তথাপি জানা যায় যে ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েতের জেলা পরিষদ নির্বাচনে শেফালী

খাতুন বিজয়ী হয়ে সহকারী সভাধিপতি এবং ১৯৯৮ সালে পুনরায় তিনি বিজয়ী হয়ে সভাধিপতি পদ লাভ করেন।

২০০৩ ষষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৩ টি। এই আসন সংখ্যার নিরিখে মুসলিম মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র সাতটি, যা অনেক কম। বেশিরভাগ আসন পুরুষ প্রার্থীরাই দখল করেছে। ১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির অঞ্চলের মধ্যে মাত্র তিনটিতে মুসলিম মহিলা প্রতিনিধি বিজয়ী হয়ে আসন দখল করতে পেরেছেন। তারা হলেন আংগেজ বানু সহ-সভাপতি (হরিশ্চন্দ্রপুর) এবং ইসমাতারা সহ-সভাপতি (কালিয়াচক১) ও নৌবাহার খাতুন সহ-সভাপতি (কালিয়াচক ২) নির্বাচিত হয়েছেন।[৮৪] ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বেশিরভাগ আসন পুরুষ প্রার্থীদের দখলেই চলে যায়। জেলা পরিষদের বিজয়ী প্রার্থী ছিলেন শ্রীমতি গুল রৌশন সহকারি সভাধিপতি নির্বাচিত হন।

২০০৮ সপ্তম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের ৩৪ টি আসনের মধ্যে মুসলিম মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল তিনটি। পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে মুসলিম মহিলা প্রার্থীর যোগদান খুব কম ছিল। জেলা পরিষদের বিজয়ী প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন সভাধিপতি নির্বাচিত হন।

২০১৩র অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদে ৩৮ টি আসনের মধ্যে মুসলিম মহিলা জয়ী হয়েছেন ৯ জন। এরা হলেন দিলরুবা ইয়াসমিন (গাজল), মর্জিনা খাতুন (হরিশ্চন্দ্রপুর ১), শাবানা পারভিন (হরিশ্চন্দ্রপুর ২), নুরেখা বিবি (চাঁচল ১), রেহানা পারভীন (চাঁচল ২), আয়েশা খাতুন ও মমতাজ বেগম (রতুয়া ১), শ্রীমতি দিলেরাখানাম (রতুয়া২), জেসমিন আরা খাতুন (ইংরেজবাজার) প্রমুখ। পঞ্চায়েত সমিতির ৪৩২ টি আসনের মধ্যে মুসলিম মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র ৬ জন, যা আসন সংখ্যার নিরিখে নিতান্তই নগণ্য। ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২৮১ টি আসনের মধ্যে মুসলিম মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও খুব কম ছিল।

২০১৮ নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনের জেলা পরিষদের ৩৭ টি আসনের মধ্যে মুসলিম মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র ৭ জন। পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজয়ী হয়ে সহসভাপতির আসন দখল করেছেন মাত্র আটজন। গ্রাম পঞ্চায়েতেও মুসলিম মহিলারা খুব কম সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করতে পেরেছে।

মালদা জেলায় নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের অবস্থান:

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবন তৈরি হয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকের যুগে রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ, অসাম্য দূর করতে পারে ও লিঙ্গ সমতা, সমকাজের সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমতা, শাসনের সমতা প্রদান করতে পারে। ভারতের মত দেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য সংবিধানিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নারী বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরাঞ্চলের নারীরাও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়।[৮৫] এ ব্যাপারে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পরিবর্তন হয় নি। বিংশ শতকে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি সমাজের কোন সহানুভূতি নেই।[৮৬]

ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া বা রেনেসাঁস ঘটেছিল। তাই নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহনেও উৎসাহ প্রদান করা হয়। এখানে আমরা মালদা জেলার সমীক্ষা ক্ষেত্রগুলি থেকে মুসলিম নারীদের নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে ও মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করি। মুসলিম নারীর অবস্থান, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি কারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা চালিত হয়। এখানে আমি সমীক্ষা ক্ষেত্র কালিয়াচক ১, ইংলিশবাজার (পৌরএলাকা), মানিকচক, রতুয়া ১ থেকে নির্বাচিত মুসলিম নারীদের দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা সংগ্রহ করি।

সারণি ৩৮

সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিত মুসলিম মহিলা প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অবস্থান

প্রতিনিধিদের স্তর	প্রিতিনিধিদের সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা	আসন মনোনয়ন	বৈবাহিক অবস্থান	পারিবারিক আয়/ স্বামীর কাজের ধরন	সন্তান সংখ্যা
জেলা পরিষদ (সদস্য)	দ্বিতীয়	মাধ্যমিক	সংরক্ষিত	বিবাহিত	ব্যবসা	২
পঞ্চায়েত সমিতি (সদস্য)	প্রথম	মাধ্যমিক	সংরক্ষিত	বিবাহিত	ব্যবসা	১
পঞ্চায়েত সমিতি (সদস্য)	দ্বিতীয়	উচ্চ মাধ্যমিক	সংরক্ষিত	বিবাহিত	ব্যবসা	২
পঞ্চায়েত সমিতি (সদস্য)	তৃতীয়	নবম শ্রেনী	সংরক্ষিত	বিবাহিত	অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী	৪
গ্রাম পঞ্চায়েত (প্রধান)	প্রথম	অষ্টম শ্রেনী	সংরক্ষিত	বিবাহিত	ব্যবসা	২
গ্রাম পঞ্চায়েত (সদস্য)	দ্বিতীয়	উচ্চ মাধ্যমিক	সংরক্ষিত	বিবাহিত	ব্যবসা	২
গ্রাম পঞ্চায়েত (সদস্য)	দ্বিতীয়	মাধ্যমিক	সংরক্ষিত	বিবাহিত	ব্যবসা	১

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (৫ই সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩)।

উপরোক্ত সারণিতে নির্বাচিত মুসলিম মহিলা জনপ্রতিনিধিদের বৈবাহিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় এবং সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিই বিবাহিত ছিলেন। নির্বাচিত যে সকল মুসলিম মহিলা প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তারা সকলেই স্বামী, সন্তান সহ অন্যান্য সংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে পরিবারের কাজকর্ম, সন্তান প্রতিপালন সব কিছু সামলে পঞ্চায়েতের কাজের জন্য

সময় বার করে নিতে হয়। ফলে তারা গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতের কাজের জন্য কতটা মননিবেশ করতে পারেন তা আলোচনা সাপেক্ষ।

এছাড়াও সারণি থেকে বোঝা যাচ্ছে মালদা জেলার সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত নির্বাচিত মুসলিম মহিলা প্রতিনিধিদের অধিকাংশই সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত এবং প্রথমবারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন এমন সদস্যের সংখ্যা অনেক কম। বেশিরভাগ প্রতিনিধি দ্বিতীয়বারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন এবং যিনি সাধারণ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন তিনিও প্রথমবার সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন পেয়েছিলেন। আর যারা সংরক্ষিত আসনে দ্বিতীয়বারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন, সেই আসনটি তপশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সমীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে তৃতীয়বারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন ও নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র একজন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে আসন সংরক্ষিত হোক বা সাধারণ কোন রাজনৈতিক দলই কোন একজন নারীকে বারংবার মনোনয়ন দিতে ইচ্ছুক নয়। ফলে বহু অভিজ্ঞ নেত্রীকে রাজনৈতিক দলগুলি মনোনয়ন না দেওয়াই রাজনীতি থেকে বিচ্যুত হতে হচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলির নতুন নতুন মুখ রাজনীতিতে আনার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে রাজনীতিতে নতুন মুখ এনে চমক দেখানোর চল শুরু হয়েছে। অভিজ্ঞ নেত্রীদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণটি পুরুষদের একচেটিয়া অধিকারের রাখার প্রবণতা দেখা যায় যা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচায়ক। নবাগত নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা পরিবারিক দায়-দায়িত্ব সামলে রাজনীতিতে কতখানি সময় দিতে পারছে তাও দেখা দরকার।

উপরের তালিকাটিতে নির্বাচিত মুসলিম মহিলা প্রতিনিধিদের অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায়। সারণীতে দেখা যাচ্ছে সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত মুসলিম মহিলা প্রতিনিধিদের অধিকাংশেই স্বামী ব্যবসায়ীক কাজ কর্মের সাথে যুক্ত, শুধুমাত্র একজনের স্বামী অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী। অতএব বোঝা যাচ্ছে ব্যবসায়ী পরিবার থেকে আগত মুসলিম মহিলা প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হওয়ার পর তার পরিবারের আর্থিক সহযোগিতা করতে সম্ভব হয়েছে, নিজে স্বনির্ভর হয়েছে। শুধু সংসার সামলানো ও সন্তান প্রতিপালনে একজন নারীর সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই আর্থিক

স্বনির্ভরতা দ্বারা নারী স্বাবলম্বী হয়েছে এবং সে নিজের মতামত জনসম্মুখে রাখার সাহস জুগিয়েছে, যা তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

মালদা জেলার যে সকল মুসলিম মহিলা জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমীক্ষা করা হয়েছে তারা বেশিরভাগ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ায় তাদের সবথেকে বড় কর্মসূচি হলো এলাকার নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি, নারীর সমস্যাবলির সমাধান ও পরিষেবা দান। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় একজন প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রথম কাজ হল এলাকার লোকেদের পাশে দাঁড়ানো ও তাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন। কিন্তু সমীক্ষা চলাকালীন নির্বাচিত মুসলিম মহিলা প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করলে তারা জানান অনেক সময় গ্রামের মানুষ কোন সমস্যার সমাধানের জন্য তাদের মহিলা প্রতিনিধির কাছে না এসে কোন পুরুষ প্রতিনিধির কাছে যান। যে সব মুসলিম মহিলা প্রতিনিধির সাক্ষাৎ নেওয়া হয়েছে তাদের সাত জনের মধ্যে চারজনই একই বক্তব্য রাখেন। একজন যিনি কালিয়াচক এক ব্লকের অন্তর্গত সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি জানান এলাকার মহিলারা পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য মহিলা প্রতিনিধির কাছে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেন, আর দুজন এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব থেকেছেন।

সমীক্ষাকৃত মালদা জেলার মুসলিম মহিলা জন প্রতিনিধিদের, তাদের কাজের বিশেষ সমস্যা গুলি কি বা কাজের ক্ষেত্রে কোন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা জানান পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করতে গিয়ে সব থেকে বড় সমস্যা হল অর্থনৈতিক। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প গুলি ঘোষণার পর আর্থিক সাহায্য আসতে বহু সময় লেগে যায়। এক্ষেত্রে গ্রামবাসী, এলাকার লোকজনকে বোঝানো মুশকিল হয়ে যায় আবার অন্যদিকে প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে গিয়ে সমর্থিত রাজনৈতিক দলের লোকজনের হস্তক্ষেপ যখন কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে, তখন মহিলা প্রতিনিধিরা প্রতিবাদ করেছে। তবে এলাকার উন্নয়ন ও কাজকর্ম করতে গিয়ে বড় সমস্যা হলো আর্থিক।

১৯৯২ সালের ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী নিঃসন্দেহে মহিলাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন পালা বদলের সূচনা করেছে। ১৯৯৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে বহু প্রথম স্তরের নেত্রীর জন্ম হয়েছে। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করায় প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এলাকার অন্যান্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি। মহিলাদের নিজস্ব পারিবারিক সমস্যার সমাধান ও সর্বোপরি এলাকার সকল জনগণকে উন্নত পরিষেবা প্রদান করা। নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীরা জয়লাভের মাধ্যমে যেমন নিজেদের স্বনির্ভর করতে পেরেছে, তেমনি এলাকার মহিলাদের আর্থিক নির্ভরতা প্রদানের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার অধীনে গোষ্ঠী গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে। নির্বাচনের জয় লাভের মাধ্যমে মহিলাদের সমাজে আলাদা পরিচিতি গড়ে উঠেছে, স্বনির্ভর হয়েছে। পরিবার পরিজন সন্তান সন্ততি সামলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ এবং এলাকার জনগণের সমস্যায় যে কোন মুহূর্তে পাশে থাকতে গিয়ে অনেক সময় তাদের বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক সময় রাতে কোন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নিতে গিয়ে অনেক পুরুষের সাথে বাড়ি বাইরে কাজ করতে গিয়ে বহু সময় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা অনেক নির্বাচিত প্রতিনিধিই স্বীকার করেছেন। রাজনৈতিক দলের লোকজন ও পরিবারের লোকজনের সাথে বিভিন্ন সময় সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মালদা জেলার নির্বাচিত মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে পারি। অধিকাংশ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা তার নিচু শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা প্রাপ্ত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আছে এই সমস্ত মহিলারা গ্রামোন্নয়নের কাজ কত টা করতে পারছে বা নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটা সক্ষম? অধিকাংশ মুসলিম মহিলা প্রার্থী সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত। অনেক সময় দেখা যায় আসন সংরক্ষিত হওয়ায় পরিবারের পুরুষ সদস্যটি নিজে নির্বাচনে অংশ নিতে না পেরে পরিবারের স্ত্রী লোকদের (নিজের স্ত্রী মা-বোন) নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করে। সে ক্ষেত্রে মহিলাটি নিজে কতটা সক্রিয় ও স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করতে পেরেছে বা পারছে তা প্রশ্ন থেকেই যায়। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় রতুয়া এক ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের মুসলিম মহিলা প্রধানের সাক্ষাৎকার চাইলে সে প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করে। পরে বহু জোড়াজুড়ির পর সে সাক্ষাৎকার দিলে জানা যায় পঞ্চায়েত প্রধানের দায়-

দায়িত্ব কাজকর্ম সম্পর্কে সে মোটেও ওয়াকিবহাল নয়, এমনকি কোন মিটিংয়েও অংশগ্রহণ করে না, তার পরিবর্তে তার স্বামী সমস্ত কাজকর্ম করে ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে। স্বাভাবিক ভাবে বোঝা যাচ্ছে এই সকল ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হচ্ছে বা তার সুফল কতটা হচ্ছে তা আলোচনা সাপেক্ষ।

উপরোক্ত বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায় সংবিধানের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও তা শুধুমাত্র কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। পঞ্চায়েত স্তরে সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য কিছু সংখ্যক মুসলিম নারীর অস্তিত্ব থাকলেও লোকসভা ও বিধানসভায় কোন আসন সংরক্ষণ না থাকায় মুসলিম মহিলা প্রতিনিধির অস্তিত্ব হাতে গোনা কয়েকটা, যা অনুপস্থিতিরই শামিল। এর কারণ হল মহিলাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে এবং তারা সমাজের পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে। তাদের এই পশ্চাৎপদতার কারণ হল শিক্ষার অভাব, আর্থিক ও সামাজিক স্বনির্ভরতার অভাব, পারিবারিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা। এজন্য নির্বাচনের সবকটি স্তরে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার শিবিরের আয়োজন করতে হবে, শিক্ষা ও উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয় ও নিজেদের অধিকার ও দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সোচ্চার হতে পারে ও সর্বোপরি স্বনির্ভর হতে পারে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি ও পুরুষ রাজনৈতিক নেতাদেরও কিছুটা উদ্যোগী হতে হবে, যাতে মহিলারা বিশেষ করে পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মহিলারা রাজনীতির আঙিনায় এগিয়ে আসে, তার সাথে সাথে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু মৌলানা মৌলবিদের ও পরিবারের সদস্যদেরও মহিলাদের সাহায্য করতে হবে। ঘরের চার দেওয়ালেই শুধু মেয়েদের স্থান নয়, বরং বাইরের জগতের বৃহৎ পরিসরেও তাদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, এই বোধ মহিলাদের মধ্যে জাগ্রত হলে তবেই প্রকৃত অর্থে নারী ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Susan B Anthony, https://en.m.wikipedia.org, Retrieved on 09.08.23.

২. Susan B Anthony, তদেব।

৩. Wester mark F., *The Position of Women in Early Civilization*, The American Journal of Sociology, Vol. X (3), 1904, p.8.

৪. Forbes Geraldine Hancock, *Woman in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiography,* New Delhi, Chronicle Books, 2005, p.37.

৫. Forbes Geraldine Hancock, তদেব, পৃ.৩৮।

৬. Forbes, *Women in Colonial India,* তদেব, পৃ.৪৫।

৭. Forbes Geraldine, *Women in Modern India*, The New Cambridge History of India, Cambridge, Cambridge University Press, Vol. 2, 1996, p. 204.

৮. Forbes Geraldine, *Women in Modern India,* তদেব, পৃ. ২০৮।

৯. মুখোপাধ্যায় কনক, *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা,* পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৫, পৃ.২৪-২৫।

১০. তদেব।

১১. Forbes Geraldine Hancock, *Women in colonial India*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

১২. Jahangir K. N., *Muslim Women in West Bengal*, Kolkata, Minerva, 1991, p.4.

১৩. Jahangir K. N., তদেব, পৃ.৪।

১৪. Jahangir K. N., তদেব, পৃ.৪।

১৫. Sinha Raghuveer, *Social Change in India*, New Delhi, 1978, p.12

১৬. Ali Amir, *Women in Islam*, London, University of London Press, 1912, p.36.

১৭. *Bengal legislative council proceedings*, vol. IV, dated 01.09.1922, pp. 313-317.

১৮. আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম বেগম রোকেয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুসলিম মহিলা সংস্থা, যা মুসলমান নারীর দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য সর্বদায় প্রয়াসী ছিল। ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি নারী শিক্ষা ও উন্নতি, নারীর অধিকারের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

১৯. খান মোহাম্মাদ মইনুদ্দিন, *নারীতীর্থের লুৎফর রহমান,* বুলবুল, আষাঢ়, ১৩৪৩, পৃ.১৭৪।

২০. Kapur Pramila, *Marriage and Working Women in India*, New Delhi, VIKAS, 1970, p.406.

২১. Forbes Geraldine Hancock, *Women in Colonial India*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

২২. GOI, *Towards Equality, Report of the Committee on the Status of Women in India*, New Delhi, Department of Social Welfare, 1974, pp. 283-305.

২৩. Bourque Susan and Grassholtz jean, *Politics and Unnatural Practice: Political Science looks at Female Participation,* in Phillips Anne (ed), *Feminism and Politics*, New York, Oxford University Press, 1998, p.23.

২৪. Roy Raka, *Fields of Protest: Women's Movements in India*, New Delhi, Kali for Women, 2000, p.2.

২৫. Munshi vidya, *Political Participation* in Bagchi Jasodhara & Dutta Gupta Sarmistha(eds), *The Changing Status of Women in West Bengal: The Challenges Ahead, 1970-2000*, New Delhi, Sage Publication, 2005, p.81.

২৬. Sarkar Tanika, P*olitical Women: An Overview of Modern India Developments,* in Roy Bharati(ed), *Women in India: Colonial and Post-Colonial Periods*, New Delhi, Sage Publication, Vol.IX(3), p.559.

২৭. GOI, *Towards Equality*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮০-২৮৫।

২৮. GOI, *The Constitution Seventy Third Amendment Act 1992 on the Panchayat*, New Delhi, Ministry of Rural Development, 2003.

২৯. Yang Anand A., *The Agrarian Origins of Crime: A study of Riots in Saran District*, *India, 1886-1920*, Journal of Social History, Vol.13, Issue.2, 1st December 1979, pp.289-306.

৩০. Srinivasan N., *Village Government in India, Association for Asian Studies*, The Far Eastern Quarterly, Vol.15, No.2, 1956, pp.201-213.

৩১. Shinha Rajesh Kumar, Women in Panchayet, Kuruskshetra, July 2018, pp.34-41. https://www.pria.org, retrived on 12.02.2023.

৩২. Purohit B.R. and Sisodia Yatindra Singh, *Evolution of Panchayat Raj in India*, in Sisodia Yatindra Singh(ed), *Functioning of Panchayat Raj System*, Jaipur, Rawat Publication, 2005, p.27.

৩৩. GOI, Ashoka Mehta, *Committee on Panchayati Raj Institution*, New Delhi, Dept of Rural Development, 1978, pp.175-212.

৩৪. Sing Hoshiar, *Constitutional Base for Panchayati Raj in India: The 73rd Amendment Act*, Asian Survey, Vol.34, No.9, Sep 1994, pp.818-827.

৩৫. GOI, *The Constitution Seventy Third Amendment Act 1992 on The Panchayat*, প্রাগুক্ত।

৩৬. Buch Nirmala, *Women's Experience in New Panchayats: The Emerging Leadership of Rural Women,* New Delhi, Center for Women's Development Studies, Occasional Paper, No.35, 2000, p.2.

৩৭. Srinivasan N., *Village Government in India*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০১-২১৩।

৩৮. Election Result 2014, www/ndtv.com/election/article-2014/election- result—2014-61-women elected to Lok Sabha-525990, retrived on 30.05.2023.

৩৯. *Chief Electoral Officer and Ex-officio Secretary Home (C&E) Department*, Govt. of West Bengal.

৪০. Sen Shamita, *Towards Feminist Politics? The Indian Women's Movement in Historical Prspective, Policy Research Report on Gender and Development*, Working paper Series, No.9, The World Bank Development Research Group, April 2000, p.51.

৪১. Bourque Susan and Grassholtz jean*, Politics and Unnatural Practice: Political Science looks at Female Participation,* প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

৪২. Dutta Prabhat & Sen Panchali, *Women in Panchayat in West Bengal: An Exploratory Study,* SIPRD, West Bengal, Kalyani, Kolkata, Dasgupta & Co., 2003, p.3.

৪৩. *ভারতবর্ষ,* প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২০।

৪৪. Ali Abid, *Memoirs of Gour and Pandua,* Calcutta, Bengal Secretariate Book Depot, 1924, p.146.

৪৫. Hamilton Alexander, *A New Account of the East Indies*, Madried, John Mosman Publishers, 1727, p.20.

৪৬. Rennell James, *Memoir of A Map of Hindusthan or The Mogul Empire*, London, M Brown Publisher, 1788, p.60.

৪৭. ঘোষ তুষার কান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা,* কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০২০, পৃ.৮২।

৪৮. Mitra A.(ed), *District Census Hand Book*, Malda, PCLXXXII, 1951, p.1.

৪৯. *Hindusthan Standard*, 19 July 1947.

৫০. Govt. of West Bengal, No. 67, Dated 17.08.1947.

৫১. *Administrative Set up*, Malda District, https://maldagov.in retrived on 12.02.2023.

৫২. ঘোষ তুষার কান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা,* প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪।

৫৩. ঘোষ তুষার কান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা,* তদেব, পৃ.১০৫।

৫৪. *The Musalman,* 26.04.1907.

৫৫. Chadra Bipan, *History of Modern India*, New Delhi, Orient Blackswan, 2020, p.288.

৫৬. মুখোপাধ্যায় জীবন, *আধুনিক ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস,* কলকাতা, শ্রী ধর প্রকাশনী, ২০১১, পৃ.৫৪।

৫৭. মিশ্র সমর কুমার, *মালদহ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ.৬৬।

৫৮. মিশ্র সমর কুমার, *মালদহ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* তদেব, পৃ.৬৭।

৫৯. Sarkar Ashim Kumar, *Nationalism, Communalism and Partition in Bengal: Malda, 1905-1953*, Kolkata, Readers service, 2013, p.45.

৬০. মিশ্র সমর কুমার, *মালদহ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮।

৬১. সোম সুস্মিতা, *মালদা রাজ্য-রাজনীতি, অর্থ-সমাজনীতি,* কলকাতা, সোপান, ২০১৮, পৃ.৩৬৩।

৬২. *The Musalman*, 29.06.1921.

৬৩. মিশ্র সমর কুমার, *মালদহ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.৭২।

৬৪. Chadra Bipan, *History of Modern India*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৪।

৬৫. Sarkar Ashim Kumar, *Nationalism, Communalism and Partition in Bengal*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫।

৬৬. মিশ্র সমর কুমার, মালদহ *জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬।

৬৭. *বঙ্গবাণী পত্রিকা,* ৩০ জুলাই ১৯৩০।

৬৮. Sarkar Ashim Kumar, *Nationalism, Communalism and Partition in Bengal*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫।

৬৯. Sarkar Ashim Kumar, তদেব, পৃ.৫৬।

৭০. ঘোষ তুষার কান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা,* প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৬-১৫৭।

৭১. মিশ্র সমর কুমার, *মালদহ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫-১১৬।

৭২. সোম সুস্মিতা, *মালদা রাজ্য-রাজনীতি, অর্থ-সমাজনীতি,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৭।

৭৩. মিশ্র সমর কুমার, *মালদহ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩।

৭৪. মিশ্র সমর কুমার, তদেব, পৃ.৬৮।

৭৫. মিশ্র সমর কুমার, তদেব, পৃ.৬৯।

৭৬. মিশ্র সমর কুমার, তদেব, পৃ.৯৩।

৭৭. চক্রবর্তী সুধীর কুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের প্রেক্ষিতে মালদহ,* মালদা, প্রথম প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ.২৮-২৯।

৭৮. মিশ্র সমর কুমার, *স্বাধীনোত্তর কালে মালদা জেলার রাজনীতি ও নির্বাচন,* কলকাতা, অক্ষর বিন্যাস, ২০২১, পৃ.১১।

৭৯. মিশ্র সমর কুমার, তদেব, পৃ.১৭।

৮০. *দৈনিক বসুমতী,* ২৫ ফাল্গুন, ১৩৭২।

৮১. মিশ্র সমর কুমার, *স্বাধীনোত্তর কালে মালদা জেলার রাজনীতি ও নির্বাচন,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫।

৮২. মিশ্র সমর কুমার, *স্বাধীনোত্তর কালে মালদা জেলার রাজনীতি ও নির্বাচন,* তদেব, পৃ.১৫০।

৮৩. মিশ্র সমর কুমার, *স্বাধীনোত্তর কালে মালদা জেলার রাজনীতি ও নির্বাচন,* তদেব, পৃ.১৭১।

৮৪. *রূপান্তরের পথে,* ২০১৩।

৮৫. Sachchidnanda and Sinha, *Women's Rights: Myth and Reality*, Jaipur, Printwell Publishers, 1984, p.63.

৮৬. Sirkar V. M., *An Overview*, in Majumdar Vina (ed.), *Symbols of Power*, Bombay, Allied, 1978, p.81.

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামিক অনুশাসনের প্রেক্ষিতে মালদা জেলার মুসলিম নারী

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামিক অনুশাসনের প্রেক্ষিতে মালদা জেলার মুসলিম নারী

মানব প্রকৃতির একটি অংশ হল নারী ও আরেকটি অংশ হল পুরুষ। তাই নারীকে বাদ দিয়ে মনুষ্যজাতির সর্ব প্রকার কর্ম ও পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ। কেননা নারী ও পুরুষ পরস্পর সম্পূরক ও নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা সামাজিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সর্বক্ষেত্রের বিস্তৃত। বস্তুতঃ সমষ্টিগতভাবে জীবনের উন্নতি ও সুস্থতা নির্ভর করে নর-নারীর মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক যথাযথ হওয়ার সাথে সাথে পবিত্র যৌন সম্পর্কের ওপরও। ইসলাম এমন একটি জীবন দর্শন মনুষ্য জাতিকে প্রদান করেছে যা মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। ইসলাম নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মানের সাথে মর্যাদা দান করেছে এবং জীবন যাপনে স্বাধীনতা প্রদান করেছে।

ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পূর্বে সমাজে নারীর কোনরূপ সম্মান ছিল না। সমাজে নারী ছিল পণ্য স্বরূপ। তারা শুধুমাত্র দাসী হিসেবেই জীবনযাপন করত না, তারা ছিল স্বামীর সম্পত্তি। পবিত্র কোরআনে এই দুই প্রথাকে সম্পূর্ণ বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে।[১] জাহেলিয়া যুগে কন্যা সন্তানকে কবর দেওয়ার মতো বর্বর প্রথা চালু ছিল।[২] জাহেলিয়া যুগে নারীকে পণ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি করা হত,[৩] তার কোন সামাজিক মূল্য ছিল না। বহুবিবাহ ও বহুগামীতা ছিল সর্বত্র এবং তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল বহুল প্রচলিত। বহুগোষ্ঠীতে বিভক্ত আরব সাম্রাজ্যে এক গোষ্ঠীর নেতার রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের জন্য বহু গোষ্ঠীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হত। প্রাক-ইসলাম পর্বে একজন পুরুষ একাধিক বিবাহ করত। আরব সাম্রাজ্যে সুবিখ্যাত কোরায়েশ বংশের কেউ কেউ

আবার দশটি স্ত্রী একসঙ্গে রাখতেন এমন ঘটনাও দেখা যায়।[৪] অপহরণ ও বলপূর্বক বিবাহ, ক্রয়-পূর্বক বিবাহ এবং চুক্তির মাধ্যমে বিবাহ আরব সাম্রাজ্যের প্রচলিত ছিল।[৫]

ইসলামের আবির্ভাব তথা হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর আবির্ভাবের পর নারীর শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটে। মহানবীর প্রচেষ্টায় নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আরব বাসীদের কন্যা সন্তান হত্যা বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং কন্যার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে বলেন। কোরানে নির্দেশ আছে, 'kill not your children for fear of want, we shall provide substance for them as for you, verily the killing of them is a grave sin.[৬] ইসলাম ধর্ম নারীকে সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম ধর্ম নারী ও পুরুষকে সম অধিকার প্রদান করেছে। 'women have right similar to the rights against them, according to what is equitable.'[৭] গবেষক নাসিম আহমেদ তার '*Women in Islam*' গ্রন্থে বলেছেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে তা আসলে ভুল। নারী-পুরুষ দুজনেই একই উৎস থেকে সৃষ্ট।[৮] কোরানেও একই কথা বলা হয়েছে, 'O mankind! Fear your Gardian Lord, who created you from a single person, created of like nature his mate and from the twain scattered (like seeds) countless men and women.'[৯] কেউ বড় বা ছোট নয় একে অপরের পরিপূরক এবং সমাজের দুজনেরই সমান অস্তিত্ব ও মর্যাদা রয়েছে।

ইসলাম ধর্ম নারীকে শিক্ষা লাভ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও আর্থিক উপার্জনের স্বাধীনতা প্রদান করেছে। জাহেলিয়া যুগের নারী কোনরূপ আর্থিক স্বাধীনতা ও উপার্জনের অধিকার ছিল না। ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পর নারীর সম্পত্তিতে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্বে যা স্বামী পিতা বা কোন পুরুষ অভিভাবকের অধীনে ছিল।[১০] ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে শিক্ষা লাভ নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই একান্ত অপরিহার্য।[১১] হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশেও পাড়ি দিতে হবে। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন তোমরা

তোমাদের কন্যা সন্তানের প্রতি সদয় ব্যবহার কর এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দাও, যাতে তারা ঠিক-ভুল, সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, যাতে তারা সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, Who is ever brought up three daughters taught them manners and ettiquette, got them married and treated them well in for Him'.[১২] ইসলাম আবির্ভাবের পরে রাজনীতিতে ও নারীর অংশগ্রহণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়কালে বহু বিদূষী নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত ও মজলিস-উস-সূরা[১৩] নামক উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য হিসেবে খলিফাকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করত। হযরত কন্যা বিবি আয়েশা (রাঃ) চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর বিরুদ্ধে উঠের উটের পিঠে চেপে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন।

ইসলাম ধর্ম নারীকে ব্যক্তি হিসেবে সমাজ গঠনের কারিগর হিসেবে সম্পূর্ণ মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও মৌলানা মৌলভীদের ব্যাখ্যা সমাজে ইসলাম ধর্ম ও হাদিস সম্পর্কে বহু ভুলভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, যার প্রভাব নারীর জীবনে পড়তে থাকে এবং মালদা জেলার নারীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ইসলামের বিভিন্ন অনুশাসন গুলির মধ্যে যেগুলি সরাসরি নারীর জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা হল পর্দাপ্রথা, বিবাহ ও তালাক বর্তমানে বহুল আলোচিত বিষয়। এখানে আমরা পর্দা প্রথা, বিবাহ ও তালাক কিভাবে নারীর জীবনকে প্রভাবিত করেছে এবং ইসলাম ধর্ম ও কোরআনে বর্ণিত ব্যাখ্যার সাথে তা কতখানি সম্পৃক্ত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও আমরা জানি ইসলাম ধর্ম নারীকে ব্যক্তি হিসেবে পুরুষের সমান মর্যাদা ও ক্ষমতা দান করেছে, নারী নিজস্ব মানসিক দৃঢ়তা ও কর্ম ক্ষমতা দ্বারা সমাজের কার্যকরী ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে। বর্তমানে নারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের স্বাক্ষর রেখেছে, রাষ্ট্র চালনা থেকে শুরু করে মহাকাশচারী, যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ কোন কিছুই বাদ নেই। তথাপি আজও নারী লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত। পূর্বের অধ্যায় গুলিতে মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ সামাজিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও অবহেলার চিহ্ন পরিস্ফুটিত হয়েছে।

পর্দা প্রথা:

ইসলাম ধর্মে পর্দাপ্রথাকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায় ও জ্ঞান দীপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে। বিশেষ করে অমুসলিম সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে বহুল সমালোচনার বিষয় এই পর্দা প্রথা। পুরনো ভাবনাচিন্তার বিশ্বাসী রক্ষনশীল সম্প্রদায় ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধান হিসেবে পর্দা কে বেছে নিয়েছেন এবং তারা মনে করেন এটি সাম্প্রতিক প্রচলিত বিষয় নয়, এটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময় থেকে চলে আসা একটি প্রথা। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ জ্ঞানদীপ্ত মুসলিম সম্প্রদায় এটিকে অনুসরণ না করার কথা বলেছেন। মধ্যবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মতে এই প্রথা কোন ইসলামিক বিধান নয় এটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সামাজিক প্রথা। ইসলাম আবির্ভাবের পরে আরব সাম্রাজ্যে নারী চার দেওয়ালে আবদ্ধ হয়ে থাকত এবং কারো সাথে দেখা করার কোন সুযোগ ছিল না। এটি একেবারেই সত্য নয়, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে বহু নারী গৃহের চার দেওয়ালের বাইরে বেড়াতে পারত, কিন্তু বাইরে বেড়নো ও চলাফেরা করার জন্য নারীর পরিপূর্ণ পোশাক পড়তে হত। যাতে সে কোন পণ্যের মতো অন্য ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। অপ্রয়োজনীয় ও অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্ভোগ ইসলাম মান্যতা দেয় না এবং তা ইসলামিক শিক্ষা ও বিধানের পরিপন্থী। তাহলে প্রশ্ন এসে পড়ে যে নারী কি প্রকৃত পক্ষেই পর্দার আড়ালে তার মুখমন্ডল আবৃত করে গৃহের বাইরে বেড়োতে পারছে এবং বাইরে বিভিন্ন সামাজিক, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জনসভায় পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতে পারছে?

যারা মনে করেন নারীর জন্য পর্দা জরুরি এবং নারীকে গৃহের চার দেওয়ালে আবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন তারা বলেন, ‘হিজাব’ বা পর্দা নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক, নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত আব্রু রক্ষার কবজ। পর্দা মূলত একটি ফার্সী শব্দ, যার আরবি প্রতিশব্দ হলো ‘হিজাব’, বাংলা অর্থ হল আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল, গোপন করা ইত্যাদি।[১৪] হিজাব বা পর্দা শুধুমাত্র পোশাকের আবরণ নয় বরং একটি সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা যার দ্বারা নারী পুরুষের মধ্যে

অপবিত্র, অবৈধ সম্পর্ক ও সামাজিক কলুষতা রোধ করা যায়। কোরআনের কতগুলি উক্তিতে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কোরআনে বলা হয়েছে, হে উম্মত তোমাদের নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে রাখো। জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগের মত তাদের প্রদর্শনের বস্তু বানিয়ে দিওনা।[১৫] কোরানে আরো বলা হয়েছে, 'O Prophet, enjoin your wives and daughters and the women of the Muslims to draw their outer garments close round them; it is expected that they will be recognized and they will not be molested'.[১৬] এছাড়াও কোরানে নারীদের সংযত থাকতে বলা হয়েছে এবং নিজের লজ্জা স্থান আবৃত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'O Prophet, tell the beliving women to restain their and their privet parts and not to display that'.[১৭]

উপরোক্ত উক্তির দ্বারা পর্দা প্রথার সমর্থকরা বোঝাতে চেয়েছেন ইসলাম ধর্ম নারীদের সম্পূর্ণরূপে গৃহের চার দেওয়ালে বন্দি করে রাখতে চাই, যদিও এটি কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা। কোরআনে বলা হয়েছে নারীরা যেন জাহেলিয়া যুগের নারীদের মতো নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শন না করে এবং যাতে কোন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে অপ্রয়োজনীয় ও অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশা না করে। ইসলাম নারীদের আরও যত্নশীল ও দায়িত্বান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সংসার ও পরিবার পরিজনের ভালো মন্দের খেয়াল ও সাংসারিক জীবন সুন্দরভাবে কাটানোর জন্য নারীর গৃহের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। নারী গৃহে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারলে তবে সে বাইরে অপ্রয়োজনীয় প্রদর্শনী হতে উৎসাহী হবে না। পরের উক্তিগুলিতে দেখা যাচ্ছে কোরআন নারীর চলাফেরা ও গৃহের বাইরে বেরোনোর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। যদিও কোরআন নারীর গৃহে থাকাকেই উত্তম মনে করে। তথাপি প্রয়োজনে যদি নারীকে গৃহের বাইরে বেরোতেই হয় তার পোশাক সংযত ও লজ্জাস্থান আবৃত, এমনকি মুখমণ্ডল আবৃত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নারীর বাইরে যাওয়াতে কোনরূপ বিধি নিষেধ আরোপ করেননি। যখন মেয়েরা গৃহের বাইরে বেরোবে তারা যেন মুখাবৃত রাখে (veil) অথবা বোরখা (Jibas or over garments) দিয়ে পুরো শরীর আবৃত রাখে।

ইসলামবিদ আলুসি হাদিস গ্রন্থ *Ruh-al-Maani* তে বলেছেন Jibas অথবা বোরখা এর অর্থ হল যা নারী তার সাধারণ পোশাকের উপর পরিধান করে।[১৮] যা মুসলিম নারীরা ঊর্ধ্বাঙ্গ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢিলেঢালা পোশাক দ্বারা আবৃত রাখে। এটা মনে করা হয় যে প্রাক ইসলাম পর্বে নারীরা অত্যন্ত স্বল্প পোশাক পরিধান করত ও যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত, যার ফলে তাদেরকে বহু অশ্লীল পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। দুটি কারণে ইসলাম নারীদের লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক দ্বারা নিজেদের আবৃত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এক. শারীরিক আকার ও সৌন্দর্য প্রদর্শনে বাধা, দুই. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গৃহের বাইরে বেরিয়ে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ইসলাম বোরখা পরা নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বের চারিদিকে নারী নির্যাতন ধর্ষণ ও নারীর প্রতি অশ্লীল আচরণের যেসব ঘটনাবলী সামনে আসে তা আসলে নারীর পোশাক ও মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন। তবে পর্দা প্রসঙ্গে আরেকটি প্রসঙ্গ মাথায় আসে হিজাব (veil) বা নাকাব কি জরুরী অথবা নারীদের গৃহের বাইরে আসার সময় হাত পা মুখমন্ডল অনাবৃত রাখলেও চলে? আজও এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি।

বর্তমানে বহু গবেষক, চিন্তাবিদ, ধর্মীয় উপদেষ্টাগণ একমত যে নারীর গৃহের বাইরে আসার জন্য হিজাব যা মুখমন্ডল আবৃত করা প্রয়োজন নেই। মুখমন্ডল, হাত ও পায়ের পাতা ব্যতীত সমগ্র শরীর আবৃত থাকতে হবে। কোরানে নির্দেশ আছে যে নারীদের এমন ধরনের পোশাক করতে হবে যাতে শারীরিক আকার আকৃতি ও সৌন্দর্য প্রকাশ না পায়।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়কালে মহিলারা হিজাব ব্যতীত আর্থিক বা ধর্মীয় কারণে গৃহের অভ্যন্তর হইতে বাহির হত। কিন্তু তারা গলা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ আবৃত থাকত যাতে তাদের শারীরিক সৌন্দর্য প্রকাশ না পায়। হযরত স্ত্রী বিবি আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন বহু মহিলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা পরিচালিত নামাজের যোগদান দেওয়ার জন্য নিজেদের লম্বা ও ঢিলে ঢালা পোশাকে আবৃত করে রাখত এবং তারা রাতের অন্ধকারে গৃহে ফিরত যাতে তাদের কেউ দেখতে না পায়।[১৯] এর থেকে বোঝা যায় হিজাব বা পর্দা নয় বরং অন্ধকার যা নারীকে সকলের

দৃষ্টি এড়াতে সাহায্য করত। আরও একটি ঘটনা বদর যুদ্ধ[২০] অংশগ্রহণকারী সাদ বিন খাওলা, তার স্ত্রী সাবিয়া আসলামিয়াকে গর্ভবতী রেখে মারা যান। স্বামীর মৃত্যু দিন সাবিয়া কে হিজাব ব্যতীত সানবিল বাকাক নামে এক ব্যক্তি দেখে ফেলে। যখন সানবিল, সাবিয়ার নিকট অগ্রসর হয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। ইহা শুনে সাবিয়া সমস্ত পোশাক একত্রিত করে পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট রওনা হয় ও সমস্ত ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কর্ণগোচর করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে সন্তান প্রসবের পর পুনরায় বিবাহ করতে পারে বলে পরামর্শ দেন।[২১] এই ঘটনাটি ঘটেছে শেষ হজ যাত্রার (৬৩২ খ্রীঃ)[২২] সময়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এটি জাহেলিয়া যুগে নয় বরং ইসলাম আবির্ভাবের পরেও মহিলারা হিজাব ব্যতীত গৃহের বাইরে বের হতে পারত এবং সাবিয়া বিবাহের ইচ্ছায় নিজেকে হিজাব ব্যতীত রেখেছে বা অন্যের সন্মুখে এসেছে তা নয় এটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। তাই সানবিল, সাবিয়াকে দেখে ও বিবাহের প্রস্তাব দেয়। উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান যুগের মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ বিশেষ করে মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের যেভাবে নিজেদের গৃহে আবদ্ধ করে রেখেছে ইসলামের আদি পর্বে নারীরা সেরূপ গৃহে আবদ্ধ ছিল না এবং তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। তবে এটিও পরিষ্কার যে, সে সময় নারীরা ইসলাম দ্বারা নির্দেশিত পোশাকের ফরমান মেনে চলত। মুসলিম নারীদের দ্বারা পালিত ঐতিহ্যগত প্রথা ও পাশ্চাত্যে নারীদের পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে বিস্তার পার্থক্য রয়েছে।

নারীর পর্দা ও হিজাব প্রচলন এর মাধ্যমেই বোঝা যায় যে ইসলাম ধর্ম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে সমর্থন করে না। ইসলামের আদিপর্বের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনাও নেই যেখানে নারী-পুরুষ কোন সামাজিক, ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক প্রয়োজনে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে। এমনকি হযরত মহম্মদ (সাঃ) প্রার্থনার সময়ও নিয়ম নীতি করেছিলেন, যাতে কোন নারী ও পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সারিতে দাঁড়াতে না পারে, প্রকাশ্যে কথা বলতে পারবে না। ইসলামিক গবেষক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন অল-অলবানি 'হিজাব' প্রসঙ্গে বলেছেন কোরান, হাদিস ও মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীগণের জীবনযাত্রার দ্বারা পরিষ্কার হয়েছে যখন কোন নারী গৃহের বাইরে পা বাহির

করে তখন তার মুখমণ্ডল ও হাত ব্যতীত সমগ্র শরীর আবৃত থাকতে হবে। নাসির উদ্দিন আল আলবানীর মতে হিজাবের কতগুলি নিয়ম প্রযোজ্য-

১. হাত ও মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত রাখতে হবে।

২. অপরকে আকর্ষণকারী সমস্ত জিনিস বর্জন করতে হবে।

৩. আলোক ভেদ্য পাতলা জামা কাপড় পরিধান করা চলবে না।

৪. শারীরিক আকার আকৃতি বোঝা যায় এমন কোন পোশাক পরিধান করা চলবে না।

৫. সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না।

৬. পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য মূলক কোনো পোশাক নারীর পরিধান করা চলবে না।

৭. ইসলামের অবিশ্বাসীদের সাথে সাদৃশ্যমূলক কোন পোশাক বা অবিশ্বাসীদের কোন ধর্মী অনুষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্য জনিত কোন পোশাক মুসলিম নারী পরিধান করতে পারবে না।

৮. নারীর সৌন্দর্য যেন প্রকাশিত না হয়।[২৩]

উপরোক্ত বিধানগুলির দ্বারা গবেষক নাসিরুদ্দিন আলবানী নারীদের হিজাব প্রথাকে সমর্থন করে শুধুমাত্র নারীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। কিন্তু কোরআন ও হাদিসে নারী-পুরুষ উভয়ের উপর পর্দার বিধান রয়েছে। পর্দার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গবেষক আল আসারি বলেছেন, to establish a social order that segregates the spheres of activity of the male and the female, discourages and controls the free intermingling of the sexes, and curbs all such factors as are likely to upset and jeopardize the social discipline.[২৪] ইসলাম নারী-পুরুষ সকলকেই নিজস্ব দৃষ্টি সংযত রাখতে ও লজ্জাস্থান আবৃত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। হাদীস শরীফে নির্দেশ আছে একজন পুরুষ ও নারী যেন কোন অন্য স্ত্রী ও অন্য পুরুষের প্রতি কুদৃষ্টি বা লোভনীয় দৃষ্টিতে না দেখে কারণ দৃষ্টির দ্বারা মানুষ বাহ্যিক সৌন্দর্য উপভোগ করে, যা মানুষের মধ্যে অতৃপ্ত বাসনা জাগরণ ঘটায়। নারী কোন কোন ক্ষেত্রে পর্দা ছাড়া চলাফেরা করতে পারবে তারও নির্দেশ দেওয়া রয়েছে হাদিসে। একজন নারী তার স্বামী, পিতা পুত্র, ভাই, ভাইপো, শশুর,

তার দাস-দাসী, শিশু, রক্ত সম্পর্কিত পুরুষ ইত্যাদি সকলের সামনে পর্দা ছাড়া চলাফেরা করতে পারবে।[২৫]

মুসলিম নারীদের পর্দা সামাজিক মর্যাদা ও উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করে এবং সামাজিক পশ্চাৎপদতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এর জন্য নারী বাইরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। গবেষক শিবানী রায় তার উত্তর ভারতের মুসলিম নারীর মর্যাদা শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থে উত্তর ভারতের মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন মুসলিম নারীকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাধার সম্মুখীন হতে হয়। নারীদের প্রতি এই অসাম্য মূলক আচরণ সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন উত্তর ভারতের মুসলিম সমাজ ইসলামিক অনুশাসন গুলি কঠোরভাবে মেনে চলে এবং মুসলিম নারীরাও সামাজিক পর্দা প্রথা মেনে চলতে বাধ্য। মুসলিম নারী শুধুমাত্র ডাক্তারের কাছে গেলে বা কাজী অথবা কোন বিপদে পড়লে, অন্য কোন পুরুষের সাথে কথা বলার অনুমতি পেত। যেহেতু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তার পরিবারের মেয়েদের গৃহের বাইরে বেরোনোর জন্য পর্দা নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই ভারতের মুসলিম নারীরাও পর্দা কে নিজেদের সম্মান মনে করেন, তাতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় বলে মনে করেন। হাদিসে নারীদের অপরিচিত নারীর সামনেও পর্দা বা চাদর দেওয়ার নির্দেশ আছে। নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে নিজ স্বামী ব্যতীত, অন্য কোন পুরুষ বা নারীর সামনেও হাত ও মুখমন্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর আবৃত রাখতে বাধ্য। যদি সেটা না করে তাহলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।[২৬] পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার মুসলিম সমাজেও একই রকম সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা গৃহের বাইরে বেরোলেই পর্দা বা মাথায় ওড়না ব্যবহার করে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক বদলেছে, মালদা জেলার শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে, তারা শুধু গৃহেই আবদ্ধ থাকে না, তারা অর্থ উপার্জনের আশায় কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে ও আধুনিক পোশাক পরিধান করে।

গবেষক সৌকত আজিম যুক্তি দেখাচ্ছেন যে সারা বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে পর্দা প্রথা বিরাজমান এবং নারীর সামাজিক উন্নতিতে তা বাধা স্বরুপ। পর্দা প্রথার জন্য ভারতীয় মুসলিম নারীদের সামাজিক ক্ষেত্রে কোন অনুষ্ঠানে একত্রিত হওয়া বা অংশগ্রহণ খুব কম দেখা যায়।[২৭] ফলে তারা অসাম্যের শিকার হয় এবং পুরুষরা মুসলিম নারীদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গবেষক আজিম তার গবেষণামূলক গ্রন্থ *'মুসলিম উইমেন ইমারজিং আইডেন্টিটি'* তে বলেছেন ম্যাঙ্গালোর রাজ্যের মুসলিম নারীর অগ্রগতি ও সর্বাঙ্গীর উন্নতিতে পর্দা প্রথা বাধার সৃষ্টি করে। এর সবথেকে বেশি প্রভাব দেখা যায় নারী শিক্ষার ওপর। যার ফলে তারা চাকরি ক্ষেত্রে সুযোগ কম হতে থাকে।[২৮] বর্তমানে মালদা জেলার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার স্কুল কলেজগামী ছাত্রীদের মধ্যে পর্দার প্রচলন অত্যাধিক দেখা যায়। তারা বিদ্যালয় কক্ষে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে অধিকাংশ সময়ের মাথার ওড়না বা হিজাব ঠিক করতেই ব্যস্ত থাকে তাতে পড়াশোনায় ক্ষতি হয়। অনেকটা বুঝে অথবা না বুঝেই অধিকাংশ মেয়েরা পর্দা করে অথবা মুসলিম সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথা হিসেবে মেয়েরা এটিকে মেনে নিয়েছে। তবে বর্তমানে এই ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটছে এবং এখন এটি এক রকম অদৃশ্যই হয়ে গেছে। তবে মালদা জেলা গ্রামাঞ্চলে কঠোরভাবে প্রচলিত।

বোরখা পরার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে মালদার শহরাঞ্চলে তা বিশেষভাবে আর দেখা যায় না। আর যদিও বা কেউ বোরখা পরিধান করছে ইসলামিক বিধান অনুযায়ী নয় বরং ফ্যাশন হিসেবে এটিকে নিয়েছে। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীর আধিপত্য সূচিত হয়েছে।

অন্যদিকে গবেষক ইউসুফ ও স্মোক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে পর্দা হল মুসলিম সমাজের সম্মানের সূচক। এর দ্বারা নারীর চারিত্রিক গুণাগুণ বিচার করা হয়, যা একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ভারতে নারীর আইনি অধিকার রক্ষার জন্য মুসলিম পার্সোনাল ল' রয়েছে। কিন্তু নারীর সামাজিক অগ্রগতি পর্দা প্রথার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।[২৯] আবার সমাজবিদ জারিনা ভাট্টির মতে পর্দা

নারীর শারীরিক অসুস্থতারও কারণ। যা একজন নারীর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক উন্নতিতে বাধা দেয়।[৩০] তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে পর্দা শুধুমাত্র নারীর সামাজিক অগ্রগতিতে বাঁধার সৃষ্টি করে তা নয় বরং নারীর মানসিক ও শারীরিক উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে, কিন্তু পর্দা প্রথা নারীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চার দেয়ালে আবদ্ধ করে রেখেছে। এর প্রভাব শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বহু অভিভাবক মেয়েদের স্কুল কলেজের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাতে নারাজ।।[৩১] বর্তমানে এই সামাজিক প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে, নারী নিঃসঙ্গতা আর নেই। বোরখার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে তার জায়গা নিয়েছে ওড়না। পশ্চিমবঙ্গ মালদা জেলায় মুসলিম পরিবারের মেয়েদের সাধারণত চুড়িদার ওড়না ব্যবহার করতে দেখা যায়। ইসলামিক অনুশাসন অনুযায়ী পর্দা যে অর্থে ব্যবহৃত হত বর্তমানে তার প্রচলন তেমন আর নেই। পর্দা প্রথায় অনেক নমনীয়তা এসেছে। এখন মেয়েরা বোরখা ছাড়াই বাইরে বেরোতে পারে। তবে বেশিরভাগ মুসলিম নারীরা বর্তমানে ওড়না বা চাদর ব্যবহার করে। ছেলে মেয়ের মধ্যে জনসম্মুখে মেলামেশা তেমন না দেখা গেলেও বর্তমানে ইসলাম ধর্মের অনুশাসন গুলির কঠোরতা বর্তমানে শিথিল হয়েছে এবং এখন তা নারীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে আর বাধার সৃষ্টি করে না।[৩২] এটা পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা যা নারীর সামাজিক পরিচিতি গড়ে তুলতে বাধা দেয় এবং পর্দার দ্বারা নারীকে সমাজ থেকে বিচ্যুত করে রাখে। পূর্বে যেভাবে পর্দা প্রথা ব্যবহৃত হতো, বর্তমানে তার হয় না। পর্দার অর্থই হলো যেন কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। বর্তমানে সাধারন পোশাকের থেকে আধুনিক বোরখা মানুষকে বেশি আকৃষ্ট করছে ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে।[৩৩] আবার অনেকে মনে করেন. Purdah was custom of ignorance which had been adopted by the narrow minded Muslims long after the glorious period of Islam. They also averred that the Quran and Hadith were devoid of the Purdah injunctions, they only inculcated moral teaching of modesty and chastity, and Islam did not recognize any discipline restricting the movement of women.[৩৪]

বর্তমানে বহু নারীকে বোরখা ব্যতিত জনসম্মুখে দেখা যায়, তবে তারা ওড়না দিয়ে মাথা আবৃত রাখে। পর্দা এখন আর নারী প্রগতিতে বাধা স্বরূপ নয় বরং অশিক্ষা দারিদ্রতা হল নারীর পশ্চাৎপদতার আসল কারণ। আধুনিকীকরন নারীর জীবনে পরিবর্তনে এনেছে। এখন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নারীকে পরিবারের সমস্ত কাজ বিশেষ করে সন্তানের দায়-দায়িত্ব নারীর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে।[৩৪] পর্দার থেকেও বেশি যেসব বিষয় নারী উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করে তা হল ইসলামিক ঐতিহ্য, প্রথা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামিক নীতির ভুল ব্যাখ্যা, নিজস্ব সচেতনতার অভাব ও পরিবারের পুরুষ সদস্যের অসমর্থন, অশিক্ষা, দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক নির্ভরতা ইত্যাদি। মুসলিম নারীরা সামাজিক সংস্কারগুলিকে খুব ধীরগতিতে গ্রহণ করে, তুলনামূলকভাবে যেসব মুসলিম মহিলারা শহরে থাকে তাদের মধ্যে আধুনিকীকরণের প্রবণতা বেশি এবং নিজেদের দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে।[৩৬] মালদা জেলাতেও একই চিত্র দেখা যায়। মালদার গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে আধুনিকীকরন দ্রুত হয়েছে। গবেষক চতুর্বেদির মতে নারীর সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে আর্থ সামাজিক উন্নতির ওপর। তাই আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেই নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।[৩৭]

বর্তমানে আমরা মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর গবেষণা করতে গিয়ে ও সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে পর্দা সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীর মতামত জানতে পারি। মোট ২০০০ মুসলমান নারীর উপর সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখি প্রায় ১১৫০ জন মহিলা পর্দা প্রথার বিরোধী। তাদের মতে পর্দার দোহাই দিয়ে বাড়িতে থাকলে চলবে না, অর্থ রোজগারের আশায় তাদের বাড়ির বাইরে বেরোতেই হবে। বহু বিধবা ও বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলাদের বক্তব্য হল সন্তান প্রতিপালন ও সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য তাদের পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজে যোগ দিতে হয়। আবার অনেক মহিলা চুপ থেকে পর্দা সম্পর্কে নিরপেক্ষতা জানিয়েছে। আবার প্রায় ৫০ জন মহিলা ইসলামে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যক্ত করে পুরোনো ইসলামিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান, তবে তার বেশিরভাগ মহিলা গ্রামে

বাস করে। সমীক্ষা করতে গিয়ে পরিলক্ষিত হয় যে শহরাঞ্চলের মুসলিম নারীর মধ্যে ইসলামিক অনুশাসনের কঠোরতা কম, যা গ্রামে বাসরত মহিলাদের মধ্যে বেশি। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে শহর অঞ্চলের মুসলিম নারীর মধ্যে শিক্ষার হার গ্রামাঞ্চলের মুসলিম নারীর তুলনায় বেশি। অতএব শিক্ষার প্রসার ঘটলেই নারীর মধ্যের জড়তা গুলি দূরীভূত হবে ও তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

বিবাহঃ

নারী পুরুষের সুষ্ঠু ও মর্যাদা সম্পন্ন জীবন যাপনের জন্য ইসলামে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম মতে বিবাহ হল একটি সামাজিক চুক্তি, যা প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন বিবাহ হল সুন্নত এবং যারা এর থেকে দূরে থাকে তারা আমার উম্মত হতে পারে না।[৩৮] ইসলামিক আইনবিদ ফৈজির মতে মুসলিম আইনে বিবাহ (নিকাহ) একটি সামাজিক চুক্তি, যা বৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন ও সন্তান উৎপাদনে উৎসাহ দেয়।[৩৯] আইনবিদ ডঃ জঙ্গ মনে করেন বিবাহ একটি আধ্যাত্মিক চুক্তি যা প্রাথমিকভাবে যৌন স্পৃহা চরিতার্থ ও সন্তান উৎপাদন করে।[৪০] গবেষক আব্দুর রহিম ও একই মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মতে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একটি ঐশ্বরিক আশীর্বাদ (ইবাদত) এবং নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে কার্যকর।[৪১]

প্রাক ইসলাম পূর্বে আরব সাম্রাজ্যের নারীর অবস্থান ছিল খুব সঙ্গীন। আরবের সমস্ত রকম আইন কানুন পুরুষদের পক্ষেই ছিল, নারীরা পণ্য হিসাবে বিবেচিত হত। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তার কোন অধিকার ছিল না। প্রাক ইসলাম পর্বে বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যৌন আনন্দ লাভ ও সন্তান উৎপাদন। সেই সময় আরব সাম্রাজ্যের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ ইচ্ছা করলে একসঙ্গে অনেকগুলো নারীকে বিবাহ করতে পারত। নিজস্ব মা-বোন ব্যতীত যেকোনো নারীকে তারা বিবাহ করতে পারত। সেই সময় আরবে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল,

কিন্তু তা ছিল বেশ্যাবৃত্তির বিভিন্ন ধরন।[৪২] জাহেলিয়া যুগে পিতা তার কন্যাকে পশুর ন্যায় তার স্বামীর কাছে বিক্রি করত। সেই সময় নারীর বিবাহের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। সংক্ষেপে বলতে গেলে জাহেলিয়া যুগে নারীরা ছিল দাসদের মতই এবং তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

ইসলামের আবির্ভাবের পর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নারীর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটান। যা আইনের দৃষ্টিতে ছিল সর্বাঙ্গীন উন্নতি। ইসলামে রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত ও সন্ন্যাসিনীদের মত চির বৈধব্য বা চিরকুমারের ধারণা নেই। শেষ পয়গম্বর হযরত মহম্মদ (সাঃ) বলেছেন বিবাহ হল ধর্মীয় কর্তব্য এবং সেইসঙ্গে সামাজিক প্রয়োজন ও রক্ষা কবজ।[৪৩] হযরত মুহাম্মদ নারীদের পুরুষের ন্যায় সমতা ও সমস্ত আইনি অধিকার প্রদান করেছে।[৪৪] প্রাচীন আরব সাম্রাজ্যে ইসলাম আবির্ভাবের পর জাহেলিয়া যুগের থেকে নারী অনেক বেশি স্বাধীন ও নিশ্চিত অধিকার পেয়েছিল, যা তার সামাজিক মর্যাদা, বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

মুসলিম বিবাহ প্রথা মুসলিম আইন থেকে নির্গত বিভিন্ন সংস্কারের সমষ্টি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নারীর সামাজিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান। ধর্মীয় ধারণা থেকে যেসব সংস্কারের উদ্ভব হয় তা বিবাহের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়, এর কতগুলি দিক রয়েছে।

১: আইনগত দিক (Legal Aspect):-

যে পদ্ধতিতে মুসলিম বিবাহ সম্পন্ন হয় তা আইনি চুক্তির সমান। তাই অনেকে মুসলিম বিবাহকে ধর্মীয় সংস্কার অপেক্ষা চুক্তি বলাই শ্রেয় বলে মনে করেন। বিবাহের চুক্তিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি পরিলক্ষিত হয়-

ক. ইসলামে উভয় পক্ষের (নারী ও পুরুষ) সম্মতি ব্যতীত বিবাহ হতে পারেনা। বিবাহে কন্যার সম্মতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

খ. চুক্তি অনুযায়ী মুসলিম বিবাহে প্রস্তাব ও সম্মতি প্রয়োজন হয়।

গ. বৈবাহিক চুক্তি অনুযায়ী আইনের ফাঁকফোঁকর গুলি রোধ করা হয় ও আইন ভঙ্গ কারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে।

২: সামাজিক দিক (Social Aspect):-

নিকাহ বা মুসলিম বিবাহ প্রথা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা নারীর সমাজে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নির্দেশ করে। মুসলিম ধর্মীয় ব্যাক্তিরা বিবাহকে সুন্নত বলে মনে করেন যার ফলে বিবাহ কৃত ছেলে মেয়ের ওপর আল্লাহর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। ঠিক তেমনি বিবাহভঙ্গ বা বিবাহ বিচ্ছেদকে সবথেকে বেশি ঘৃণার চোখে দেখা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিবাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিবাহকে ধর্মীয় যুদ্ধ (Jehad) এর ওপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বিবাহ হল অর্ধেক ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বিধান যা নর নারীকে সামাজিক অপকর্ম থেকে বিরত রাখে।[৪৫] বিবাহ শুধুমাত্র একটি চুক্তি নয় বরং একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও। ইসলামিক আইন বিবাহের পর নারীদের সমাজের উচ্চ মর্যাদা দান করে। জাহেলিয়া যুগে একজন পুরুষ একসঙ্গে ১০ জন স্ত্রী রাখতে পারত। ইসলাম আবির্ভাবের পর সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং নিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিবাহকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং বলেছেন “There is no monkery in Islam”. এর দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত ও পর্যাপ্ত রূপে যৌন সম্পর্কের দিকে দিক নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত সন্ন্যাসিনীদের ন্যায় ইসলামে অনূঢ়াবস্থার নির্দেশ নেই। বিবাহ হল ধর্মীয় কর্তব্য যা নর নারী উভয়কেই সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রদান করে।[৪৬]

৩: ধর্মীয় দিক (Religion Aspect):-

ধর্মীয় দিক থেকে বিবাহ হল আল্লাহর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন (Ibadah), কারণ বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশে স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও সাহায্যকারী হিসেবে সারা জীবন একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার বদ্ধ হয় ও সন্তান জন্ম ও প্রতি পালনের মধ্য দিয়ে মানবজাতি

রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। ইসলাম মতে বিবাহ হল সমাজ গঠন ও বিস্তারের ভিত্তি। এটি একটি সামাজিক চুক্তি তবে এটি পবিত্র চুক্তি।[৪৭] গবেষক তাহির মাহমুদ এর মতে ইসলামে বিবাহ হল জাকজমক পূর্ণ চুক্তি।[৪৮] কোরআনে বিবাহকে সাধারণ চুক্তি হিসেবে দেখা যায় না। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিবাহকে আল্লাহর সুন্নত বলেছেন।[৪৯] গবেষক ফৈজি অবশ্য বলেছেন বিবাহের আইনি ও সামাজিক গুরুত্ব স্বীকার করলেও ধর্মীয় গুরুত্ব নিয়ে অনেক ভুল বোঝা রয়েছে। ফৌজির মতে বিবাহ হল একদিকে যেমন ঈশ্বরের ভক্তি অপরদিকে লৌকিক ব্যাপার।[৫০] হযরত মহম্মদ (সাঃ) অবশ্য অস্থায়ী বিবাহকে[৫১] নিষিদ্ধ করেছেন।

মালদা জেলার বেশিরভাগ মুসলিম বিবাহ গুলি অভিভাবকদের দ্বারাই ঠিক হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে মেয়েদের সম্মতি নেওয়া একটি আনুষ্ঠানিক বিষয়। যদিও শিক্ষার প্রসার ঘটায় আজকাল মেয়েরা জীবনসঙ্গিনী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেয়েছে, যা ইসলাম ধর্ম বহু পূর্বেই নারীকে প্রদান করেছে। মালদা জেলার মুসলিমদের মধ্যে বাল্য বিবাহের প্রবণতা বেশি, গ্রাম্য এলাকায় তা আরো বেশি। বিবাহ রেজিস্টেশন তেমন হয় না, ঠিক তেমনি বিবাহ বিচ্ছেদেরও (তালাক) সঠিক তথ্য পাওয়া দুষ্কর। মালদার মুসলিমদের মধ্যে বিবাহের আইনি রেজিস্ট্রেশন এর থেকেও 'কাবিলনামা' বা সামাজিক বিয়ের গুরুত্ব বেশি। মালদার মুসলিম সমাজের শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের গুলির মধ্যে একই রকম বিবাহের ধরন ও নিয়ম দেখা দেয়।

গবেষক অলকা সিং এর মতে ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হল সরলতা। ইসলাম ধর্মে বিবাহের ক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিকতার কথা নেই। বৈধ বিবাহের ক্ষেত্রে যেটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল প্রস্তাব প্রদান (Ijab), সম্মতি প্রদান (Qubul), প্রাপ্তবয়স্ক (Baligh) এবং নিজস্ব বিচার বুদ্ধি (Rashid) থাকবে। বিবাহের ক্ষেত্রে একসময় এক পক্ষ প্রস্তাব প্রদান করে ও অপরপক্ষ তাতে সম্মতি জানিয়ে এক চুক্তির মাধ্যমে সমস্ত সাক্ষীর সামনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।[৫২]

ইসলাম ধর্মের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় সুন্নী ও শিয়া মতে বিবাহের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। সুন্নি মতে বিবাহ হলো তিন ধরনের- ১. বৈধ (Sahih) ২. অকার্যকর (Batil) ও ৩. অনিয়মিত (Irregular)। ঠিক তেমনি শিয়া মতে বিবাহ তিন ধরনের ১. বৈধ (Sahih) ২. অকার্যকর (Batil/ Void) ও ৩. অস্থায়ী (Irregular)।

১. বৈধ বিবাহ (Valid/Sahih): শিয়া ও সুন্নি উভয় মতেই সব ধরনের ইসলামিক বিধি সম্মত বিবাহ হল বৈধ বিবাহ।[৫৩] এই বিবাহে প্রস্তাব প্রদান (Ijab), সম্মতি প্রদান (Qubul), প্রাপ্তবয়স্ক (Baligh) এবং নিজস্ব বিচার বুদ্ধি (Rashid) দ্বারা দুই পক্ষ (পাত্র ও পাত্রী) সমস্ত সাক্ষ্যের সম্মুখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই বিবাহে কোনরূপ বাধা থাকে না এবং যদি কোনরুপ বাধা থেকেও থাকে ও তা যদি স্থায়ী হয় তবে তা অকার্যকর (Batil/ Void) বলে বিবেচিত হবে এবং যদি অস্থায়ী বাধা থাকে তবে তা অনিয়মিত (Irregular) বিবাহ বলে বিবেচিত হবে। [৫৪]

২. অকার্যকর (Batil/ Void) বিবাহ: যে বিবাহ ইসলামিক আইনসম্মত নয়, তা অকার্যকর বা বাতিল বিবাহ। যেমন রক্ত সম্পর্কিত নর নারী বিবাহ করলে অথবা অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করলে বা বিধবা মহিলাকে ইসলামিক আইন অনুসরণ না করে বিবাহ করলে তা অকার্যকর বা বাতিল বিবাহ বলে বিবেচিত হবে। এছাড়াও জোড়পূর্বক বিবাহ যা ইসলাম বহির্ভূত বা বাতিল রূপে বিবেচিত হবে।

শিয়া মতে উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আরো কতগুলো বিষয় বাতিল বিবাহ বলে বিবেচিত হবে তা হল-

১. পঞ্চম স্ত্রী কে বিবাহ।

২. হজ্ব বা তীর্থ কালীন অবস্থায় বিবাহ।

৩. কোন অমুসলিমকে বিবাহ।

৪. বেআইনি বা ইসলামিক আইন বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন।

৫. বিবাহ বিচ্ছেদ চলাকালীন বা ইদ্দত পর্বে বিবাহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

৩. অনিয়মিত বিবাহ (Fasid): এই বিবাহ পদ্ধতি আইন সম্মত বা আইন বহির্ভূত উভয়ই হতে পারে। আইন বহির্ভূত বিবাহ সঠিক অথবা সম্পর্কিত উভয়ই হতে পারে। যদি বেআইনি বিবাহ পদ্ধতিটি সঠিক হয় তবে সেটি বাতিল বিবাহ হবে এবং যদি বিবাহটির সম্পর্কিত হয় তবে তা অনিয়মিত বিবাহ হবে। নিম্নোক্ত বিবাহ গুলি অনিয়মিত বিবাহ বলে গণ্য হবে-

১. সাক্ষী ছাড়া বিবাহ, একটি বিবাহকে বিধিসম্মত বা বৈধ করার জন্য উভয়পক্ষের পাত্র ও পাত্রী সাক্ষী প্রয়োজন হয়।

২. ইদ্দত পর্ব বা বিবাহ বিচ্ছেদ চলাকালীন সময় কালে কোন স্ত্রী বা পুরুষ যদি অন্য কারো সাথে বিবাহ করে তাহলে সেটি অনিয়মিত বিবাহ হবে।

৩. দুটি ভিন্ন ধর্মের নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহ, যদি তা ইসলামিক বিধি সম্মত না হয় তাহলে তা অনিয়মিত বিবাহ হবে।

৪. দুটি রক্ত সম্পর্কিত বোনের সাথে একসঙ্গে একই সময়ে বিবাহ এবং

৫. পঞ্চম স্ত্রীর সাথে বিবাহ যা ইসলামিক বিধি সম্মত নয় তা অনিয়মিত বিবাহ বলে বিবেচিত হবে।

৪. অস্থায়ী বিবাহ বা মুতাবিবাহ (Muta/ Temporary Marriage): 'মুতা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো উপভোগ করা বা আনন্দদায়ক। এই বিবাহ পদ্ধতি ক্ষণস্থায়ী, কিছু সময়ের আনন্দ পাওয়ার জন্য এই পদ্ধতিতে বিবাহ হয়ে থাকে। এই বিবাহে স্ত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই বিবাহ পদ্ধতি সাধারণত প্রাক ইসলাম যুগে আরব সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল।[৫৫] কিন্তু ইসলাম আবির্ভাবের পর এই বিবাহ পদ্ধতি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সাধারণত অস্থায়ী বা মুতা বিবাহ পদ্ধতির অনুমতি দেওয়া হয় যখন কোন পুরুষ ১০০ মাইল দূরে ভ্রমণ করে, নিজেকে কোন প্রকার যৌন দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য এই পদ্ধতিতে

বিবাহ করে। মুতা বিবাহ সম্পর্ক কোন নারীকে না স্ত্রী, না দাসী কোন প্রকারেরই স্বীকৃতি দেয় না। কোরআন এই প্রকার সম্পর্ককে কোনভাবেই মান্যতা দেয় না। কোরআনের ৪:২৪ আয়াতে স্ত্রী শব্দটির উল্লেখ আছে, কিন্তু মুতার সম্পর্কে একজন নারী স্ত্রীর মর্যাদা পায় না। কোরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কার যে নিকাহ ব্যতীত আর অন্য কোন সম্পর্কের কথা ইসলামে নেই।[৫৬]

ভারতে যেখানে সুন্নি মতাবলম্বীর আধিক্য রয়েছে সেখানে এই বিবাহ সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু ইরান ও ইরাকে মুতা বিবাহ পদ্ধতির উজ্জ্বল কর দিকটি তুলে ধরা হয়। ইরাক ও ইরানের বেশ্যাবৃত্তিকে আইনসম্মত করার জন্য মুতা বিবাহকে উৎসাহ দেওয়া হয়।[৫৭] তবে এটি বলাই বাহুল্য যে এই আরবীয় প্রথা শিয়া, সুন্নি, জায়েদী ও ফাতেমি ধারা সকলেই অস্বীকার করেছেন[৫৮] এবং এটি বন্ধ করার সুপারিশ করেছেন। শুধুমাত্র ইতনা আসারী শিয়া আইন এটিকে মান্যতা দিয়েছে।[৫৯] তাদের মতে এটি কিছু সময়ের জন্য প্রযোজ্য।[৬০] এটি একদিনের জন্যও হতে পারে অথবা একমাস অথবা এক বছরের জন্য মুতা বিবাহ হতে পারে। মুতা বিবাহের ক্ষেত্রে যেটি আসলে প্রয়োজন তা হল পরিকাঠামো (the form), বিষয় (the subject), সময়কাল (the period) ও মোহর (dower)।[৬১]

মালদা জেলার মুসলিম নারীর বৈবাহিক অবস্থানঃ

মালদা জেলার মুসলিম মহিলাদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা গবেষণা করতে গিয়ে আমরা তাদের বৈবাহিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি। মালদা জেলার চারটি ব্লক ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা), কালিয়াচক ১, মানিকচক ও রতুয়া ১ ব্লক কে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে সমীক্ষা করতে গিয়ে সেখানে মুসলিম মহিলাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্নসূচির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বৈবাহিক জীবন যেহেতু নারী সামাজিক মর্যাদার সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত তাই উক্ত এলাকার মুসলিম মহিলাদের বৈবাহিক মর্যাদা সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য গুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ

করা কালীন এটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে মালদা জেলার মুসলিম মহিলাদের মধ্যে মুতা (muta) পদ্ধতিতে বিবাহ একেবারেই প্রযোজ্য নয়।

সারণি ৩৯

মালদা জেলার মুসলিম নারীর বৈবাহিক অবস্থান

ব্লক	বিবাহিত	অবিবাহিত	বিবাহ বিছিন্ন	বিধবা	মোট
কালিয়াচক ১	৩২৫ (১৬.২৫%)	৭০ (৩.৫%)	৪০ (২%)	৬৫ (২.৬%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	২৫০ (১২.৫%)	১৭৫ (৮.৭৫%)	৫০ (২.৫%)	২৫ (১.২৫%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	২৭৫ (১৩.৭৫%)	১৬০ (৮%)	৩৫ (১.৭৫%)	৩০ (১.৫%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	৩৫০ (১৭.৫%)	৭০ (৩.৫%)	২৫ (১.২৫%)	৫৫ (২.৭৫%)	৫০০ (২৫%)
মোট	১২০০ (৬০%)	৪৭৫ (২৩.৭৫%)	১৫০ (৭.৫%)	১৭৫ (৮.৭৫%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

উপরোক্ত সারণিতে কালিয়াচক ১, ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা), মানিকচক, রতুয়া ১ প্রভৃতি এলাকার মুসলিম মহিলার বৈবাহিক সামাজিক অবস্থান বোঝার জন্য বিবাহিত-অবিবাহিত, বিবাহ বিচ্ছিন্ন ও বিধবা প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। উপরোক্ত সারণিতে বিবাহিত মহিলা সংখ্যাধিক্য দেখা যাচ্ছে। পরিবারে বিবাহিত মহিলাদের সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষমতা বেশি থাকে তার স্বামীর আর্থিক আয়ের জন্য। ঠিক তেমনি বিবাহ বিচ্ছিনা নারীদের হীন চোখে দেখা হয় এবং বিবাহ বিচ্ছিন্নতার জন্য নারীকেই সর্বাধিক দায়ী করা হয়। নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক সুরক্ষিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব ধর্মের জনগণকে নিজেদের বিবাহ রেজিস্ট্রি করনের নির্দেশ দিয়েছে। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন এর উদ্দেশ্যই হল বিবাহের সরকারি প্রমাণ ও বিবাহ বিচ্ছেদ

সহজ ও সুরক্ষিত করা। যদিও মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর মতে মুসলিমদের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অত্যাবশ্যক নয় কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল’ কখনোই বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের বিপক্ষেও নয়।[৬২]

মালদা জেলার মুসলিম নারীদের নমুনা হিসেবে সনাক্ত করার পর তাদের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সারণিটি প্রযোজ্য।

সারণি ৪০

মালদা জেলার মুসলিম নারীর বিবাহ নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত তথ্য

ব্লক	নিবন্ধভুক্ত	নিবন্ধভুক্ত নয়	প্রযোজ্য নয় (অবিবাহিত)	মোট
কালিয়াচক ১	৩০০ (১৫%)	১৩০ (৬.৫%)	৭০(৩০৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	২৭৫ (১৩.৭৫%)	৫০ (২.৫%)	১৭৫ (৮.৫%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	২৫০ (১২.৫%)	৯০ (৪.৫%)	১৬০ (৮%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	২৬০ (১৩%)	১৭০ (৮.৫%)	৭০ (৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
মোট	১০৮৫ (৫৪.২৫%)	৪৪০ (২২%)	৪৭৫ (২২%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

উপরোক্ত সারণী থেকে পরিষ্কার যে ২০০০ মুসলিম নারীর নমুনার মধ্যে ৫৪.২৫ শতাংশ নারী বিবাহ নিবন্ধীকরণ হয়েছে এবং ২২ শতাংশ নারীর বিবাহ নিবন্ধন হয়নি। সারণি থেকে আরো পরিষ্কার যে গ্রাম্য এলাকার তুলনায় পৌর এলাকার বিবাহ নিবন্ধনের পরিমাণ বেশি। সরকারি ভাবে বিবাহ নিবন্ধীকরন একজন নারীর জীবনকেও সুরক্ষিত করে। আইনজীবী ও গবেষক তাবাসসুম তার গ্রন্থ “*স্ট্যাটাস অফ মুসলিম ওমেন ইন ইন্ডিয়াতে*” বলেছেন কাজী অফিসে মুসলিম বিবাহ দুটি নিবন্ধীকরণ হয় এবং কাজী অফিস থেকে সেগুলি প্রত্যেক মাস অথবা তিন মাস অন্তর সরকারিভাবে নিবন্ধীকরণ জন্য পাঠানো হয়। তিনি আরো বলেছেন যে সরকারি বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বিভিন্ন নিশ্চয়তা দান করে এবং শরীয়ত আইন বিবাহ রেজিস্ট্রেশন এর বিপক্ষেও নয়।[৬৩] উপরোক্ত সারণি থেকে এটি পরিষ্কার যে মালদা জেলার বেশিরভাগ মুসলিম জনগণ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন এর পক্ষে।

কাজী অফিস থেকে তিনটি বিবাহ প্রমাণপত্রের মধ্যে একটি পাত্রীপক্ষ, আরেকটি পাত্রপক্ষ এবং আরেকটি কাজী অফিস থেকে নির্দিষ্ট এলাকার ওয়াকফ বোর্ডের অফিসে পাঠানো হয়। এতে বিবাহ নিবন্ধঃকরণ প্রক্রিয়া আরো শক্তপক্ত হয় এবং নারীর জীবনের সুরক্ষা প্রদান করে।

যৌতুক: বিবাহের সময় কন্যার পরিবার নববধূ ও পাত্রকে বহু মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে থাকে তাই যৌতুক হিসেবে পরিচিত। গবেষক রৌলেট তার প্রবন্ধে বলেছেন যৌতুক বিবাহের অঙ্গ নয় তবে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নির্দেশনের জন্য বহু মানুষ বিবাহের সময় যৌতুক দিয়ে থাকে।[৬৪] আইনত ভারতে যৌতুক প্রদানকে বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সর্ব ধর্ম শ্রেণীতে এটি সমান গুরুত্ব সহকারে বর্তমান।[৬৫] গবেষক এম. এন. শ্রীনিবাস আরও বলেছেন যৌতুকের রূপ বদলেছে, যার ফলে বহু লোকজন সংকটজনক অবস্থাতেও ব্যয়বহুল ভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছে।[৬৬] ইসলাম কখনোই যৌতুকের সমর্থক নয়। কিন্তু ভারতের মুসলিম সমাজের বিবাহের যৌতুক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। মালদা জেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। যৌতুকের চাপে কন্যার পিতা কন্যার বিবাহ দিতে গিয়ে সর্বসান্ত হয়ে যায়। যৌতুকের জন্য বিবাহ ভেঙে যেতেও দেখা যায়। বিবাহ বিচ্ছেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই যৌতুক প্রথা। ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে মুসলিম নারীদের কাছে তাদের বিবাহের সময় যৌতুকের পরিমাণ ও তার প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারি।

সারণি ৪১

মালদা জেলায় মুসলিম নারীর যৌতুক প্রদান

ব্লক	যৌতুক গ্রহন করেছে	যৌতুক গ্রহন করেনি	প্রযোজ্য নয় (অবিবাহিত)	মোট
কালিয়াচক ১	৩৫০ (১৭.৫%)	৮০ ৪%)	৭০ (৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	২৮০ (১৪%)	৪৫ (২.২৫%)	১৭ ৫(৮.৭৫%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	২৯০ (১৪.৫%)	৫০ (২.৫%)	১৬০ (৮%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	৩৯০ (১৯.৫%)	৪০ (২%)	৭০ (৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
মোট	১৩১০ (৬৫.৫%)	২১৫ (১০.৭৫%)	৪৭৫ (২৩.৭৫%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় মালদা জেলায় মুসলিম বিবাহে যৌতুকের পরিমাণ নেহাত কম নয় এবং নিজের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী যৌতুকের পরিমাণ স্থির হয়ে থাকে। আর সেক্ষেত্রে পাত্রপক্ষের চাপ বেশি থাকে। কন্যার পিতা অনেক সময় ভালো পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে নিজের সামর্থের বাইরে গিয়েও যৌতুক দিতে রাজি হয়ে যায় ফলে তাকে সর্বশান্ত হতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষায় একটি নারী কালিয়াচক ১ ব্লকে সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নিবাসী নাজিরা সুলতানার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি কিভাবে তার বিবাহ দিতে গিয়ে তার পিতা সর্বশান্ত হয়েছে। যদিও তার বিবাহ দীর্ঘমেয়াদী হয়নি, পাত্রপক্ষের অতিরিক্ত লোভ লালসা তাকে সংসার জীবন করতে দেয়নি। উপরোক্ত সারণিতে লক্ষ্যনীয় যে, যৌতুকের পরিমাণ ও হার শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে বেশি। ইংরেজবাজার পৌর এলাকায় যৌতুকের হার যেখানে ১৪ শতাংশ সেখানে কালিয়াচক ১, মানিকচক, রতুয়া ১ প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল এলাকা গুলিতে যৌতুকের হার যথাক্রমে ১৭.৫%, ১৪.৫ শতাংশ, ১৯.৫%। এর কারণ হিসেবে বলা যেতেই পারে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলে শিক্ষার হার তুলনামূলক বেশি। শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক অবস্থার উপর যৌতুকের হার ও পরিমাণ নির্ভর করে। এই যৌতুক কখনো নগদ টাকা, কখনো সোনা গহনা বা বাড়ির আসবাবপত্র হিসেবেও দেওয়া হয়। ভারতের সর্বত্র বিবাহের সময় কন্যার পিতা কন্যা সুখ-শান্তির দিকে তাকিয়ে যৌতুক প্রদান করে। মালদা জেলায় সমীক্ষা ক্ষেত্র গুলিতে বহু নারী স্বীকার করেছেন যে পাত্রপক্ষের দাবি ছাড়াই পাত্রীর পিতা যৌতুক দিয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পাত্রীর পিতার ওপর বিবাহের সময় বা বিবাহের পরেও যৌতুকের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। এমনকি যৌতুকের লোভে বহু মেয়ের মৃত্যুও হয়েছে যা আমরা খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পায়।

মেহর: মুসলিম বিবাহ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল মেহের। এটি একটি উপহার, যা স্ত্রী বিবাহের সময় তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এটি কখনো নগদ অর্থে অথবা গহনা রূপে প্রদান করা হয়, যার ওপর একমাত্র স্ত্রীর অধিকার। এটিকে কেউ কেউ প্রটেকশন মানি বা স্ত্রীধনও বলে থাকে। প্রাক ইসলাম আরবে দুই ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রথম প্রকার, বিনা (Beena)

বিবাহ প্রথাতে কন্যা বিবাহের পরেও পিত্রালয়ে বসবাস করত এবং তার স্বামী মাঝে মাঝে তার স্ত্রীর কাছে আসত। সেই সময় স্বামী তার স্ত্রীর জন্য বিভিন্ন উপহার নিয়ে আসত, যা সাদাখ (Sadaq) নামে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় প্রকার (Baala Marriage) বিবাহে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু এই বিবাহে স্বামী স্ত্রীর পিতাকে অর্থ দিয়ে থাকে। এই বিবাহে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর পিতাকে প্রদেয় অর্থ মেহের (Meher) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে তা স্ত্রী ধন এর রূপ লাভ করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বালা পদ্ধতিতে বিবাহের মেহের সাথে বিনা বিবাহের সাধকের মিশ্রণ ঘটিয়ে স্ত্রীর গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ইসলামী আইন অনুযায়ী মেহের শুধুমাত্র স্ত্রীর প্রাপ্ত সম্পত্তি। বিবাহের সময় বর পক্ষ ও কন্যা পক্ষের আপোস আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত অর্থ স্বামী তার স্ত্রীকে দিয়ে থাকে। মেহের স্ত্রী দাবি করলে বিবাহের সময় তাৎক্ষণাৎ স্বামীকে দিতে হবে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের সময় স্ত্রীকে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। বর্তমান গবেষণায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে মালেদহের বেশিরভাগ মেয়েরা বিবাহের সময় মেহের থেকে বঞ্চিত থাকে। এমনকি সারা জীবনেও স্বামী তার স্ত্রীকে মেহের প্রদান করে না এবং শেষ জীবনে গিয়ে স্ত্রীর কাছে মেহের প্রদান না করার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কারণ সে তার স্ত্রীকে মেহের থেকে বঞ্চিত করেছে। নিম্নোক্ত সারণির থেকে মালদা জেলার মুসলিম নারীর মেহের প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত তা বোঝা যাবে। মালদা জেলার কালিয়াচক ১, ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা), মানিকচক, রতুয়া ১ এলাকা গুলির মুসলিম নারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সারনীটি নির্মিত।

সারণি ৪২

মালদা জেলার মুসলিম নারীর মেহের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির পরিসংখ্যায়ন

ব্লক	মেহের প্রাপ্ত (তাৎক্ষনিক)	মেহের অপ্রাপ্ত (বিলম্বিত)	প্রযোজ্য নয় (অবিবাহিত)	মোট
কালিয়াচক ১	১৭৫ (৮.৭৫%)	২৫৫ (১২.৭৫%)	৭০ (৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	২২৫ (১১.২৫%)	১০০ (৫%)	১৭৫ (৮.৭৫%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	১৫৫ (৭.৭৫%)	১৮৫ (৯.২৫%)	১৬০ (৮%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	১৭৩ (৮.৬৫%)	২৫৭ (১২.৮৫%)	৭০ (৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
মোট	৭২৮ (৩৬.৪%)	৭৯৭ (৩৯.৯%)	৪৭৫ (২৩.৭৫%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

সারণীতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে মেহের অপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যায় বেশি এবং লক্ষ্যণীয় যে, মালদার ইংরেজবাজার পৌর এলাকায় মেহের অপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা, কালিয়াচক ১, মানিকচক, রতুয়া ১ প্রভৃতি জায়গার তুলনায় কম। এর কারণ হিসেবে বলা যায় অশিক্ষা, দারিদ্রতা ও সর্বোপরি ইসলামিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা গ্রামাঞ্চলে সর্বাধিক। যদিও ইসলামিক আইনে মেহের সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যা শুধুমাত্র স্ত্রীর সম্পত্তি। স্ত্রীকে মেহের প্রধান থেকে বিরত থাকা মানেই তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা। যারা বিবাহের তাৎক্ষণিক মেহের প্রদান করে না তারা জীবনের মৃত্যুর সময়, বিবাহ বিচ্ছেদের সময় বা জীবনের কোন বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মেহের দিতে রাজি হয়। গবেষক জয়া হাসান বলেছেন বেশিরভাগ সময় মুসলিম নারীরা তার শশুর বাড়ির লোকজনের চাপে নিজের মেহের দাবী করতে পারে না এবং তার স্বামীকে মেহের প্রদান থেকে মুক্তি দেয়।[৬৭] বহু সময় দেখা যায় গ্রামেগঞ্জে বিবাহের সময় মেহেরের উল্লেখ না থাকায় মুসলিম নারীরা মেহের দাবী করতে পারে না। এছাড়াও দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা, বৃহৎ পরিবার, অশিক্ষা প্রভৃতির জন্যও নারী বহু সময়ই তার মোহর দাবী থেকে বঞ্চিত থাকে।

ইসলামিক আইন মতে বিবাহের সময় মেহের নগদার্থে অথবা স্বর্ণ দিয়ে অথবা অর্থ ও স্বর্ণ মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সমীক্ষা ক্ষেত্রগুলি থেকে মুসলিম নারীর কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সারণিটির নির্মাণ করা হয়েছে।

সারণি ৪৩

মালদা জেলার মুসলিম নারীর মেহের প্রাপ্তির ধরন

ব্লক	নগদ অর্থ	স্বর্ণ	নগদ অর্থ ও স্বর্ণ মিলিয়ে	প্রযোজ্য নয় (অবিবাহিত)	মোট
কালিয়াচক ১	১২৫ (৬.২৫%)	১০০ (৫%)	২০৫ (১০.২৫%)	৭০ (৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	১৫০ (৭.৫%)	৬০ (৩%)	১১৫ (৫.৭৫%)	১৭৫ (৮.৭৫%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	১২০ (৬%)	৯০ (৪.৫%)	১৩০ (৬.৫%)	১৬০ (৮%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	১৩০ (৬.৫%)	১১০ (৫.৫%)	১৯০ (৯.৫%)	৭০ (৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
মোট	৫২৫ (২৬.২৫%)	৩৬০ (১৮%)	৬৪০ (৩২%)	৪৭৫ (২৩.৭৫%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

নিকাহ বা বিবাহের কন্যা অর্থ ও স্বর্ণ গহনা বাবদ যে উপহার লাভ করে তাই হল মোহর। সারণী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মালদা জেলার সমীক্ষা ক্ষেত্রগুলিতে মুসলিম নারীর প্রাপ্ত মোহরের পরিমাণ ছিল নগদ অর্থে ২৬.২৫ শতাংশ, স্বর্ণ-১৮ শতাংশ, নগদ অর্থ ও স্বর্ণ বাবদ ৩২ শতাংশ। কখনো নগদ অর্থে অথবা কখনো স্বর্ণবাবদ মোহর পেয়ে থাকে আবার কেউ কেউ উভয়ই পেয়ে থাকে।

সাধারণত মেহেরের পরিমাণ পাত্রপক্ষের আর্থিক অবস্থা ও পাত্রের আয় অনুযায়ী উভয় পক্ষের সম্মতিতে স্থির হয়। এটি একজন বিবাহিত নারীকে বিবাহিত জীবনে সুরক্ষা প্রদান করে।

ইসলাম ধর্ম মেহেরের মাধ্যমে নারীকে সুরক্ষা প্রদান করেছে। কিন্তু বাস্তবে এটি কাগজে-কলমের সীমাবদ্ধ, বহু নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত তা পূর্বে সারণি থেকে পরিষ্কার।

গবেষক ওয়াকিল আহমেদ তার 'মহামেডান ল' গ্রন্থে বলেছেন হাদীসে উল্লেখ আছে অজ্ঞতার যুগে নারীর ধন বা সম্পত্তি যা বিবাহ সূত্রে লাভ করত তা অন্য কেউ (পাত্রপক্ষ) ভোগ করত, একে বলা হয় সিগার (Shigar)।এই প্রথায় কন্যা পক্ষ বিবাহের সময় কন্যাকে বহু ধন-সম্পত্তি স্বর্ণ প্রদান করত এই আশায় যে অন্যান্যরাও তার কন্যাকে বিবাহের সময় সমপরিমাণ ধন-সম্পত্তি বা জিনিসপত্র দেবে। এই ধরনের বিবাহে কন্যা কোন মেহের পেতো না।[৬৮] ইসলাম আবির্ভাবের পর এই ধরনের প্রথা বাতিল করে এবং মেহের একমাত্র নারীর সম্পত্তি এবং কেউ এর ওপর দাবি করতে পারবে না বলে ঘোষণা করে। ইসলামী শরীয়তে মেহেরের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। মেহের নির্ভর করছে দুই পক্ষের (পাত্র ও পাত্রী পক্ষ) আর্থিক অবস্থার ওপর। মেহের বিবাহের তৎক্ষণাৎ প্রদান করা উচিত অথবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান করতে হবে। যদি কেউ তার জীবদ্দশায় মেহের প্রদান না করে তাহলে তার অস্থাবর সম্পত্তি থেকে তা প্রদান করতে হবে। যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তাহলেও তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের সময় মেহের প্রদান করতে হবে ও তার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য অর্থ দিতে হবে। যতক্ষণ না স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করছে অথবা জীবনধারণের অন্য কোন উপায় অবলম্বন করছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেহের সারা জীবন একটি বারও দেওয়া হয় না (বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যতীত)।

গবেষক পারাস দেওয়ান বলেছেন যদি কোন স্বামী তাৎক্ষণিক মেহের প্রদান করতে অস্বীকার করে তাহলে অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীর অভিভাবক তার কন্যাকে স্বামীর গৃহে পাঠাতে অস্বীকার করতে পারে। অথবা একইভাবে কোন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে অস্বীকার করতে পারে (বিবাহের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে)।[৬৯] মুসলিম আইন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক মেহের না দেওয়া পর্যন্ত নারী তার স্বামীর থেকে পৃথক থাকতে পারে এবং স্বামী তা মেনে চলতে বাধ্য হবে। তবে মেহের দিতে বিলম্বিত হওয়া বা না পারলেও স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার অস্বীকার

করা যায় না। জোরপূর্বক মেহের আদায় শুধুমাত্র মৃত্যু অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণেই সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলাতেও অধিকাংশই বিলম্বিত মেহের প্রদান করে, যার মধ্যে অধিকাংশই সারা জীবনে একবারও মেহের প্রদেয় নয় এবং তা শুধুমাত্র কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ।

বিবাহ বিচ্ছেদ:

বিবাহ বিচ্ছেদ হল বৈবাহিক জীবনের সবথেকে অসুখী পর্যায় এবং আল্লাহ দ্বারা সমর্থিত সকল বিধানের মধ্যে সবথেকে নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়। ইসলামে বৈবাহিক মর্যাদার ব্যতিক্রম পর্যায় হল বিবাহ বিচ্ছেদ। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ইসলামিক আইন দ্বারা যা কিছু সমর্থিত বিবাহ বিচ্ছেদ হল নিকৃষ্ট ও জঘন্য।[৭০] এটিকে যতদূর সম্ভব এড়ানো উচিত। কিন্তু কখনো কখনো এটি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যখন দুই পক্ষের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকে না এবং বিবাহিত জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তখন বিবাহ বিচ্ছেদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আরবে বিবাহবিচ্ছেদ ছিল নির্যাতন স্বরুপ। সেই সময় স্বামী তার স্ত্রীকে কোন কারণ ছাড়াই যে কোন মুহূর্তে তালাক দিতে পারত, আবার তারা তালাক বাতিল করে যে কোন সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিত। পুনরায় স্ত্রীকে তালাক দিত বারংবার চলতে থাকা এই প্রক্রিয়াকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় বলেছেন এবং তিনি এই সামাজিক পাপ কার্যকে দূর করার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে বিবাহিত সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করার দিকে মনোনিবেশ করেন।[৭১]

আমরা জানি ইসলামের সিদ্ধ অর্থাৎ তালাক হালাল বিষয়। এটি অবৈধ নয় বরং বৈধ প্রথা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন আল্লাহর নিকট যত বৈধ হালাল বস্তু আছে তার মধ্যে তালাক অপ্রিয়। গবেষক ডঃ ওসমান গনি লিখেছেন এই কথার দ্বারা ইসলাম ধর্ম মানুষকে বিবাহ বিচ্ছেদের কাছে যেতেও বারংবার চিন্তা করার কথা বলেছেন কোন উপায় না থাকলে তবেই তালাকের প্রয়োজন হবে নচেৎ নয়।[৭২] এ প্রসঙ্গে গবেষক অলকা সিং বলেছেন ইসলাম বিবাহ বিচ্ছেদের কতগুলি শর্ত আরোপ করেছে। পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালোবাসা, বিশ্বাস, সম্মান ব্যতীত কোন

বিবাহিত সম্পর্ক স্থায়ী হয় না এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কাছে ইসলাম সমর্থিত সমস্ত বস্তুর মধ্যে নিকৃষ্ট হল তালাক। পারিবারিক জীবনে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি বিবাহিত জীবনের রক্ষাকবচ হিসেবে হযরত মুহাম্মদ তালাকের উপর কতগুলি শর্ত আরোপ করেছেন।[৭৩]

ইসলামে তালাক স্ত্রী নির্ভর। ইসলামিক বিধি অনুযায়ী তালাক অনেকটাই স্ত্রী জাতির ওপর নির্ভর করে। পুরুষ চাইলেই তালাক দিতে পারে না, তাকে কতগুলো শর্ত মানতে হবে। ডক্টর ওসমান গনি তার 'ইসলাম ও নারী সমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, যদি স্ত্রীর চির রুগ্ন হয়, স্ত্রী যদি বন্ধা হয়, স্ত্রী যদি ব্যাভিচারিনী হয়, স্ত্রী যদি ঘর সংসার করতে অনিচ্ছুক হয়, এই চারটি কারণ ব্যতীত স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না। আবার ঠিক তেমনি স্ত্রীও চাইলেই স্বামীকে খুলা তালাক দিতে পারেনা।[৭৪] নাবালিকা অবস্থায় বিবাহিত মহিলা যদি সাবালক বা যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, স্বামী যদি আর্থিক দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে, স্বামী যদি ধর্ম পরিবর্তন করে, যদি পুরুষত্বহীন হয়, উভয় তরফে যদি সংক্রামক ব্যাধি থাকে, স্বামী যদি স্বেচ্ছায় স্ত্রী ত্যাগ করে ও যদি নিরুদ্দেশ হয় অথবা যৌনসঙ্গমে অপারগ থাকে, এই সমস্ত কারণের সমন্বয়ে বা সম্বলিত কারণে স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারে।[৭৫]

গবেষক ফৈজী বলেছেন ইসলামিক আইনের সবথেকে বড় ত্রুটি হল কোন কারণ ব্যতীত পুরুষের হাতে তালাক দেওয়ার সমস্ত অধিকার প্রদান। মেহের যদিও কিছু ক্ষেত্রে এই প্রথার বাধা প্রদান করছে। তালাক দ্বারা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী হল নারীরা।[৭৬] কোন আইন দ্বারা বৈবাহিক সুখ শান্তি বজায় রাখা যায় না, কিন্তু মানবীয় আইন দ্বারা তার কিছুটা উপশম করা যায়। কিন্তু যখন বিবাহিত জীবন নষ্ট হয় ভুল বোঝাবুঝি, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার প্রকৃতির ফলে যখন ঘর ভাঙতে শুরু করে, মানসিক নির্যাতন চরমসীমায় পৌঁছায় তখন নারীর স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে তালাক। যদিও এটি শুধুমাত্র পুরুষদের দাঁড়ায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান নারীর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা গুলির রক্ষার জন্য তালাক অবশ্যই প্রয়োজনীয়। স্বামীর দ্বারা উচ্চারিত তালাক শব্দ দ্বারা দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে অথবা স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে

বিবাহিত জীবন আর স্থায়ী হয় না।[৭৭] গবেষক ফৈজী আরও বলেছেন দীর্ঘদিনের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক স্বামীর দ্বারা বা স্ত্রীর দ্বারা বা পারস্পরিক সম্মতিতে অথবা আইনের দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। তালাক প্রথার যাই প্রয়োজন থাকুক না কেন হানাফি স্কুল মতে এটি হল একপাক্ষিক স্বামীর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত।[৭৮]

মালদা জেলায় অধিকাংশ হানাফি মতাবলম্বী থাকায় তালাকের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পুরুষের ওপর ন্যস্ত এবং নারীরা সমস্ত অন্যায় মুখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য থাকে।

গবেষক জাকিয়া সিদ্দিক ও আনোয়ার জুবের উল্লেখ করেছেন বিবাহ হল দুই পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি। স্বামী এক তরফা ভাবে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে না। যদি সে (স্বামী) তা করে তবে তাকে ইদ্দতপর্ব শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ তালাকের পরেও স্ত্রীর ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহন করতে হবে। যদি স্ত্রী স্বেচ্ছাকৃতভাবে তার স্বামীকে খুলা তালাক বা মুবারাত তালাক দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য নয় এবং সে এইসব ক্ষেত্রেই স্ত্রী তার নিজের ভরণপোষণ নিজেই চালাতে পারে অথবা পিতা মাতাকে তার দায়িত্ব নিতে হবে।[৭৯] মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯ দ্বারা মুসলিম নারী কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোর্টে গিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। ১৯৩৭ সালে ভারত সরকারের ক্রিমিনাল আইনের ১২৫ নম্বর ধারা দ্বারা মুসলিমসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের যেকোনো মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের পরও স্বামীর কাছে ভরণপোষণ দাবি করতে পারে।

তালাকের ধরন ও শ্রেণীবিভাগ:

বিভিন্ন ধরনের তালাকের মাধ্যমে মুসলিম নরনারীর বিবাহিত জীবনে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। কখনো কখনো স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর মাধ্যমে ঘটতে পারে, আবার দুই পক্ষের (স্বামী-স্ত্রী) কার্যকারিতার দ্বারা বা কোর্টে গিয়েও ঘটে থাকতে পারে। গবেষক ফৈজী বলেছেন ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদ লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।[৮০] যেমন যখন স্বামীর তরফ থেকে বিবাহ

বিচ্ছেদের প্রস্তাব আসবে তখন তা তালাক নামে পরিচিত হবে, স্ত্রীর তরফ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব আসবে তখন তাকে বলা হবে খুলা, আবার যখন উভয়ের সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ হলে তাকে বলা হবে মুবারা। স্ত্রী কোর্টে বা কাজীর কাছে গিয়ে বিবাহিত জীবনে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে তাকে ফাঁসক বলে।[৮১]

তালাকের পদ্ধতিগুলিকে নিম্নে এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে

১. স্বামীর তরফ থেকে তিন ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। যথা- তালাক, ইলা, জিহার।

২. স্ত্রীর তরফ থেকে দু ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে- খুলা ও তালাক-ই-তাফঈদ।

৩. উভয়ের সম্মতিক্রমে দু ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে- খুলা ও মুবারা। এবং

৪. বিচার পদ্ধতির দ্বারা লিয়ান ও ফাসাক, এই দুই ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে।

উপরোক্ত তালাক ও খুলার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এখন বাকিগুলো অল্পবিস্তার আলোচনা প্রয়োজন। যার মধ্যে বেশ কিছু বর্তমানে অস্তিত্ব নেই বা প্রয়োগ করা হয় না।

ক) স্বামীর তরফ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদঃ

ইলা: বিবাহ বিচ্ছেদের এই পদ্ধতিটি **১৯৩৭** এর শরীয়ত আইনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। তবে এর প্রয়োগ ভারতে নেই এবং এই পদ্ধতি সম্পর্কে হানাফী ও শাফেঈ মতবাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রী চার মাস বা তারও বেশি যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকে, তবে হানাফী মতে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা বিবাহ বিচ্ছেদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু শাফেঈ মতে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আইনি পদ্ধতি প্রয়োগ প্রয়োজন।

জিহার : এই পদ্ধতি প্রাক ইসলাম পর্বে আরব দেশে প্রচলিত ছিল ভারতে এর অস্তিত্ব নেই যখন স্বামী তার স্ত্রীকে মাতৃ তুল্য বলে মনে করবে বা স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করবে তখন তা জিহার বিবাহ বিচ্ছেদ হবে।

খ) স্ত্রী দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদঃ

তালাক-ই-তাফঈদঃ এই তালাক পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্ত্রীর ওপর নির্ভর করে। মুসলিম বিবাহ আইনে বিবাহ ভঙ্গের সম্পূর্ণ অধিকার স্ত্রীকে দিয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রী চাইলেই স্বামীকে বা স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে, বিষয়টি পুরোপুরি স্ত্রীর ইচ্ছাধীন।

খুলা: খুলা তালাকটিও স্ত্রীর সম্পুর্ন ইচ্ছাধীন। স্ত্রী চাইলেই স্বামীর কাজ থেকে মুক্তি পেতে পারে। ইসলামী আইনে এটি মেয়েদের জন্য ভীষণ কার্যকারী ব্যবস্থা এবং এর জন্য আদালতের বা কাজির দ্বারস্থ হতে হয় না।

মুবারা: মোবারা শব্দের অর্থ হলো মুক্তি, স্বামী স্ত্রীর পারস্পারিক সম্মতি ক্রমে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ করতে চাইলে মুবারক পদ্ধতিতে তালাক হয়ে থাকে। শরীয়তে এই আইনকে ভারতের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৪ ও হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৭৬ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিচার পদ্ধতির দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদঃ

ফাসাখ: এই পদ্ধতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য আইনের দ্বারস্থ হতে হয়। যদিও ইসলাম বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ অনুমোদন করে না। ফাসাখ পদ্ধতিতে একজন কাজী বা বিচারক স্ত্রীর আবেদনের ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিতে পারে।

লায়ান: এই পদ্ধতিতে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিলে, স্ত্রী স্বামীর থেকে তালাক চাইতে পারে। এই তালাক পদ্ধতিটিকে লায়ন বলা হয়। কোরান ও হাদিস লিয়ান পদ্ধতিতে মুসলিম মহিলাকে তালাকের অনুমতি দিয়েছে।

কুরআনের সূরা আল বাকারা এবং সূরা আল তালাক এ তালাকের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার বর্ণনা রয়েছে তালাকের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন তাত্বিক গ্রন্থের তিনটি বিশেষ ধরনের তালাকের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন– তালাক-ই-আহসান, তালাক-ই-হাসান, তালাক-ই-বেদাৎ।

তালাক-ই-আহসান ও তালাক-ই- হাসান হলো অতি উত্তম তালাক ও উত্তম তালাক।[৮২] এই দুই ধরনের তালাকে দুইজন সাক্ষীর সামনে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এই দুই ধরনের তালাক দীর্ঘ মেয়াদী। এই দুই তালাকেই স্বামী স্ত্রীকে বিচ্ছেদের তিক্ত ময় ক্ষনগুলিতে নিজেদের ভুলগুলি শুধরে নেওয়ার ও সদ্ভাব এবং শিষ্টাচারের জন্য সময় বরাদ্দ করেছে। আর যে সমস্ত তালাক ইসলামিক নীতি পরিপন্থী তাকে তালাক-ই-বিদাৎ বলে। যেমন- একসাথে তিন তালাক ও সহবাসের পবিত্র কালে তালাক দেওয়া প্রকৃতি।[৮৩]

নিকাহ হালালা: নিকাহ শব্দের অর্থ বিবাহ, হালাল শব্দের অর্থ হালাল বা শুদ্ধ বা আইন সিদ্ধ করা। ইসলামে নিক্কাহ হালাল শব্দের অর্থ হলো কোনো তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী তার পূর্বের স্বামীর জন্য বৈধ বা হালাল হবে তখনই যখন ওই স্ত্রীর নিকাহ হালালা সংঘটিত হবে অর্থাৎ নিকাহ হালালা হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তার পূর্বের স্বামীর জন্য বৈধ হবে, যদি নতুন স্বামী তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয় তবেই তা সম্ভব হবে।

“যদি কোন স্বামী স্ত্রীকে (তৃতীয়বার তালাক) বর্জন করে, তারপরে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে (স্ত্রী) পূর্ব স্বামীর জন্য বৈধ নয়।[৮৪]

অন্য স্বামী বা দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেয় তবে পুনরায় বিবাহ সম্ভবপর। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় দ্বিতীয় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় না। নিকাহ হালালের ঘটনা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় দেখা যায়। পূর্বের স্বামী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয় এবং তার সাথে চুক্তি করে যে, সে (দ্বিতীয় স্বামী) স্ত্রীকে তালাক দেবে এবং তারপর প্রথম স্বামী বিবাহ করবে। এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক ও কোরান বিরোধী। দ্বিতীয় স্বামীকে কোনভাবে বাধ্য করা যাবে না বা কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না। দ্বিতীয় স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তালাক দেয় তবেই সম্ভব নতুবা নয়। শরীয়তী আইনের ফাঁদে ফেলে অনেক মানুষ নিকাহ হালাল করার পরেও তালাক দিতে অস্বীকার করে কারণ দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেবে, তাকে কোন ভাবে জোরপূর্বক তালাক দিতে বাধ্য করা যাবে না। মহিলাদের খুলা তালাক থাকায় অনেক

মহিলা প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরেছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে যে তালাক দিল স্বামী কিন্তু এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে স্ত্রীকে। স্ত্রীর সম্মান মান, মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে নিকাহ হালাল করতে বাধ্য করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় নিকাহ হালালর ঘটনা প্রবাহ চলছে, তবে তা সংখ্যায় কম। তবে বর্তমানে নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং নিকাহ হালালার মত বিষয়কে তারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ১৮৬০ সালের ইন্ডিয়ান পিনাল কোড এর ৩৭৫ সেকশন অনুযায়ী নিকাহ হালালা নামক ইসলামের এই প্রয়োগকে ধর্ষণের সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়েছে। কারণ সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে সংসার জীবনযাপনের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বাধ্য হয়। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যৌন সম্ভোগ থাকে না, তাই এটিকে ধর্ষণ বলাই যায়। নিকাহ হালালার বিরুদ্ধে বর্তমানে মুসলিম নারীরা প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। এর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়, গবেষক জিয়াউস সালাম এর '*নিকাহ হালালা*' গ্রন্থে সেখানে তিনি সাবনাম রানীর করুন কাহিনী তুলে ধরেছেন। দিল্লি নিবাসী শবনমের মোজাম্মেল নামক এক ব্যক্তির সাথে ২০১০ সালে ৫ লক্ষ টাকার পণ দিয়ে বিবাহ হয় কিন্তু বিবাহের পরও তার অর্থ লিপ্সা মেটেনি এবং সে অতিরিক্ত অর্থের জন্য শবনম ও তার পিতামাতাকে চাপ দিতে থাকে। টাকা না পেয়ে শবনম কে তিন তালাক দেয়। কিন্তু পরে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় সাবনামকে ফিরিয়ে নিতে চাই কিন্তু নিকাহ হালালা করার পর এবং মোজাম্মেল তার ভাইয়ের সাথে শবনমের বিবাহ দিতে চায়। কিন্তু শবনম অস্বীকার করলে তাকে তার দেওর ও অন্যান্যরা অ্যাসিড ছুড়ে দেয়। কিন্তু শবনম নিকাহ হালালা না করে কোর্টের দ্বারস্থ হয় আজও তা বিচারাধীন।[৮৫]

নিকাহ হালালা বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ দেখা দিলেও আমাদের সকল স্তরের মুসলিমদের মধ্যে প্রতিবাদ করতে হবে এবং সকল মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামিক শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে হবে। মৌলবীদের কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা মুসলিম নারীর মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তার জন্য শিক্ষার

প্রসার ভীষণভাবে জরুরী, তাহলেই মৌলবাদীদের খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তুচ্ছ কারণে তালাক দেওয়া বন্ধ করতে হবে তাহলে আর নিকাহ হালালার প্রয়োজন পড়বে না।

তিন তালাক: হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরবর্তীকালে দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে গড়ে ওঠা ইসলামিক শরীয়ত বিভিন্ন সভ্যতার প্রভাবে জটিল আকার ধারণ করেছে। শরীয়তে তিন তালাক সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাব এর পূর্বে জাহেলিয়া যুগের একত্রে তিন তালাক প্রচলিত ছিল। পুরুষ ইচ্ছা করলেই যে কোন সময় তালাক বা বিবাহ করতে পারত। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক পর্বেও তালাকের স্বেচ্ছাচার ছিল। তালাক প্রথা নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সাধারণত দেখা যায় এ দুই তালাক উচ্চারণের পরই মুসলিম নারী ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে কখন তার স্বামী তিন তালাক উচ্চারন করে।[৮৬] হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময় থেকে তিন তালাক একত্রে অনুমতি ছিল না। দ্বিতীয় খলিফা ওমর একত্রে তিন তালাক পুনরায় চালু করেছিলেন এর অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য। কেননা আরব ব্যবসায়ীরা প্রায় তার প্রথম স্ত্রীকে লুকিয়ে সিরিয়া ও মিশরের নারীদের বিবাহ করত। হযরত ওমর বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এটি চালু করেছিল, স্থায়িত্বকরনের জন্য নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন উলেমা গন এটিকে বৈধ তালাক বলে ঘোষণা করে।[৮৭]

সমাজবিদ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার আরও বলেছেন কোরআনে একসময়ে একত্রে তিন তালাক এর উল্লেখ নেই। তালাককে বৈধ ও ফলপ্রসূ করার জন্য তিন মাসের ইদ্দতকাল সময় দিয়েছে। যাতে স্বামী স্ত্রী তাদের তালাক থেকে বিরত থাকে, পুনরায় বিবাহিত জীবন শুরু করতে পারে কারণ তালাক হলো ইসলামি বিধানের সব থেকে জঘন্য ও নিকৃষ্ট বস্তু। কোরআন ও মুহাম্মদ (সাঃ) নারীর স্বার্থ রক্ষার জন্য এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়েছে।[৮৮] যাই হোক পরবর্তীকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাওলানা মৌলবীরা তিন তালাককে বৈধতা প্রদান করেছে এবং পুরুষদের হাতে তালাকে সর্ব ক্ষমতার দান করেছে। যা সাধারণত প্রাক ইসলাম পর্বে

প্রচলিত ছিল এবং যার প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একেবারেই বিরোধী ছিলেন। মালদা জেলায় সমীক্ষা করতে গিয়ে বহু জায়গায় একত্রে তিন তালাক এর উদাহরন পরিলক্ষিত হয়েছে।

মালদা জেলায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে বেশ কিছু তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে মুসলিম নারীরা গৃহবিবাদ, নির্যাতন ও আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে। দুজন মুসলিম মহিলা বিবাহের সাত বছর পর তালাকপ্রাপ্ত হয় এবং এক সন্তানসহ স্বামী গৃহ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। একজন বিবাহের দু'বছর পর তালাকপ্রাপ্ত হয় এবং দুজন মহিলা কে বিবাহের পাঁচ বছর পর স্বামী তালাক দিয়ে দেয়। একজন মহিলা এমনও নমুনা হিসেবে পাওয়া গেছে, যিনি স্বামীর পুরুষত্বহীনতার জন্য স্বামীর থেকে আলাদা থাকেন। উপরোক্ত মুসলিম নারীর মধ্যে একজন মাত্র তালাক এর জন্য আইনি পথ অবলম্বন করে কোর্টে গেছে। বাকি সবগুলি শরীয়তে আইন মেনে তালাক-ই-আহসান বা তালাকে সুন্না দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে। সাধারণত বেশিরভাগ তালাক ইসলামিক শরীয়ত মেনেই হয় এবং খুব কম সংখ্যক তালাকের জন্যই কোর্ট অবধি যায়। তবে বহু ক্ষেত্রেই তিন তালাক একত্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

গবেষক লুসি কারোল লক্ষ্য করেছেন মুসলিম ইসলামিক আইনগুলি তালাক দেওয়ার ওপর স্বামীর ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের জন্য বহু বিধি নিষেধ আরোপ করলেও সব সময় পুরুষরা এমন ব্যবহার করে যেন তারা জয়ী ও মুসলিম নারীরা হল সবদিক থেকে তাদের অন্যায়ের শিকার।[৮৯] মুসলিম নারীরা নিজেদের থেকে কোন কথা বলতে পারবে না, এমনকি নিজের থেকে তালাকও দিতে পারে না এবং সব দিক থেকে তারাই হল সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। মুসলিম আইন পুরুষদের ওপর এত বেশি ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছে যে স্বামী যে কোন সময় ইচ্ছা করলেই তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এমনকি সেসব ক্ষেত্রে স্ত্রীর করুণ দশার কথা সে চিন্তাও করেনা। মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯ মুসলিম নারীদের করুন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে মুসলিম নারীর হাতে নির্দিষ্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে, যা শরীয়ত আইন

অনুযায়ী এবং সকল মুসলিমদের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। মুসলিম নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালত ব্যতীত আর কোন পথ নাই।[৯০] ১৯৩৯ মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন অনুযায়ী একজন মুসলিম নারী নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

ক) যদি স্বামী চার বছরের ঊর্ধ্বে নিরুদ্দেশ থাকে।

খ) যদি স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে।

গ) স্বামী যদি যৌন সঙ্গমে অক্ষম হয়।

ঘ) স্বামী যদি তিন বছরের ঊর্ধ্বে জেলে থাকে।

ঙ) মুসলিম শরীয়তের বিবাহ বিচ্ছেদ আইন অনুযায়ী বিষয়গুলি।

হানাফি মত অনুযায়ী একত্রে তিন তালাক হল ইসলামী আইন বিরোধী (তালাক-ই-বিদাৎ)। একত্রে তিন তালাক দেওয়ার জন্য স্ত্রীর উপস্থিতি বা স্ত্রীকে জানানো কোনটাই প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীর কাছে এটি সম্পূর্ণ হৃদয় বিদারক ও প্রচন্ড ধাক্কা। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী দুই পক্ষের সম্মতি নেওয়া হয় অথচ তালাকের সময় স্ত্রীর অনুমতি এমনকি জানানও প্রয়োজন মনে হয় না। স্বামী ইচ্ছা করলেই যে কোন সময় স্ত্রীকে তিন তালাক দিতে পারে যা একটি অপরাধ অথচ স্ত্রী স্বামীকে তালাক (খুলা) দিলে সম্মতি প্রয়োজন তাহলে প্রশ্ন এসে যায় কোথায় নারীর অধিকার রক্ষা করা হচ্ছে ?

ক্ষেত্র সমীক্ষাও করতে গিয়ে তালাক সম্পর্কে মুসলিম নারীর দৃষ্টিভঙ্গি কি? জিজ্ঞেস করলে সকলেই এটিকে দুর্ভাগ্যজনক, নারীর জীবনের সবথেকে দুঃসময় বলে মনে করেন। বিশেষ করে দরিদ্র, অশিক্ষিত মেয়েদের করুন দশার কথাও তারা বলেছেন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় শিক্ষিত ও আর্থিকভাবে সাবলম্বী নারীরা এর পরিবর্তন চাই এবং তারা বলেন মুসলিম আইনকে পরিবর্তন করতে হবে ও একত্রে ৩ তালাককে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তারা এটাও স্বীকার করেন যে তালাক হল বিবাহ জীবনের শেষ তা এক নিঃশ্বাসে ‘তালাক তালাক তালাক’ উচ্চারণ করা হোক না কেন। এর থেকেই বোঝা যায় মালদা জেলার মুসলিম নারীদের এমনকি শিক্ষিত নারীদেরও শরীয়তের

আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেয় তা হবে শরীয়তে বিরোধী, শুধু শরীয়তে বিরোধী নয় তা হবে পাপ। প্রচন্ড আবেগে বা ক্ষোভে তাড়িত হয় যদি কেউ স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেই তা এক তালাক বলে গণ্য হবে এবং শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ৩ মাস অপেক্ষা করতে হবে।[৯১] কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় তিন তালাক বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছে।

তিন তালাক পরিবর্তন প্রয়োজন:-

বর্তমানে তিন তালাক একটি বহুল আলোচিত ও সমালোচিত বিষয়। একত্রে তিন তালাককে কেন্দ্র করে মুসলিম নারীর জীবন সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, যে কখন কোন সময় তার স্বামী তাকে তালাক দেয়। তবে বর্তমানে মুসলিম নারীর মধ্যে শিক্ষার সঞ্চার হাওয়াই তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং ইসলামিক শরীয়ত সম্পর্কে ও জ্ঞান লাভ করে। গবেষক তাবাসসুম লক্ষ্য করেছেন ভারতীয় মুসলিম নারীরা তার ইসলামিক অধিকার সম্পর্কে অবগত এবং তারা আর পুরনো পদ্ধতি চলতে দিতে চান না। তারা বর্তমানে যুগ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী মুসলিম পার্সোনাল ল' এর পরিবর্তন কামনা করেন। তিনি আরও বলেছেন নারী সংক্রান্ত যে সমস্ত ইসলামিক আইন আছে তা অত্যন্ত আধুনিক কিন্তু মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ইমামদের দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত প্রাক আধুনিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা দ্বারা পরিচালিত হয় যা কোরআনের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৯২] পবিত্র কোরআন বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং এই সংক্রান্ত নির্দেশনা ও ব্যাখ্যাগুলি অত্যন্ত আধুনিক। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে কুরআনে বারবার মুসলিম নারীকে সুযোগ দিয়েছে বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক করার, যেহেতু আল্লাহ সঙ্গতি পছন্দ করেন এবং বিচ্ছেদ কখনোই কাম্য নয়। কোরআনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা সত্বেও এক নিঃশ্বাসে একত্রে তিন তালাককে আমরা মান্যতা দিয়েছি যা কোরআন বিরোধী এবং যা কোরআন বিরোধী তা পাপ। এটি মুসলিম নারীদের প্রতি অন্যায়। সমাজবিদ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন কোরআনে চারটি শব্দ সূচক যথা-

আদল (ন্যায়), এহেসান (দয়াশীলতা), রহমাহ (সমবেদনা) ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) এবং তিন তালাক এই সমস্ত কিছু বিরোধী।[৯৩]

মালদা জেলায় মুসলিম নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সমীক্ষা করতে গিয়ে তিন তালাক প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ এর সময় দেখা যায় যে গ্রাম্য এলাকায় বেশিরভাগ মুসলিম নারী তালাক সংক্রান্ত ইসলামিক আইন সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা একত্রে তিন তালাককেই বৈধ বলে মনে করে এবং বহু নারী বিবাহ বিচ্ছেদের সময় কাজীর সম্মুখে একত্রে তিন তালাক প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে আসে যে মুসলিম নারীর বিবাহকে ইসলামিক বৈধতা প্রদান করে সিলমোহর দিচ্ছে তাদের সামনেই কিভাবে এই বিদাৎ বা পাপ কাজকর্ম দিনের পর দিন চলে আসছে? মুসলিম সমাজে বিবাহের সময় নিকাহ নামা বা বিবাহ চুক্তি যা শরীয়তী বিধান মেনে তৈরি করা হয় এবং তার একটি অনুলিপি মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডে পাঠানো হয়। যাতে মুসলিম নারীদের বিবাহিত জীবনে কোনরুপ প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে না হয়। কিন্তু পার্সোনাল ল' বোর্ড তিন তালাক সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে জড়াতে চাই না।

সব উলেমা গন একত্রে তিন তালাককে পাপ হলে গণ্য করেছেন অথচ ধর্মের নামে এই সমস্ত বিদাৎ কাজকর্ম দিনের পর দিন চলে আসছে। গবেষক তাবাসসুম বলেছেন সমস্ত রকমের চেষ্টা করতে হবে পাপ কাজগুলির সমাজ থেকে দূরীভূত করার জন্য এবং উলেমাদের দায়িত্ব দিতে হবে, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডকে সচেতনতা মূলক শিবিরের আয়োজন করতে হবে, মুসলিম পুরুষদের সচেতন করার জন্য যাতে তারা কুরআনে তালাকের নিয়মগুলি ও তালাকের বিদাৎ ধারণার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।[৯৪] মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯ মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ইদ্দাৎ পর্বে সমস্ত দায়িত্ব স্বামীর ওপর অর্পণ করেছে কিন্তু সমস্ত আইন-কানুন তরূপের তাঁসের মতো ধুলিস্যাৎ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর সাথে অন্যায় কাজকর্ম চলে আসছে। মুসলিম পার্সোনাল ল' কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে ও বর্তমান যুগোপোযোগী করে তোলার জন্য নতুন লিখিত আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং একত্রে তিন তালাককে বন্ধ করার জন্য সর্বোপরি

চেষ্টা করতে হবে যাতে মালদা তথা সমগ্র ভারতের মেয়েরা তিন তালাকের ভয়ে নিজেদের কুক্ষিগত করা না রাখে।

ভরণপোষণ:

ইসলামের তত্ত্ব জ্ঞানীদের মতে তালাকের পর তালাকপ্রাপ্ত নারীর পার্থিব বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনাদি হল তালাকের ভরণপোষণ। ভরণপোষণ বা Maintenance হল তালাকপ্রাপ্ত নারীর প্রতি আর্থিক সাহায্য প্রদান যা সাধারণত ইদ্দৎ পর্ব পর্যন্ত প্রাপ্ত এবং তালাকের পর প্রাক্তন স্ত্রীর ভরণপোষণের আর কোন দায়িত্ব স্বামীর থাকে না, তবে বর্তমানে তালাকের পর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রাক্তন স্বামীকে নিতে হবে। এই নিয়ে বহু মামলা কোর্টে চলছে যা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল শাহবানু মামলা। গবেষক ফৈজি বলেছেন ভরণপোষণ হল 'নাফাখ', যা প্রাথমিকভাবে খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থানে সীমাবদ্ধ। বিবাহ সম্পর্ক বা আত্মীয়তা ও উত্তরাধিকার সূত্র এই তিনটি কারণের জন্য কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করে। মুসলিম আইন অনুযায়ী স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া যে কোনো স্বামীর প্রাথমিক কর্তব্য। উত্তরাধিকারী হিসেবে স্ত্রীরও কর্তব্য হল স্বামীর মৃত্যুর পর তার দায়িত্ব গুলি পালন করা।[৯৫]

পুত্রের সাবালক হওয়া অবধি ও কন্যার বিবাহ পর্যন্ত সমস্ত দায়ভার পিতার। এমনকি কোন তালাকপ্রাপ্ত কন্যা বা বিধবা কন্যার ও দায়িত্ব পিতার ওপর। কিন্তু পুত্রবধূর প্রতি তার শ্বশুরের কোন দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে না।

তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর প্রতি ভরণপোষণের বিধান ঐশ্বরিক বিধানে নেই। আসলে ভরণপোষণের আর্থিক বিষয়টি আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব। কোরআন এ তালাকের সময় মানবিক হতে বলা হয়েছে এবং ন্যায় বিচার করতে বলা হয়েছে। মূল কথা হল তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে তালাক প্রদানকারী পুরুষ আপাতকালীন জীবন চালানোর জন্য আর্থিক সাহায্য করবে, যা সারা জীবনের জন্য নয়। কোরানে বলা হয়েছে বর্জিত নারীগণকে যথাবিধি ধন দান, ধর্মভীরু লোকদিগের দায়িত্ব।[৯৬] এছাড়াও

কোরআনে আরও বলা হয়েছে যদি কোন স্বামী স্ত্রীর বিবাহিত জীবন শুরু করার আগেই যদি স্বামী তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেয় তখন স্ত্রীকে ভদ্রতার খাতিরে অর্থ বা বস্ত্র বিশেষ কিছু দান করবে তাদেরকে উত্তম বিদায় দান করবে।

তালাকপ্রাপ্ত নারীর ভরণপোষণ: গবেষক ফৈজী *Islamic law in Modern worlds* প্রবন্ধে লিখেছেন মুসলিম পার্সোনাল ল' অনুযায়ী স্ত্রীর দায়ভার বহন করার স্বামীর কর্তব্য। কিন্তু তালাকপ্রাপ্ত নারীর ভরণপোষণের ক্ষেত্রে আলাদা আইন নির্দেশ করে। মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী স্বামী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকবে শুধুমাত্র ইদ্দত পর্ব পর্যন্ত। ইদ্দত পর্ব অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামীর কোন দায়িত্ব থাকে না।[৯৭] তালাক প্রাপ্ত নারী মুসলিম পার্সোনাল ল', ক্রিমিনাল পেনাল কোড ১৯৭৩, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৮৬ অনুযায়ী খোরপোষ দাবি করতে পারে।

কিন্তু যখন স্বামীর মৃত্যু দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে তখন স্বামীর সম্পত্তি থেকে স্ত্রী তার ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ বহন করে। তালাকের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্ত্রীকে ইদ্দত পর্বে ভরণপোষণ দিতে হবে ইদ্দত পর্ব তিনটি ঋতু কালীন সময় কাল এবং স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকে তাহলে এই ভরণপোষণের দায়ভার সন্তান জন্ম পর্যন্ত বর্ধিত হয়। কোরআনে বর্ণিত আছে তালাকপ্রাপ্ত নারীর প্রতি সুহৃদয় ও সম্মান প্রদর্শন করতে।

গবেষক মরিয়ম ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্ণনা করেছেন যে ভরণপোষণ সংক্রান্ত যে সমস্ত বিধান শরীয়ত দিয়েছে তা মূলত্ব পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন। বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারী অবহেলায় দিন কাটাতে থাকে এবং সে (স্ত্রী) তাড়াতাড়ি পিত্রালায়ে ফিরে আসে। এই ভাবেই তার সমস্ত দায়িত্ব একজন থেকে অন্য পুরুষের উপর বর্তায়। ইদ্দতকালীন ভরণ পোষণ মুসলিম নারীর জীবনের কোন সমাধান করতে পারে না, কোন রূপ আর্থিক স্বনির্ভরতা প্রদান করে না, এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ ও ঠেকাতে পারে না।[৯৮] ইদ্দতকালীন সময়ে যেহেতু স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতেই থাকতে হয় তাই তার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীকেই নিতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি পরিবারের

দৃষ্টিগত পার্থক্য দেখা যায় ও নারী সামাজিক মর্যাদা খন্ডন হয়। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক পাল্টেছে, এখন আর নারী তালাকের পর পিতৃ গৃহে ফিরে না এসে নিজেই নিজের দায়িত্ব নিতে শিখেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অপেক্ষা মান কাল বা ইদ্দত কালের তিন মাস ভরণপোষণ তালাক প্রাপ্ত নারীর জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারেনা, বিশেষ করে যে সমস্ত নারী তালাকের পর স্বাধীনভাবে থাকতে চাই তাদের জন্য।

অপেক্ষামান পর্বের পরবর্তী ভরণপোষণ:-

ইদ্দত কাল বা অপেক্ষামান কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হলে মুসলিম নারী জীবন কিভাবে অতিবাহিত হবে, কে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে সে নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। অধিকাংশ সময় দেখা যায় ইদ্দত এর পর যে সমস্ত নারী অবিবাহিত (পুনরায় বিবাহ না করে) থাকে তাদের ভরণ পোষণ তার আত্মীয়-স্বজনরা করে থাকে, যারা সেই মহিলার সম্পত্তি ভোগ করে। কোন আত্মীয় স্বজনের অবর্তমানে অথবা জীবন ধারণের কোন উপায় না থাকলে সেই সমস্ত নারীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব ঐ নারী যে রাজ্যে অবস্থিত সেখানকার ওয়াকফ বোর্ডকে নিতে হবে।[৯৯] গবেষক অলকা সিং এই প্রসঙ্গে বলেছেন ক্রিমিনাল প্রসিডিউর আইন ১৯৭৩ এর ১২৫ নং সেকশন প্রস্তাব দিয়েছে যে সমস্ত মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও নিজের ভরণ পোষণ করতে অক্ষম অথবা দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন না তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রথম স্বামীকে নিতে হবে।[১০০]

ভরণপোষণ প্রসঙ্গে মুসলিম আইনের তাত্ত্বিকগনের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কোন জ্ঞানী ও তাত্ত্বিক গণ মনে করেন স্ত্রীর ভরণপোষণ দায়িত্ব শুধুমাত্র ইদ্দতকাল পর্যন্ত নিতে হবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন ইদ্দতকাল পরবর্তীকালেও স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে, যদি সে (স্ত্রী) নিজের ভরণ পোষণ করতে অপারক থাকে। গবেষক তয়াবজি এই প্রসঙ্গে বলেছেন মুসলিম আইন অনুযায়ী হোক অথবা ক্রিমিনাল প্রসিডিওর আইন মোতাবেক হোক ইদ্দত পরবর্তীকালেও স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীকে নিতে হবে।[১০১] ইদ্দত পরবর্তী স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব

ইসলামিক আইনের পরিপন্থী। ইসলামিক আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছিন্ন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব তার সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের ওপর নাকি তার প্রাক্তন স্বামীর এই প্রশ্ন এসে পড়ে।

বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছিন্ন নারীর ভরণপোষণের বিষয়টি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। পূর্বে ১৯৭৩ এর ক্রিমিনাল প্রসিডিওর আইনের ১২৫ নং সেকশন অনুযায়ী নারীর ভরণপোষণের বিষয়টি কার্যকরী হত। কিন্তু ১৯৮৬ সুপ্রিম কোর্টের শাহবানু মামলাটি মুসলিম সম্প্রদায় ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে এবং মুসলিম সমাজ দুই ভাগে ভাগ হয়েছে, যথা- প্রগতিশীল ও ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী। প্রগতিশীলরা সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির রায়ের সাথে একমত। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি Y. V. Chandrachud বলেছেন ২৪১ ও ২৪২ কোরআনের উক্তিগুলি পরিষ্কার বলেছে তালাকপ্রাপ্ত নারীর সাথে সুবিচার ও সুহৃদয় রাখতে এবং তার সাথে ন্যায় করতে হবে। ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাসীরা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকে মুসলিম পার্সোনাল ল এর অপবিত্র করণ বলে মনে করে। ১৯৮৬ সালে কংগ্রেস সরকার মুসলিম নারীর জন্য আইন (Protection of rights on divorce) প্রণয়ন করে বিবাহ বিচ্ছিন্ন নারীর ভরণপোষণের অধিকারকে মান্যতা দেয়। কিন্তু এই আইন শুধুমাত্র ইদ্দতপর্ব পর্যন্ত ভরণপোষণের কথা বলে। তাই প্রগতিশীলরা এই সরকারকে ধর্মের অন্ধবিশ্বাসীদের (fundamentalist) সরকার বলে মনে করে।

মালদা জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সাথে কথা বলে তাদের দুর্দশার কথা জানা যায় কিভাবে তারা বিবাহ বিচ্ছেদের পর ভাইদের সংসারে আপাংতেই হয়ে থাকতে হয়। সারাদিন লাঞ্ছনা, গঞ্জনার শিকার হতে হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য নারীদেরকেই বেশি করে দোষী করা হয়। বহু বিবাহ বিচ্ছিন্না নারী সঠিক ভরণপোষণ না পেয়ে আর্থিক অসুবিধার মধ্যে দিয়েই দিনযাপন করে। মুসলিম পার্সোনাল ল এই সমস্ত নারীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করাই খুব অসুবিধার মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। বিধবা মহিলাদের ভরণপোষণের খরচ স্বামীর সম্পত্তি থেকে দেওয়ার নিয়ম ইসলামিক আইনে রয়েছে। বিধবা নারীরা বিশেষ করে অপুত্রক বিধবা নারীরা স্বামীর গৃহে থাকতে না পেরে পিতৃগৃহে আসে এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব

স্বামীর পরিবার নিতে রাজি হয় না। ক্ষেত্রসমীক্ষায় এরকম পাঁচজন বিধবা নারীর সাক্ষাৎকার পাওয়া গেছে, যার মধ্যে একজন কম বয়স্ক হওয়ায় পুনরায় বিবাহ দেওয়া হয় এবং বাকিদের কেউ কেউ নিজে কাজ করে খরচ চালায় অথবা পিতৃগৃহে থেকে কোন ভাবে নিজের জীবনযাপন করে।

ভরণপোষণ প্রসঙ্গে সংবিধানিক প্রস্তাবনা ও আইন প্রণয়ন:

ভারতীয় মেজরিটি অ্যাক্ট ১৮৭৫, ক্রিমিনাল প্রসিডিউর অ্যাক্ট ১৯৭৩, মুসলিম নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৮৬ ভারতে মুসলিম নারী এর স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োগ করা হয়। গবেষক সিনহা উল্লেখ করেছেন স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার স্বামী কে নিতে হবে, স্ত্রীর পর্যাপ্ত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও।[১০২] তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ভরণ পোষণ দেওয়া প্রসঙ্গে গবেষক ওসমান গণি বলেছেন ১৯৭৩ এর ক্রিমিনাল প্রসিডিওর আইনের ১২৫ তম সেকশন ও মুসলিম পার্সোনাল ল' এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং স্বামী তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে (যে নিজস্ব ভরণপোষণ অক্ষম) তাকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। যদি কোন স্ত্রী তার ভরণপোষণ নিজে করতে সক্ষম সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইদ্দত পর্ব পর্যন্ত স্বামী তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে।[১০৩] মুসলিম নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা বিষয়ক বিলটি ১৯৮৬ সালে লোকসভায় পাস করা হয়। এই বিলটি মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহিত ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মুসলিম নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রক্ষার আইন ১৯৮৬ শুধুমাত্র সেই সব নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা মুসলিম পার্সোনাল ল' অনুযায়ী বৈবাহিক চুক্তিতে আবদ্ধ এবং মুসলিম বিবাহ আইন ১৯৩৯ ও মুসলিম আইন তালাকের বিভিন্ন ধরন যথা- ইলা, জিহার, খুলা অথবা মোবারক অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্ত। এই আইনটি তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম নারীর স্বার্থ রক্ষা যথাযথ ও পর্যাপ্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা ও মেহর প্রদান না করে থাকলে তা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। সেক্ষেত্রে মুসলিম নারীকে মেজেস্ট্রিটের কাছে আবেদন করতে হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট তালাকপ্রাপ্ত নারীর ভরনপোষণের জন্য অপ্রদেয় মেহর এর ব্যবস্থা করে থাকে। এই আইন অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্ত নারী বিবাহ বিচ্ছেদদের পরও যদি পুনরায় বিবাহ না করে থাকে, তাহলে তার ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব তার পরিবার পরিজন সন্তান অথবা পিতা-মাতার দায়িত্বে

থাকে। যদি কোন ক্ষেত্রে নারী কোনভাবেই তার ভরণ পোষণের অক্ষম হয় সেক্ষেত্রে অসহায় নারীর ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব ওয়াকফ বোর্ডের উপর চলে যায়।

গবেষক তাবাসসুম তার গ্রন্থে লিখেছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলিম পার্সোনাল ল' এর আইন গুলি অনুল্লেক্ষিত এবং সেগুলি বেশিরভাগ ধর্মীয় ও শরীয়ত গ্রন্থে লিখিত থাকায় সাধারণ মানুষের বোধের বাইরে থাকে।[১০৪] মুসলিম পার্সোনাল ল' তে উল্লিখিত নিয়ম নীতি প্রস্তাবনারই রূপান্তর যা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে লিখিত। কিন্তু মুসলিম ওয়াকাফ সংক্রান্ত আইন গুলি বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বর্তমান মুসলিম ওয়াকাফ আইন সংস্করণ হয় ১৯৯৫ সালে, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৮৬ এ সংস্কার করা হয় এবং লিখিত আইন প্রণয়ন হয়। কিন্তু তালাক ও মুসলিম নারী সংক্রান্ত আইনগুলি আজও অলিখিত। তাই বিবাহ বিচ্ছিন্ন মুসলিম নারীর জীবনে এত বিরাম্বনা এবং মুসলিম আইনকে নিজেদের স্বার্থে প্রয়োগ করা হয়। মুসলিম নারী বিশেষ করে তালাকপ্রাপ্ত নারীর জীবনের উন্নতির জন্য মুসলিম সমাজকে ব্যবস্থা নিতে হবে। নারীর প্রতি সহৃদয় থাকতে হবে। যদি মুসলিম সমাজ, নারীকে সম্মান প্রদর্শন করে তবে বহু আইন অপেক্ষায় নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

মুসলিম পার্সোনাল ল':

১৯৩৭ এর শরীয়ত আইন ভারতে মুসলিমদের ইসলামিক আইনগত, ব্যক্তিগত সম্পর্ক রক্ষা করে এবং কোন রাজ্য সরকার শরীয়ত আইনে হস্তক্ষেপ করে না। শরীয়ত আইন মূলত কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা দ্বারা স্বীকৃত। তবে বর্তমানে নারীর অধিকার রক্ষা প্রসঙ্গে শরীয়ত আইন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ইসলামিক আইনের চারটি মতবাদ যথা হানাফি, মালিকি, শাফী, হানাবালি প্রত্যেকে কোরআনের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করেছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছে, যা সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় মেনে চলে।

মুসলিম আইনের প্রথম উদ্ভব হয় আরবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাত ধরে। ইসলামিক আইন হল দৈব সৃষ্ঠ যা ঈশ্বর কর্তৃক মানব কল্যাণের জন্য প্রেরিত। কোরআন হল ইসলামের প্রথম ও সুসংবদ্ধ লিখিত বিধান । সুন্নত ও হাদিস দ্বারা সমগ্র মুসলিম সমাজের জীবন ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। আক্ষরিকভাবে ইসলামিক আইনের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর মদিনা জীবন শুরু হওয়ার পর থেকে। মদিনার প্রশাসনিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালনার জন্য ও মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাবলি সমাধানের জন্য ইসলামিক আইন প্রণয়ন করা হয়। ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতির সাথে সাথে ইসলামিক আইনও কার্যকরী হতে শুরু করে। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম প্রভাব বিস্তার করলেও মোগল যুগে ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায়। মোগল শাসকদের মধ্যে ঔরঙ্গজেব ইসলামিক আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। ফৈজী এর মতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইসলাম ধর্মের খুব ধীরগতিতে সংস্কার করতে শুরু করে।[১০৫] ১৯৩৭ শরীয়ত আইনের দ্বারা ভারতবর্ষে ইসলামিক আইন কার্যকরী হওয়া শুরু করে, এই আইন ভারতে অবস্থিত সকল মুসলমানদের এক সূত্রে বেঁধে রাখে। যেহেতু শরীয়ত হল ইসলামের মধ্যমনি, তাই শরীয়ত আইন মেনে চলতে সকল মুসলিম সমাজ বাধ্য। গবেষক অলকা সিংহ বলেছেন ইসলাম সকল মুসলিম সমাজকে একটি সম্পন্ন ও পরিপূর্ণ বিধান প্রদান করেছে। ইসলাম সকল মুসলিম সমাজকে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জগত সম্পর্কে দিক নির্দেশ করেছে।[১০৬] ইসলামের নিরপেক্ষতা সত্বেও ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম একটি দমন মূলক ভূমিকা পালন করে। সংখ্যা লঘু অস্তিত্বের জন্য ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ও বিশেষ করে মুসলিম নেতৃত্বরা ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অত্যাধিক গোঁড়ামীর আশ্রয় নিয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, পারিবারিক গঠন প্রভৃতি ইসলামিক ঐতিহ্য গুলিকে ভিত্তিতে করে গড়ে উঠেছে। মুসলিম পার্সোনাল ল’ হল প্রাক সংবিধানিক ভারতের সর্বত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর কার্যকর। এটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির দ্বারা পরিচালিত। ভারতের সংবিধান প্রত্যেক ভারতবাসীকে ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক স্বাধীনতা দিয়েছে। সেই মত পশ্চিমবঙ্গের

মালদা জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও পারিবারিক জীবন মুসলিম পার্সোনাল ল’ অনুযায়ী চালিত। বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব, উত্তরসূরী, ওয়াকফ প্রভৃতি হল মুসলিম পার্সোনাল ল এর অংশ এবং এগুলির প্রকৃতি হল ধর্ম দ্বারা পরিচালিত। মালদা জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক থাকায় তারা মুসলিম নারীর জীবনকে ধর্মীয় বিধান দ্বারা পরিচালিত করে। তবে শিক্ষার বিস্তার ও স্বনির্ভরতার জন্য বর্তমানে মুসলিম নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় ও ইসলামিক জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় পরিস্থিতি অনেক পাল্টেছে।

মালদা জেলার মুসলিম নারীর মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি:-

মুসলিম পারিবারিক আইনে মুসলিম নারীর আইনি অধিকার গুলি ভালোভাবে উল্লেখিত রয়েছে। এমনকি সেগুলি হাইকোর্ট ও জেলা আদালতেও তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমানে মুসলিম নারীর উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকার ভরনপোষণ, তিন তালাক, বহুবিবাহ, মসজিদে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নারীবাদীদের ভারতবর্ষ তথা মুসলিম দেশগুলোতেও সোচ্চার হতে দেখা যায়। মুসলিম পার্সোনাল ল বা মুসলিম পারিবারিক আইনে এই সমস্ত বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। নাইনার তার গ্রন্থে মুসলিম পার্সোনাল ল’ কে মুসলিম নারীদের প্রতি বৈষম্য মূলক বলে উল্লেখ করেছে।[১০৭] সেই জন্য পবিত্র মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর পরিবর্তন ও পুর্ননবীকরণ এর দাবি উঠেছে। যে সমস্ত মুসলিম নারীরা পার্সোনাল ল এর পরিবর্তন দাবি করেছেন তাদের সচেতনা বোধ, যারা মুসলিম পার্সোনাল ল এর স্থায়িত্ব দাবি করেন তাদের থেকে অনেক বেশি। একইভাবে মুসলিম নারীর অধিকার প্রসঙ্গে সচেতন নারীরা মুসলিম নারীর পার্সোনাল ল’ এর পরিবর্তে ধর্ম নিরপেক্ষ আইন কামনা করেন কারণ তারা মুসলিম আইনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত। মালদা জেলায় নির্বাচিত ব্লক গুলিতে সমীক্ষা করতে গিয়ে মুসলিম নারী মুসলিম আইন সম্পর্কে সচেতনতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সারণি ৪৪

মুসলিম পার্সোনাল ল’ ও শরিয়তী অধিকার সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীর সচেতনতাবোধ

ব্লক	সচেতন	অসচেতন	মোট
কালিয়াচক ১	৩৯০ (১৯.৫%)	১১০ (৫.৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজ বাজার (পৌর এলাকা)	৪০৫ (২০.২৫%)	৯৫ (৪.৭৫%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	৩২৫ (১৬.২৫%)	১৭৫ (৪.৭৫%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	৩৬০ (১৮%)	১৪০ (৭%)	৫০০ (২৫%)
মোট	১৪৮০ (৭৪%)	৫২০ (২৬%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩ শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

সমীক্ষা ক্ষেত্রে থেকে প্রাপ্ত সর্বমোট নমুনার প্রায় ৭৪ শতাংশ মুসলিম নারী শরীয়ত আইন সম্পর্কে অবগত এবং ২৬ শতাংশ নারীর মুসলিম আইন সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও নেই। কিন্তু মুসলিম নারীদের সাথে সাক্ষাৎকার চলাকালীন এটি পরিলক্ষিত হয় যে, বেশিরভাগ নারী শুধুমাত্র শরীয়ত শব্দটি শুনেছেন কিন্তু শরীয়তে তাদের অধিকার কি? ইসলাম নারীকে কতটা মর্যাদা আসন দিয়েছে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারনা নেই। এটিও পরিলক্ষিত হয় যে বর্তমানে শিক্ষিত যুবতী মেয়েরা শরীয়ত আইনে তাদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে অবগত। সারণি থেকেও এটি পরিষ্কার যে শহরাঞ্চলে নারীর ইসলামিক আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে এবং তাদের অবস্থা গ্রামাঞ্চলে নারীর তুলনায় কিছুটা উন্নত।

সারণি ৪৫

মালদা জেলার মুসলিম নারীর ইসলামিক আইন থেকে সুবিধা প্রাপ্তি

ব্লক	সুবিধাপ্রাপ্তি	সুবিধাহীন	মোট
কালিয়াচক ১	৭৫ (৩.৭৫%)	৪২৫ (২১.২৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	৯০ (৪.৫০%)	৪১০ (২০.৫%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	৬০ (৩%)	৪৪০ (২২%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	৮০ (৪%)	৪২০ (২১%)	৫০০ (২৫%)
মোট	৩০৫ (১৫.২৫%)	১৬৯৫ (৮৪.৭৫%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩ শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

উপরোক্ত সারণিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মুসলিম পার্সোনাল ল’ বা ইসলামিক আইন দ্বারা মালদা জেলার খুব কম সংখ্যক মুসলিম নারী লাভবান হয়েছে। সমীক্ষা কৃত সর্বমোট ২০০০ মুসলিম নারীর মধ্যে মাত্র ৩০৫ জন অর্থাৎ ১৫.২৫ শতাংশ নারী মুসলিম পারিবারিক আইন বা শরীয়ত আইন দ্বারা নারীদের জন্য স্বীকৃত সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করতে পেরেছে। কিন্তু সারণিতে দেখা যাচ্ছে সমীক্ষাকৃত নারীর মধ্যে অধিকাংশ নারী (প্রায় ৮৪.৭৫ শতাংশ) শরীয়তী আইনের সুযোগ সুবিধা গুলি পায় নি বা তারা মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর সুবিধা গুলি সম্পর্কে অবগত নয়।

সারণি ৪৬

মালদা জেলার মুসলিম নারী ইসলামিক আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চনার স্বরূপ

ব্লক	পারিবারিক অমত	প্রয়োজন নেই	শুধুমাত্র মেহের প্রাপ্ত	অপ্রযোজ্য (যারা সুবিধা পেয়েছে)	মোট
কালিয়াচক ১	৬০ (৩%)	৫০ (২.৫%)	৩১৫ (১৫.৭৫%)	৭৫ (৩.৭৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	৪০ (২%)	৮০ (৪%)	২৯০ (১৪.৫%)	৯০ (৪.৫০%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	৭০ (৩.৫%)	৩০ (১.৫%)	৩৪০ (১৭%)	৬০ (৩%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	৫৫ (২.৭৫%)	৭৫ (৩.৭৫%)	২৯০ (১৪.৫%)	৮০ (৪%)	৫০০ (২৫%)
মোট	২২৫ (১১.২৫%)	২৩৫ (১১.৭৫%)	১২৩৫ (৬১.৭৫%)	৩০৫ (১৫.২৫%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩ শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

মালদা জেলার বেশিরভাগ নারী মুসলিম পার্সোনাল ল' দ্বারা প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত সারণিতে সমীক্ষাকৃত মুসলিম নারীর **১১.২৫** শতাংশ নারী কোনরকম সুযোগ-সুবিধা পায়নি। **১১.৭৫** শতাংশ নারী সাবলম্বী হাওয়াই পার্সোনাল ল' এর থেকে সুবিধা নিতে নারাজ এবং ৬১.৭৫ শতাংশ মুসলিম নারী পার্সোনাল ল' এর থেকে সুবিধা হিসাবে তালাকের সময় শুধুমাত্র মেহের প্রাপ্ত হয়েছে। মালদা জেলায় মুসলিম নারীর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় তারা মেহর হিসাবে নগদ অর্থ পেয়ে থাকে। বহূ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মুসলিম পার্সোনাল ল' মুসলিম নারীদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা করতে পারেনি এবং পার্সোনাল ল' এর ব্যাখ্যা সুবিধাভোগী শ্রেণী নিজেদের মতো করে করেছে। তুর্কি, টিউনিসিয়া এর মত বহু মুসলিম রাষ্ট্র দেশের নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য নিজেদের সুবিধা মত শরীয়তে আইনের সংস্করণ করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই রূপ কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বহু নারীর সংগঠন মুসলিম পার্সোনাল ল' এর সংস্করণের জন্য সোচ্চার হয়েছে, তথাপি কোন কাজ হয়নি। সমীক্ষা চলা কালীন মুসলিম পার্সোনাল ল' বা শরীয়তে আইনের বৈষম্য মূলক চরিত্র নজরে আসে এবং বহু নারী শরীয়তী আইনকে বৈষম্য মূলক বলে দাবি করেছেন।

সারণি ৪৭

ইসলামিক আইন সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীর দৃষ্টিভঙ্গি

ব্লক	বৈষম্য মূলক	বৈষম্য মূলক নয়	মোট
কালিয়াচক ১	২৩০ (১১.৫%)	২৭০ (১৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজ বাজার (পৌর এলাকা)	২৫০ (১২.৫%)	২৫০ (১২.৫%)	৫০০(২৫%)
মানিকচক	২১০ (১০.৫%)	২৯০ (১৪.৫%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	২২০ (১১%)	২৮০ (১৪%)	৫০০ (২৫%)
মোট	৯১০ (৪৫.৫%)	১০৯০ (৫৪.৫%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩ শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে ৪৫.৫% মুসলিম নারী বক্তব্য হল শরীয়তে আইন বৈষম্য মুলক এবং ৫৪.৫ শতাংশ নারীর মত হল মুসলিম পার্সোনাল ল' বৈষম্য মুলক নয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা কালীন সাক্ষাৎকার ও আলোচনা থেকে বোঝা গেছে যে মুসলিম নারীরা মুসলিম পার্সোনাল ল' সম্পর্কে কিছু জানে না বা সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে না। তারা শুধুমাত্র পরিবারবর্গ ও ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারী মৌলানা মৌলবীদের বক্তব্যকেই সত্য বলে মনে করে, নিজের আসল অধিকার বা মুসলিম পার্সোনাল ল' এ নারীর অধিকার গুলি সম্পর্কে একেবারেই অবগত নয়।

সারণি ৪৮

শরিয়তী আইনের বৈষম্যমূলক আচরণের স্বরূপ

ব্লক	অসম সম্পত্তির অধিকার	তিন তালাক দ্বারা পুরুষদের বেশি অধিকার	ইদ্দৎ এর পরবর্তী ভরনপোষন থেকে বিচ্যুতি	অপ্রযোজ্য (বৈষম্যমূলক নয়)	মোট
কালিয়াচক ১	৭০ (৩.৫%)	৯০ (৪.৫%)	৭০ (৩.৫%)	২৭০ (১৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	৮০ (৪%)	১০০ (৫%)	৭০ (৩.৫%)	২৫০ (১২.৫%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	৬০ (৩%)	৭০ (৩.৫%)	৮০ (৪%)	২৯০ (১৪.৫%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	৬৫ (৩.২৫%)	৭৫ (৩.৭৫%)	৮০ (৪%)	২৮০ (১৪%)	৫০০ (২৫%)
মোট	২৭৫ (১৩.৭৫%)	৩৩৫ (১৬.৭৫%)	৩০০ (১৫%)	১০৯০ (৫৪.৫%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩ শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

মালদা জেলায় সমীক্ষা চলাকালীন মুসলিম নারীরা শরীয়তে আইনের বৈষম্যমূলক আচরণের বহু কারণ তুলে ধরেছেন যা উপরোক্ত সারণিতে তুলে ধরা হলো। কেউ কেউ সম্পত্তির অধিকার ভরণপোষণের ক্ষেত্রে আবার কেউ কেউ তিন তালাকের ক্ষেত্রে শরীয়তে আইনের অবিচার এর কথা বলেছেন। সর্বমোট সমীক্ষা কৃত মুসলিম নারীর মধ্যে ১৩.৭৫ শতাংশ নারী বলেছেন সম্পত্তির

অধিকারের ক্ষেত্রে অবিচার করেছে, আবার ১৬.৭৫ শতাংশ মুসলিম নারীর বক্তব্য হলো শরিয়তি আইন তিন তালাক এর ক্ষেত্রেও নারীদের সাথে অন্যায় করেছে। তিন তালাক দেওয়ার সমস্ত ক্ষমতা পুরুষদের হাতে অর্পণ করেছে, যার ফলে নারীর জীবন সর্বদাই বিপন্ন। আবার ১৫ শতাংশ মুসলিম নারী মনে করেন ইদ্দত পর্ব পরবর্তীকালে মুসলিম নারীর ভরণ পোষণের জন্য কোন অর্থ প্রদান উল্লেখ না থাকাই বহু নারী অবিচারের শিকার হচ্ছে, বিশেষ করে যে সমস্ত নারী নিজস্ব ভরণপোষণে অক্ষম তাদের অবস্থা খুব সঙ্গিন হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে শাহবানু মামলা প্রাণিধানযোগ্য যেখানে ইদ্দতপর্ব পরবর্তীকালেও নারীর ভরণপোষণ দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু ভারতে মুসলিম সম্প্রদায় তা মানতে নারাজ, তিন তালাক ও ইদ্দত পরবর্তী ভরণপোষণ সংক্রান্ত বহু বিতর্ক স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে চলছে এবং বহু মুসলিম নারী মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর পরিবর্তন কামনা করে।

সারণি ৪৯

মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর বাস্তবে কি পরিবর্তন প্রয়োজন ?

ব্লক	পরিবর্তন প্রয়োজন	পরিবর্তন প্রয়োজন নেই	মোট
কালিয়াচক ১	২৩০ (১১.৫%)	২৭০ (১৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	২৫০ (১২.৫%)	২৫০ (১২.৫%)	৫০০ (২৫%)
মানিকচক	২১০ (১০.৫%)	২৯০ (১৪.৫%)	৫০০ (২৫%)
রতুয়া ১	২২০ (১১%)	২৮০ (১৪%)	৫০০ (২৫%)
মোট	৯১০ (৪৫.৫%)	১০৯০ (৫৪.৫%)	২০০০ (১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩ শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

যেহেতু সারা বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম নারীরা বিশেষ করে কম বয়সী শিক্ষিত মেয়েরা মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর পরিবর্তন কামনা করে। মালদা জেলাতে সমীক্ষা করতে গিয়ে এইরকম দৃশ্য দেখতে পায়। সারণিতে দেখা যাচ্ছে সমীক্ষা কৃত মোট মুসলিম নারীর ৪৫.৫ শতাংশ নারী মুসলিম পার্সোনাল ল এর পরিবর্তন কামনা করে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম নারী পার্সোনাল ল’ এর পরিবর্তন

প্রয়োজন নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন। সমীক্ষা চলাকালীন সাক্ষাৎকার ও আলোচনা করতে গিয়ে জানা যায় যে, বেশিরভাগ নারী অশিক্ষিত এবং মুসলিম আইন সম্পর্কে জ্ঞান খুব সীমিত। তারা শুধুমাত্র পরিবারের পুরুষ সদস্য (স্বামী ও পিতা) দ্বারা চালিত এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত যে সমস্ত মুসলিম নারী মুসলিম পার্সোনাল ল এর পরিবর্তনের পক্ষপাতি, তারা কেউ কেউ আবার পার্সোনাল ল এর পরিবর্তে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কে চাইছেন।

সারণি ৫০

মুসলিম পার্সোনাল ল' এর পরিবর্তনের সপক্ষে মতামত

ব্লক	মুসলিম পার্সোনাল ল' এর পরিবর্তন	পার্সোনাল ল' এর বদলে ইউনিফর্ম সিভিল কোড	পরিবর্তন প্রয়োজন নেই	মোট
কালিয়াচক ১	১৯৫ (৯.৭৫%)	৩৫ (১.৭৫%)	২৭০(১৩.৫%)	৫০০ (২৫%)
ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা)	২০০ (১০%)	৫০(২.৫%)	২৫০(১২.৫%)	৫০০(২৫%)
মানিকচক	১৮৫(৯.২৫%)	২৫(১.২৫%)	২৯০(১৪.৫%)	৫০০(২৫%)
রতুয়া ১	২০০(১০%)	২০(১%)	২৮০(১৪%)	৫০০(২৫%)
মোট	৭৮০(৩৯%)	১৩০(৬.৫%)	১০৯০ (৫৪.৫%)	২০০০(১০০%)

উৎসঃ সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত (২৩ শে জুলাই ২০২২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২২)।

সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপরোক্ত সারণীটি নির্মিত সমীক্ষাকৃত নারীদের মধ্যে কেউ কেউ (৬.৫ শতাংশ) মুসলিম পারসোনাল ল' এর পরিবর্তে ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা নাগরিক আইন কামনা করলেও অধিকাংশ মুসলিম নারী (৩৯ শতাংশ) মুসলিম পার্সোনাল ল' এর অভ্যন্তরেই পরিবর্তন ও সংস্করণ কামনা করেন। কারণ ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায় শরীয়তী আইনকেই নস্যাৎ করতে পারে না। শুধুমাত্র শরীয়তি আইনের মধ্যে থেকে আইনের সংস্কার দাবি করেছে ও ইসলামী আইনকে যুগপোযোগী করে নারীর অধিকারগুলি আরও

কঠোরভাবে প্রয়োগ করে নারী স্বার্থ রক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে সমগ্র মালদা জেলা তথা ভারতবর্ষের মুসলিম নারীরা।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মালদা জেলার মুসলিম মেয়েরা মুসলিম পার্সোনাল ল' বা শরীয়তী আইন সম্পর্কে মোটেও অবগত নয়, মুসলিম নারীরা অধিক মাত্রায় দুর্ভোগের শিকার হয় তালাক ও ভরণ পোষণ সংক্রান্ত শরীয়তে আইন দ্বারা, যেহেতু তারা ভারতীয় পেনাল কোড ১২৫ এর ধারা বহির্ভূত। ইসলামিক আইন ও নিজস্ব অধিকার গুলি বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মালদা জেলার গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই অধিকাংশ মুসলিম নারীর ন্যূনতম শিক্ষা যোগ্যতা না থাকায় তারা মুসলিম পার্সোনাল ল' এ বর্ণিত অধিকার গুলি সম্পর্কে অবগত নয়। তবে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত নারী মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তন কামনা করছে এবং এ বিষয়ে তারা সোচ্চার হচ্ছেন, যাতে মুসলিম নারীদের ধর্মীয় বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ভুক্তভোগী হতে না হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. Ali Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an,* 4:19 (translated in English), New Delhi, Royal Publishers and Distributors, 2009.

২. *The Holy Qur'an* 81:9 translation as referred in Supra Introduction 1 f.n.1, তদেব।

৩. Umari M.S. Jalaluddin, *Women and Islam* (translated by Dr. Parvez Mandvi Wala), New Delhi, Markazi Maktaba Islami Publishers, 2017, p.15.

৪. Samiya Mufti Tabassum, *Status of Muslim Women in India: Law Relating to Marriage, Divorce and Maintenance,* New Delhi, Regal Publications, 2013, p.2.

৫. Khan Qamaruddin, *Status of Women in Islam,* New Delhi, Sterling Publishers, 1990, p.16.

৬. *Al Qur'an,* প্রাগুক্ত, ১৭:৩১।

৭. *Al Qur'an,* তদেব, ২:২২৮।

৮. Ahmed Naseem, *Status of Women in Islam,* New Delhi, APH. Publishing Corporation, 2003, p.18.

৯. *Al Qur'an,* প্রাগুক্ত, ৪:১।

১০. Sheikh M. H. Kidwai, *Women under different Social and religious Laws,* Delhi, Seema Publication, 1976, p.165.

১১. Mishkat, Mazhar-e-Haq, *Kitab-ul-Itm,* vol-1, H. No 20, pp. 274-275.

১২. Sunan Ibn Majah, *Kitab-ul-Adab,* vol. 3, H. No. 3670, p.258.

১৩. মজলিস-উস-সুরা- দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক শাসনকার্জের সুবিধার জন্য একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেন। আরবদেশের মুসলিম ও অমুসলিম ব্যক্তিরা এর সদস্য হতে পারত।

১৪. মুহাম্মাদ শেহনেওয়াজ আব্দুল কাদের, *ইসলামে যেভাবে নারীর পর্দাপালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, কলকাতা, যুগান্তর* পত্রিকা, ২৮ জানুয়ারী, ২০২০, অনলাইন সংস্করণ।

১৫. *Al Qur'an,* প্রাগুক্ত, 33:32-33।

১৬. *Al Qur'an*, তদ্বেব, 33:59।

১৭. *Al Qur'an*, তদ্বেব, 24:30-31।

১৮. Al Alusi Mahmud b Abdullah, *Ruh-al-Mani fi Tafsir Al-Quran*, Baghdad, 1854, p.201.

১৯. Siddiqui M.M., *Women in Islam*, Delhi, Adam Publishers and Distributers, 2009, p.107.

২০. বদর যুদ্ধ (৬২৪ খ্রীঃ) ইসলামিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে নবীজির শিক্ষা ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কতিপয় মুসলিম সৈন্য ইহুদিদের লক্ষাধিক সৈন্যকে পরাজিত করে। সমগ্র আরব সাম্রাজ্যে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয় ও ইসলাম ধর্ম সুবিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পায়।

২১. Siddiqui M.M, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮।

২২. শেষ হজ্জ যাত্রা (৬৩২ খ্রীঃ)- ইসলাম ধর্ম সমগ্র আরব দেশে ছড়িয়ে পরার পর নবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) হজ্জ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই হজ্জ যাত্রায় নবীজি তার সহধর্মিণীদের সঙ্গে জীবনের শেষ হজ্জ পালন করেন। নবীজির জীবনের শেষ হজ্জ হওয়ায় এটিকে বিদায় হজ্জ বা হুজাতুল বিদা বলা হয়। বিদায় হজ্জ এর সময় নবীজি জাতির উদ্দেশ্যে সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায় ও সততার পক্ষে থাকার পরামর্শ দেন।

২৩. Al-Albani Mohd. Nasiruddin, *Haj Hijab*, Delhi, 1994, p.7.

Al Qur'an, প্রাগুক্ত, 24: 31.

২৪. Al-ASH'ARI, *PURDAH and the Status of Women in Islam*, New Delhi, Mohit Publication, 1999, p.24.

২৫. Al-ASH'ARI, তদেব, পৃ.১৮৪-১৮৬।

২৬. Roy Shibani, *Status of Muslim Women in North India: A study in dynamics of Change*, New Delhi, B.R. Publishers Corporation, 1979, p.98.

২৭. Azim Saukath, *Muslim Women Emerging Identity*, New Delhi, Rawat Publication, 1997, p.78.

২৮. Azim Saukath, তদেব, পৃ ৮০।

২৯. Yousef Nadia and Smock Audrey C., *Egypt from seclusion to limited participation* in Zollingar J.G. and smock A.C(eds), *Women: Roles and Status in Eight Countries*, New York, Wily Inter Science Publications, 1977, p.110.

৩০. Bhatty Zarin, *Status of Muslim Women and Social Change*, in Nanda B.R(ed.), *Indian Women from Past to Modernity,* New Delhi, Vikas Publication House, 1976, p.48.

৩১. Saiyed A.R., *Purdah, Family Structure and The Status of Women: A not on a Deviant case*, in Ahmed Imtiaz(ed.), *Family, Kinship and Marriage among Muslims in India*, New Delhi, Manohar Publications 1976, p.123.

৩২. Singh Alka, *Women in Muslim Personal Law,* New Delhi, Rawat Publications, 1992, p.125.

৩৩. Roy Shibani, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০।

৩৪. Al-ASH'ARI, প্রাগুক্ত, পৃ.২২।

৩৫. Azim Saukath, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২।

৩৬. Husain Sabiha, *The Changing Half: A Study of Indian Muslim Women*, New Delhi, Classical Publishing Company, 1998, p.124.

৩৭. Chaturvedi Archana, *Encyclopaedia of Muslim Women*, Delhi Commonwealth publishers, 2003, p. 134.

৩৮. *Sahih Al-Bukhari*, p.64.

৩৯. Fyzee A.A.A, *Islamic Law in the Modern World*, in Hussain. Z. (vol), *Islamic Values in the Modern World*, New Delhi, Crescent Printing Works, p.45.

৪০. Jang M.U.S., *Dessertation on the Development of Muslim Law in British India*, Allahabad, The Juvenile, 1932, p.1.

৪১. Rahim Abdur, *The Principles of Mohammadan Jurisprudence*, New Delhi, Cosmo Publications, 2011, p.237.

৪২. রহিম আব্দুর, তদেব, পৃ.৭।

৪৩. Singh Rakesh Kumar, *Text book on Muslim Law,* New Delhi, Universal Law Publishing CO., 2011, p.57.

৪৪. Hamilton Charles (Translations), *The Hedaya: A Commentary on Musalma Laws,* Cambridge University Press, 2013, p.25.

৪৫. Tabasum Mufti Samia, *Status of Muslim Women in India: Law Relating to Marriage, Divorce and Maintenance,* New Delhi, Regal Publication, 2013, p.72.

৪৬. Tabsum Mufti Samia, তদেব, পৃ.৭২-৭৩।

৪৭. Tabsum Mufti Samia, তদেব, পৃ.৭৩।

৪৮. Mahmood Tahir, *Muslim Law in India,* New Delhi, Universal Law Publishing Co. 1982, p.45.

৪৯. Mahmood Tahir, তদেব, পৃ.৪৫।

৫০. Fyzee A.A.A, *Out Lines of Mohammadan Law,* New Delhi, Oxford University Press, 1964, pp.89-90.

৫১. অস্থায়ী বিবাহঃ প্রাক ইসলাম পর্বে প্রচলিত এই পদ্ধতিতে কিছু সময়ের জন্য ও শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্য বিবাহ করা হত।

৫২. Singh Alka, প্রাগুক্ত পৃ.১২৮।

৫৩. Ahmed Aqil, *Mohammedan Law,* (revised by Khan I. A.), Allahbad, Central Law Agency, 23rd Ed ,2004, pp.128-129.

৫৪. Rashid Syed Khalid, *Muslim Law,* 5th Ed. revised by Bharatya. V.P., Lacknow, Estern Book, 1999. p.38.

৫৫. Al Qur'an, প্রাগুক্ত 4:24।

৫৬. http://www.guideone.com/metapage/frq/mulah10.htm, retrived on 20.06.2023.

৫৭. M.Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam,* New Delhi, Kitab Bhavan, 1961, p.34.

৫৮. *Fatimid laws,* 95-7.

৫৯. Ali Ameer, *Mohammedan Law*, Allahabad, Orient Publishing Co., 1976, pp. 398-404.

৬০. Baillie, *Digest of Mohammedan Law*, London, Smith Elder & Co., 1875, p.42.

৬১. Tabasum Mufti Samiya, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০।

৬২. Tabasum Mufti Samiya, তদেব, পৃ.৮৫।

৬৩. Tabasum Mufti Samiya, তদেব, পৃ.৮৫।

৬৪. Roulet Margulrite, *Dowry and Prestige in North India*, Contributions to Indian Sociology (New Series), 30(1), 1996, pp.89-106.

৬৫. Mandal baum Paul, *Dowry death in India*, Commonwealth, (oct,8), 1999, pp.18-20.

৬৬. Srinivas M.N., *Some Reflections on Dowry*, New Delhi, Oxford University Press, 1983, p.50.

৬৭. Hasan Zoya, Menon Ritu, *Unequal Citizens: A Study of Muslim Women in India*, Delhi, Oxford University Press, p.45.

৬৮. Ahmed Aqil, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬।

৬৯. Diwan Paras, *Muslim Law*, 18th edition, Faridabad, Allahabad Law Agency, 2007, p. 169.

৭০. Tyabji F.B., *Muslim Law: The Personal Law of Muslims in India and Pakistan*, Bombay, N.M. Tripathy Publication, 1968, p.143.

৭১. Ahmed A.G., *The Religion of Islam*, USA, Hassell Street Press, 2021, p.117.

৭২. গনি ওসমান, *ইসলাম ও নারী সমাজ,* কলিকাতা, পারুল প্রকাশনী, ২০১২, পৃ.২১৯।

৭৩. Singh Alka, প্রাগুক্ত পৃ.১৫৭।

৭৪. গনি ওসমান, প্রাগুক্ত পৃ.২১৯।

৭৫. মোল্লা নাসিরুদ্দিন, *ইসলাম ধর্মে তালাক প্রথাঃ তত্ত্ব ও বাস্তব,* কলকাতা, লেজার টেক অ্যান্ড পি এস জি পাবলিকেশন, ২০১২, পৃ.৩২-৩৪।

৭৬. Fyzee A.A.A, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২।

৭৭. Sheikh M. H. Kidwai, *Women under different Social and Religious Laws*, New Delhi, Light and Life Publishers, 1964, p.65.

৭৮. Fyzee A.A.A, *Out Lines of Mohammadan Law*, প্রাগুক্ত পৃ.১১৪।

৭৯. Siddiqi Zakia A., Zuberi Anwar. J. (eds), Muslim Women- Problems and Prospects, New Delhi, MD Publications Pvt Ltd, 1993, p.59.

৮০. Fyzee A.A.A, *Out Lines of Mohammadan Law*, প্রাগুক্ত পৃ.১১৫।

৮১. Ahmed Furkan, *Understanding Talaque*, Journal of ILI, vol. 45, 2012, p.488.

৮২. গনি ওসমান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৭.

৮৩. রাকিব আব্দুর, *ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান,* কলকাতা, মল্লিকব্রাদারস, ২০০৫, পৃ.৯১।

৮৪. *Al Qur'an*, প্রাগুক্ত, সুরা বাকারা, আয়াত নং ২২৯,২৩০।

৮৫. Zia-us-Salam, *Nikah Halala: Sleeping with a Stranger*, New Delhi, Blumsbery, 2020, pp. 130-155.

৮৬. Engineer A.A., *The Qur'an, Women and Modern Society*, New Delhi, Sterling Publishers Pvt Ltd, 2005, p. 39.

৮৭. Engineer A.A., তদেব, পৃ.৬৫।

৮৮. Engineer A.A., *The Rights of Women in Islam*, New Delhi, Sterling Publishers Pvt Ltd, 2008, p.45.

৮৯. Carrol Lucy, *The Muslim Women's Right to Divorce*, Manushi, No. 38, 1987, p185.

৯০. Fyzee A.A.A, *Out Lines of Mohammadan Law*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭।

৯১. Khan Moulana Waheddudin, *Conserving Divorce*, USA, CPS International, 2001, p.27.

৯২. Tabasum Mufti Samiya, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৬।

৯৩. Engineer A.A., *The Qur'an, Women and Modern Society*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮।

৯৪. Tabasum Mufti Samiya, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৮।

৯৫. Fyzee A.A.A, *Out Lines of Mohammadan Law*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫।

৯৬. *Al Qur'an*, প্রাগুক্ত, সুরা বাকারা, ২:২৪১, পৃ.২৩৭-২৪১।

৯৭. Fyzee A.A.A, *Outlines of Mohammadan Law*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩।

৯৮. Mariam Allana, *Muslim Women and Islamic Traditions: Studies in Modernization*, New Delhi, Kanishka Publishers and Distributors, 2000, p.260.

৯৯. Diwan, *Muslim Law in Modern India*, Faridabad, Allahabad Law Agency, 2005, P.148.

১০০. Singh Alka, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫।

১০১. Tyabji F.B., প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭।

১০২. Sinha R.K., *Muslim Law,* Allahabad, Central Law Agency, 1999, p.147.

১০৩. গনি ওসমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩।

১০৪. Tabasum Mufti Samiya, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩।

১০৫. Fyzee A.A.A, প্রাগুক্ত পৃ.১৬৪।

১০৬. Singh Alka, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫।

১০৭. Nainar Vahida, *Muslim Women's Views on Personal Laws*, Bombay, women's Research and Action Group, 2000, p.143.

উপসংহার

উপসংহার

ইসলাম ধর্ম হল পবিত্র অনুশীলনগুলির সমষ্টি। মুসলিম সম্প্রদায় সাধারণত তাদের ধর্মকে অপরিবর্তনশীল এবং যেকোনো বড় উদ্ভাবনের প্রতিরোধক হিসেবে মনে করে। এই পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, পরিবারের কর্তৃত্ব, কাঠামো প্রভৃতির ওপর আরোপিত ঐতিহ্যগত নিষেধাজ্ঞার মূলে রয়েছে পবিত্র গ্রন্থে উল্লেখিত অনুশাসনগুলি এবং এই অনুশাসনগুলি মুসলিম সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের কার্যাবলীকেও নিয়ন্ত্রণ করে। মুসলিম সমাজের ঘরে ও বাইরে ইসলামের অনুসারীদের জন্য যাবতীয় আচরণবিধি ধর্মীয় গ্রন্থে নির্ধারিত রয়েছে এবং এগুলি সামাজিক কার্যকারিতার ক্ষেত্রে দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে। মুসলিম সমাজে নারীদেরকে প্রধানত একটি ধর্মীয় সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় না বরং অসংখ্য আর্থসামাজিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত সামাজিক ঐতিহ্য, বিশ্বাস, মনোভাব ও মূল্যবোধ প্রভৃতির সমন্বয়ে বিচার করা হয়। মুসলিম সমাজে নারীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার মূলে রয়েছে সামাজিক প্রকৃতি ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। যে কারণে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় সমাজে গৌণ অবস্থানে নেমে এসেছে, পুরুষরা নিজেদের বিজয়ী, সমর্থনকারী, নারীদের রক্ষাকারী ও সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। তবে অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এই মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে কারণ মহিলারা স্বনির্ভর ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। কিন্তু মুসলিমদের বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি তেমন হয়নি। সুতরাং মুসলিম নারীর অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধর্মের মত সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম নারীর অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে নারীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। নারীরা যদি দরিদ্র, নিরক্ষর থেকে যায় তাহলে তাদের অবস্থার উন্নতি অসম্ভব।

মুসলিম সম্প্রদায় হল ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ হল মুসলিম জনগণ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলির মধ্যে মালদা জেলা হল অন্যতম। এখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হল মুসলিম জনগণ। মুসলিম জনগণের অবস্থান বিশেষ করে মুসলিম নারীর অবস্থান খুব সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমান অধ্যয়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হল মুসলিম সমাজে মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয় এবং তাদের সামাজিক অবস্থানকে বাধাগ্রস্থ করে এমন কিছু আর্থসামাজিক কারণগুলিকে চিহ্নিত করা ও বোঝা। বর্তমান গবেষণায় আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে কিভাবে পিতৃতন্ত্র এবং ধর্ম তাদের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিভাবে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সমাজে মুসলিম নারীদের উন্নতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সমীক্ষায় উঠে এসেছে মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীনে তারা কিভাবে তাদের অধিকার ও সুবিধা গুলি বুঝে নিচ্ছে। সমীক্ষা প্রাপ্ত নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক অবস্থান, আর্থসামাজিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ প্রভৃতির দ্বারা নারীর অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের আসল উদ্দেশ্য হল নারী তার পারিবারিক দায়-দায়িত্ব অধিকার পালন করার সাথে সাথে বাইরের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমরা উক্ত গবেষণায় মুসলিম নারীদের সামগ্রিক অবস্থানের মধ্যে ধীর ও অবিচল পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি, যেমন পরিবারে তাদের ভূমিকা এবং অবস্থান, মুসলিম মহিলাদের আর্থসামাজিক চালচিত্র, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে তাদের অংশগ্রহণ, নারীর অবস্থানের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু কিছু সংস্কার যেমন তিন তালাক, বহুবিবাহ, ইদ্দতপর্ব বহির্ভূত ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় মুসলিম নারীর উন্নতির জন্য মুসলিম পারিবারিক আইনেরও সংস্কার প্রয়োজন। মুসলিম সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনের নারীর অধিকার শরীয়তে নির্দিষ্ট থাকলেও মুসলিম সমাজ নারীদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের সংরক্ষণ হয়েছে কিন্তু উদ্বেগের বিষয় যে মুসলিম নারীরা কিভাবে তা গ্রহণ করছে এবং কিভাবে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মুসলিম মহিলারা পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজে তাদের সামাজিক

অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তা বোঝা। মালদা জেলার মুসলিম মহিলাদের সামাজিক জীবনে এই মাত্রা গুলি পূর্বের কোন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্বেষণ করা হয়নি।

বর্তমান অধ্যয়নটি একটি মৌলিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেডিক্যাল নারীবাদী মডেলকে অনুসরণ করে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে দেখা যায় সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারী সর্বদাই নিম্নে অবস্থিত। নারী পুরুষের মধ্যে এই অসম আচরণ এবং সমাজ কাঠামোকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেখানে পুরুষরাই সমস্ত সুযোগ সুবিধা গুলি ভোগ করবে। এই নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্যের শিকড় রোপিত হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অধিকার, সুযোগ, সুবিধা, ক্ষমতা প্রভৃতি লিঙ্গ দ্বারা বিভক্ত। ফলস্বরূপ নারীকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সমীক্ষায় মুসলিম নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান তাদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে এবং তারা কিভাবে তাদের সামাজিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে এবং ইসলাম ধর্মে তাদের অধিকার গুলি কিভাবে আদায় করছে বা কিভাবে তারা সংস্কারের দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা করছে তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে উক্ত গবেষণাটিতে।

বর্তমান গবেষণাটি অধ্যায়নের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত অবস্থান নিয়ে গবেষণা ভিত্তিক আলোচনার অভাব রয়েছে। আর একটি লক্ষ্য করা গেছে যে, ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত উন্নয়নের সূচক গুলি জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে প্রাপ্ত তথ্যগুলির বিপরীতে এবং ধর্ম অনুসারী। জেলাস্তরে প্রাপ্ত তথ্যগুলিও সীমিত, তাই মূল্যায়ন করাও খুব কঠিন হয়ে ওঠে। তাই এই ধরনের পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলাকে সমীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করে মুসলিম নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতামূলক তথ্য তৈরি করার জন্য কিছু পরিকল্পনা ও পদ্ধতিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করা হয়েছে। মালদার মুসলমানরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সূচকের দিক থেকে সবচেয়ে প্রান্তিক সম্প্রদায়, যা তাদের

মধ্যে নিম্ন সামাজিক অবস্থানকে সূচিত করে। সমীক্ষা ক্ষেত্রগুলি থেকে প্রাপ্ত মুসলিম নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান গুলি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের প্রধান উপসংহার গুলি এখানে সংবেদন করা হল।

বর্তমান অধ্যয়নটি মূলত একটি বিস্তৃত প্রশ্নাবলির সাহায্যে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে উৎপন্ন প্রাথমিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে তৈরি। অধ্যয়নটির প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বর্ণনামূলক ও অভিজ্ঞতামূলক তথ্যের ব্যাখ্যা থেকে ফলাফল গুলি তৈরি করা হয়েছে। গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য মালদা জেলার চারটি ব্লক যথা কালিয়াচক ১, রতুয়া ১, মানিকচক ও ইংরেজবাজার পৌর এলাকার প্রায় ২০০০ মুসলিম নারীকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সমীক্ষাক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ কার্যটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

অধ্যয়নের প্রধান ফলাফল গুলি বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে নিম্নে দেওয়া হলঃ

আর্থসামাজিক অবস্থান

নির্বাচিত মুসলিম নারী উত্তরদাতাদের অধিকাংশই প্রাপ্তবয়স্ক, তাদের বয়স সাধারণত ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। মালদা জেলার সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত মুসলিম নারী উত্তরদাতাদের অধিকাংশই নিম্ন শিক্ষাগত অবস্থানে অবস্থিত এবং অধিকাংশ বয়স্ক মহিলা নিরক্ষর ছিলেন। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রায় ৮০ শতাংশ উত্তরদাতায় বিবাহিত এবং অবিবাহিত নারীর তুলনায় বিবাহিত নারী ও সন্তানসহ নারীরা পরিবারে বেশি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। যে স্ত্রীর স্বামী অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী সেই নারী সংসারে ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। অবিবাহিত এবং বিবাহ বিচ্ছিন্ন বা বিধবা নারীরা তাদের পিতা-মাতা অথবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ কোন পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, সেক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কম, অধিকাংশ বিধবা মহিলা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সাথে একই পরিবারের থাকে এবং সেক্ষেত্রে পারিবারিক

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলেদের পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু অল্প বয়সি বিধবা মহিলারা খুব বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে না আর তালাকপ্রাপ্ত নারীরা তাদের পিতা-মাতার পরিবারেই অযত্নে বসবাস করতে থাকে।

সমীক্ষায় উঠে এসেছে মালদা জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও মুসলিম নারীর বিবাহের বয়স তার সামাজিক অবস্থানকে নির্ধারিত করে। মুসলিম পরিবার গুলিতে কোন মেয়ে দেরিতে বিয়ে করলে তাকে সমাজে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই নারীর সম্পর্কে অনেক কুৎসা রটানো হয়, ফলে মালদা জেলার অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলেই বাল্যবিবাহের প্রবণতা দেখা যায়। নির্বাচিত নারীদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে অধিকাংশ নারী ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে বা খানিকটা বাধ্য করেই বিয়ে করেছে, ফলে তাদের উচ্চশিক্ষিত হওয়ার বাসনা প্রশমিত করতে হয়েছে। মালদা জেলার ব্লকগুলিতে সমীক্ষা করে বলা যায় যে মুসলিম নারীরা অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবেই বাল্য বয়সে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের শিক্ষা যেমন ব্যাহত হচ্ছে ঠিক সেইভাবে কম বয়সে মা হওয়ার ফলে তাদের স্বাস্থ্যহানিও ঘটছে।

সম্পত্তির অধিকার নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। মালদা জেলায় সমীক্ষা চলাকালীন এটি পাওয়া গেছে যে বেশিরভাগ মুসলিম মহিলা তাদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই ইসলামিক আইনে নির্ধারিত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। পরিবারে নারীর অবস্থানের ক্ষেত্রে পরিবারের পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যৌথ পরিবার গুলিতে সাধারণত পরিবারের বয়স্ক পুরুষ সদস্যরাই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, সেক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা নগণ্য। অধিকাংশই মুসলিম নারী যৌথ পরিবারের বসবাস করে, কিছু সংখ্যক নারী একান্নবর্তী পরিবারের বসবাস করলেও মুসলমানদের মধ্যে যৌথ পরিবারের প্রচলন বেশি।

কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা তার সামাজিক মর্যাদাকেই সূচিত করে। সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত মুসলিম নারীর মাত্র ১২.৮৫ শতাংশ নারী সরকারী চাকুরিজীবি, ৭.২৫ শতাংশ নারী ক্ষুদ্র ব্যবসার কাজে যুক্ত। এছাড়াও মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ নারী চাষী ও কৃষি শ্রমিক হিসেবেও কর্মরত। জানা যায় নারীরা তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন কর্মে যোগ দিয়ে থাকে। মুসলিম নারীর অর্জিত মর্যাদা তার পরিবারে অর্থনৈতিক বিনিয়োগের সাথে পরিবর্তিত হয়। নারীর উন্নয়ন ও সামাজিক অবস্থানের উন্নতির জন্য তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অনেকাংশেই দায়ী। উত্তরদাতা মুসলিম নারীদের অধিকাংশেরই বার্ষিক আয় ১০ থেকে ১৫ হাজারের মধ্যেই। যাদের পারিবারিক আয় কুড়ি হাজারের উর্ধ্বে তারা সমাজে সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করে থাকে।

সমীক্ষাক্ষেত্র থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে অধিকাংশই নারী উত্তরদাতারা তাদের সন্তানের এবং পরিবারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ পান না, পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এমনকি শিশুর শিক্ষা বা ভবিষ্যতের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীর ভূমিকা নগন্য। মালদা জেলার মুসলিম নারীদের সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে মুসলিম নারী শুধুমাত্র গৃহস্থালির কাজকর্ম, রান্নাবান্না, সন্তান প্রতিফলন, পরিবারের সকলের দেখাশোনা করা এইসবের মধ্যেই ব্যস্ত। তাদের বহির্জগতের সাথে তেমন যোগাযোগই নেই এবং কোন সামাজিক কাজকর্মের অংশগ্রহণের সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত।

মালদা জেলার মুসলিম নারীর সামাজিক পশ্চাৎপদতার আরেকটি কারণ হল পর্দা প্রথা। এটি নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের বাধার সৃষ্টি করে। মালদা জেলার অধিকাংশ মুসলিম নারী গৃহের বাইরে এমনকি বহু সময় গৃহের অভ্যন্তরেও ওড়না, চাদর অথবা শাড়ির আঁচলকেই হিজাব হিসেবে ব্যবহার করে। তবে বর্তমানে মালদা শহরে বোরখা পরার প্রচলন তেমন নেই এবং উত্তরদাতাদের অধিকাংশই বলেছেন যে বোরখা তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মে বাধার সৃষ্টি করে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা পাল্টেছে। মালদা জেলার বর্তমান প্রজন্মের নারীরা নিজেদের

চার দেওয়ালে কুক্ষিগত রেখে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। তারা বর্তমানে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্ত বিষয়গুলিতে অংশগ্রহণ করছে।

শিক্ষাগত অবস্থান

আর্থসামাজিক উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল শিক্ষা। ইসলামিক শরীয়ত মোতাবেক শিক্ষা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই আবশ্যিক, কিন্তু মালদা জেলায় সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় অধিকাংশ মুসলিম নারী ইসলাম নির্ধারিত শিক্ষাগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তারা নিজেরাও ন্যূনতম শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে বাল্যবিবাহ এবং দূরবর্তী স্থানে বিদ্যালয়ের উপস্থিতি অনেকটাই মুসলিম নারীর শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতার কারণ। যারা শিক্ষাগত দিক থেকে নিম্নে অবস্থিত তাদের অধিকাংশেরই বয়স ৪৫ বছরের বেশি। তারা তাদের এই নিরক্ষরতার কারণ হিসেবে বলেছেন পিতা-মাতারা নারীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতেন না। বর্তমানে মুসলিম পরিবারগুলি মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে এবং নারী শিক্ষাকে উৎসাহ দিচ্ছে। মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে সমীক্ষা করতে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। অধিকাংশ উত্তরদাতারাই মনে করেন যে শিক্ষা তাদের কন্যাদের পরিবার ও সমাজের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং মুসলিমদের নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারের তরফ থেকেও বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষিত হচ্ছে তা সত্ত্বেও বহু মুসলিম নারী ন্যূনতম শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত।

তবে সমীক্ষায় স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও নজরে আসে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে উত্তরদাতাদের অধিকাংশই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি খুব বেশি মাধ্যমিক পাশ করার পর শিক্ষার আঙিনায় থেকে বহু দূরে সরে গেছে। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অনিহার কারণ হিসেবে বলেছেন দূরবর্তী স্থানে স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতি, দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অত্যাধিক জোর প্রভৃতি। অধিকাংশ বয়স্ক উত্তরদাতা মনে করেন ধর্মীয় শিক্ষাই

যথেষ্ট, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ হিসেবে তারা বলছেন কর্মসংস্থানের অভাব ও আর্থিক দূরাবস্থা, যার ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ খুব কম দেখা যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মনে করা হয় নারীদের শিক্ষিত করলে তারা পুরুষদের সমান অধিকার দাবি করবে এবং পরিবার ও সমাজে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, তাই বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারী মৌলানা মৌলবীগন নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তুলনায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বেশি মনোনিবেশ করতে বলেন।

ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে স্বামী হল উপার্জনকারী এবং স্ত্রী পরিবারের অর্থের সংগঠক এবং বেশিরভাগই ছিল ব্যয়কারী। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আলাদা, তাদের উপার্জনের ওপর নিয়ন্ত্রণ তাদের স্বায়ত্তশাসনের আরেকটি সূচক। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে নারীরা পরিবারের খরচের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নারীর আয়ের ব্যয়ের ক্ষেত্র স্বামী ও পিতার একচেটিয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে অবিবাহিত মেয়েরা নিজেরাই খরচ করে এবং সঞ্চয় করে। সমীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে নারী উপার্জনে সক্ষম হলেও ব্যয় করার ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের পুরুষদের অনুমতি প্রয়োজন। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে অনেক মহিলা বলছেন তাদের পুরুষ সদস্যরা তাদের বাইরে কাজ করার পক্ষপাতি ছিলেন না, যা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারই পরিচয় বহন করে। তবে বর্তমানে বহু নারী স্বীকার করেছেন যে পরিবারের সদস্যরা কন্যাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করছে, কারণ তারা এটি স্বীকার করেছে যে একজন নারী শিক্ষিত হলে শুধুমাত্র একটি পরিবার নয়, সমাজ ও দেশেরও উন্নতি ঘটবে।

রাজনৈতিক অবস্থান

মালদা জেলার মুসলিম নারীদের ওপর সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বোধের অভাব রয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনোত্তরকালে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ খুবই ক্ষীণ। মালদা জেলার ক্ষেত্রেও সেই একই চিত্র

লক্ষণীয়। তবে কিছু পরিমাণ নারীর উপস্থিতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের অধিকাংশই কোন না কোন অভিজাত ও রাজনৈতিক পরিবার থেকে আগত। ফলে রাজনীতিতে নারীর সার্বিক কল্যাণ ও অংশগ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র শুধুমাত্র যে পুরুষদের বিচরণ ক্ষেত্র, তা নারীর নগণ্য উপস্থিতিই প্রমাণ দেয়। ১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী তপশিলি জাতি উপজাতি ও নারীদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও তা শুধুমাত্র কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। পঞ্চায়েত স্তরের সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য কিছু সংখ্যক নারীর অস্তিত্ব দেখা গেলেও লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় কোনো আসন সংরক্ষণ না থাকায় মহিলা প্রতিনিধির অস্তিত্ব হাতে গোনা কয়েকটা যা অনুপস্থিতির শামিল, এর কারণ হিসেবে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বোধের অভাব, পশ্চাৎপদ সামাজিক অবস্থানকে দায়ী করা যায়। এর জন্য নির্বাচনের প্রতিটি স্তরেই নারীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তাদের এই রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণ হিসেবে শিক্ষার অভাব, আর্থিক ও সামাজিক স্বনির্ভরতার অভাব, পারিবারিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতাকে দায়ী করা যেতে পারে। সমীক্ষা ক্ষেত্রে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার থেকে এটুকু প্রতিভাত হয়েছে যে, অধিকাংশই মুসলিম নারী শুধুমাত্র সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং জয় লাভের পরও তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে সংরক্ষিত আসনে জয়ী হওয়ার পরেও কোন মহিলা প্রার্থী নিজের দায় দায়িত্ব, কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এমনকি কোন মিটিং মিছিলেও অংশগ্রহণ করেন না, পরিবর্তে তার স্বামী বা পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্য গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যাচ্ছে এই সকল ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হচ্ছে বা তার সুফল কতটা হচ্ছে তা আলোচনা সাপেক্ষ। তা সত্ত্বেও নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত নারী ক্ষমতায়ন সম্পূর্ণ হবে না। নারী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ দখলের দ্বারা নিজের ও সমাজের অন্যান্য মহিলাদের সুবিধা ও

অসুবিধাগুলি উচ্চতর স্থানে পৌঁছে দিতে পারবে। ফলে সমাজের নিচু তলার মহিলারাও বিভিন্ন রাজনৈতিক সুবিধা ও সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা পাবে।

নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করতে হবে, শিক্ষা ও উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা রাজনীতি সম্পর্কের সচেতন হয় ও নিজেদের অধিকার এবং দাবি-দাওয়া গুলি আদায়ের জন্য সোচ্চার হতে পারে এবং সর্বোপরি স্বনির্ভর হতে পারে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি ও পুরুষ রাজনৈতিক নেতাদেরও কিছুটা উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে মহিলারা বিশেষ করে পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মহিলারা রাজনীতির আঙিনায় আসে, তার সাথে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু মৌলানা মৌলভীদের ও পরিবারের সদস্যদেরও মহিলাদের সাহায্য করতে হবে। ঘরের চার দেওয়ালই যে মেয়েদের স্থান নয় বরং বাইরের জগতের বৃহৎ পরিসরেও তাদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এই বোধ মহিলাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে তবেই প্রকৃত অর্থে নারী ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে।

মুসলিম পার্সোনাল ল' এর প্রেক্ষিতে মুসলিম নারী

শরিয়তী আইনের প্রতি উলেমাদের অনমনীয় মনোভাবের কারণে মুসলিম নারীরা বর্তমানে অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তারা চাই না যে নারীরা ইসলাম প্রদত্ত অধিকার গুলি ভোগ করুক। বহু উলেমা মনে করেন যে নারীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল তাই তাদের পুরুষের অধীনে থাকা উচিত। এই ত্রুটিপূর্ণ যুক্তির আসল উদ্দেশ্য হল পুরুষদের দ্বারা নারীদের অবদমিত করা। এই মধ্যযুগীয় মনোভাব থেকেই সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে অসাম্য সৃষ্টি হয় এবং এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি হয়ে আসছে। মুসলিম নারীরা উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের জন্য সংগ্রাম করছে যাতে তারা চাকরি গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অগ্রগতিতে স্বাক্ষর রাখতে পারে। এই পরিবর্তন নারীদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছে এবং তারা মুসলিম পার্সোনাল ল' যা ভারতে বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্ত

কিছু নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিবর্তন কামনা করছে। বর্তমানে নারীরা মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর অধীনে থেকে ইসলামিক পরিকাঠামোর সংস্কার দাবি করছে।

ইসলামিক শরীয়ত অনুযায়ী সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় নিকাহনামা দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সরকারিভাবে বিবাহ নিবন্ধীকরণের কোনো প্রমাণ থাকে না। যার ফলস্বরূপ মালদা জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাল্যবিবাহ ও তালাক হয়েই চলেছে। অপরদিকে জুড়েছে যৌতুক প্রদানের চাপ, যার ফলে বহু ক্ষেত্রে দেখা একজন নারীর জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মালদা জেলার সমীক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে, কিভাবে যৌতুক প্রদান করতে না পেরে একজন নারীকে কম বয়সে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হতে হচ্ছে। সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় অধিকাংশ নারী শরীয়তের বৈষম্যমূলক প্রকৃতি তুলে ধরেছেন। অধিকাংশ মুসলিম নারী মনে করেন যে তিন তালাক এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রীকে কোন ভরণপোষণ না দেওয়াই একজন মুসলিম নারী কিভাবে তার বাকি জীবন দুঃখ কষ্ট অতিবাহিত করছে তা কল্পনার অতীত। ইদ্দত পর্বের পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের দাবীতে শাহবানু মামলাটি এ বিষয়ে প্রনিধানযোগ্য। জাতীয় স্তরেও বিতর্ক চলছে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তনের জন্য, বিশেষ করে তিন তালাক প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে ও তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ইদ্দত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও যদি সে পুনর্বিবাহ না করে থাকে তবে তার ভরণপোষণ দেওয়ার দাবিতে। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই মুসলিম মহিলা সংগঠনগুলি মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তন দাবি করছে। বেশিরভাগ তরুণ শিক্ষিত মুসলিম মহিলারা পরিবর্তনের পক্ষে রয়েছে, তবে অশিক্ষিত মহিলারা এ বিষয়ে কোন কথা বলেন না, তাদের নিজেদের শরীয়তী জ্ঞান খুব নগণ্য এবং তারা পরিবারের পুরুষ সদস্য দ্বারাই চালিত। মালদা জেলার বহু শিক্ষিত মুসলিম নারী মুসলিম পার্সোনাল ল’ এর সংস্কার দাবি করছেন এবং তার পরিবর্তে তারা ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করার কথা বলছেন, যার দ্বারা মুসলিম মহিলারা উপকৃত হবে। কোরআনে উল্লেখ আছে যে তালাকের পর যদি কোন নারী

তার খরচ বহন করতে অক্ষম হয় বা সে আর্থিকভাবে দরিদ্র হয় তাহলে তার প্রাক্তন স্বামীর যদি পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে তাহলে মানবিক কারণে তাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে এবং এটি একটি মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু মুসলিম সমাজে পুরুষরা ইদ্দতকালের বাইরে স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে চাই না। তারা মনে করে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলারা পুনরায় বিবাহ করতে পারে এবং কোন মহিলা যদি বিয়ে না করে সেক্ষেত্রে পিতা-মাতা এবং ওয়াকাফ বোর্ডকেই ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

পরামর্শ

গবেষণা কার্যটিতে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে কর্মসংস্থান ও শিক্ষা মুসলিম সমাজে মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন নারীদের জন্য অনুকূল নয়। নিঃসন্দেহে মালদা জেলার মুসলিম নারীদের শিক্ষা ও কর্মে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে কিন্তু তা যথেষ্ট ধীরগতিতে। নারীর উন্নতির জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রের মুসলিম পার্সোনাল ল' এর সংস্কার আনতে হবে এবং নারীদের জন্য বিভিন্ন নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারি আইন ও উন্নয়ন নীতি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে নারীদের সক্ষম করেছে। তবে এখনও অনেক কিছু করা দরকার কারণ সাংবিধানিক লক্ষ্য এবং মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থার পরিস্থিতিগত বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। মুসলিম নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাদের দেশের আইনগত ও প্রশাসনিক বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

- শিক্ষাগত কর্মসূচি যেমন সর্বশিক্ষা অভিযান, প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার জন্য জাতীয় কর্মসূচি, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি দূরবর্তী গ্রামে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। ম্যাট্রিক স্তর পর্যন্ত মুসলিম মেয়েদের বৃত্তি দেওয়া, শুধুমাত্র মেয়েদের স্কুল খোলা

উচিত কারণ মুসলিমরা তাদের মেয়েদের শুধুমাত্র বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাতে পছন্দ করে।

- মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার উন্নত করতে সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা উচিত। রাজ্যে বিনামূল্যে আবেদন পত্রের সুবিধা, পদোন্নতিতে সংরক্ষণের পাশাপাশি নিজ জেলায় বা গ্রামের কাছাকাছি কর্মনিযুক্তি, দরিদ্র ও নিরক্ষর মুসলিম নারীদের বিভিন্ন গ্রামীণ প্রকল্পের অধীনে কাজ দিতে হবে।
- রাজনীতিতে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য শুধুমাত্র মুসলিম নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত এবং বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন শিবির ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।
- মুসলিম পার্সোনাল ল' এর অধীনে বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই রেজিস্ট্রি পত্রে তালাকের শর্তাবলী, রক্ষণাবেক্ষণ ও মোহরের স্পষ্ট উল্লেখ রাখতে হবে। কন্যা শিশুদের বিবাহের বয়স বাড়াতে হবে এবং কন্যা শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে হবে। বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। ২০০৬ এর অধীনে ১৮ বছরের আগে বিবাহ বাতিলযোগ্য করতে হবে, বহুবিবাহ বাতিল করতে হবে, একত্রে তিন তালাক উচ্চারণ মুসলিম নারীর প্রতি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে এবং সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে তালাক বাতিল করতে হবে।
- মুসলিম কন্যাদেরকে শরীয়ত অনুসারে সম্পত্তির অংশের অধিকারী করতে হবে, ইদ্দত পর্ব অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মেয়েদের পুনর্বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডকে নিতে হবে এবং মুসলিম স্ত্রীর ভরণপোষণের বিধান সমূহ মুসলিম মহিলা আইন ১৯৮৬ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ১

গবেষণা সম্বন্ধিত প্রশ্নাবলী

মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ধর্মীয় ভাবাবেগে জানার জন্য নির্মিত প্রশ্নাবলী এগুলোর কোনো সঠিক/ভুল উত্তর নেই। নিজস্ব জ্ঞান, উপলব্ধি ও মতামতের ওপর নির্ভরশীল এবং শুধুমাত্র গবেষণা পত্রের জন্য ব্যবহৃত হবে।

প্রস্তুতকারক - ডঃ দেবজিৎ দত্ত ও ইয়াসমিন রেজা

নাম -

বয়স -

লিঙ্গ – স্ত্রী/পুরুষ

পেশা - চাকুরী/ব্যবসা/কৃষিকাজ/গৃহকর্ম

বসবাসের স্থান – গ্রাম/শহর/শহরতলী

ধর্ম – হিন্দু/মুসলিম/খ্রিষ্টান

বৈবাহিক মর্যাদা – বিবাহিত/অবিবাহিত/বিধবা

A. শিক্ষা

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা -

২. স্কুল ছুট এর কারণ -

৩. পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল – হ্যাঁ/না

৪. শিক্ষার মাধ্যম – বাংলা/ইংরেজি/উর্দু/আরবি

৫. শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান - স্কুল/মাদ্রাসা

B. অর্থনৈতিক সচেতনতা

১. আপনি কি স্বনির্ভর – হ্যাঁ/না

২. কি কাজ করেন -

৩. মাসিক আয় -

৪. আপনি কি জানেন ইসলাম ধর্ম নারীকে স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করেছে – হ্যাঁ/না

৫. আপনার কাজের ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় বাধা আছে কি – হ্যাঁ/না

C. রাজনৈতিক সচেতনতা

১. আপনি ভোট প্রদান করেন – হ্যাঁ/না

২. নির্বাচনে নারীরা অংশ নিতে পারে সে বিষয়ে আপনি জানেন – হ্যাঁ/না

৩. আপনি কি মনে করেন নারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ জরুরি – হ্যাঁ/না

৪. নারীর ভোটে অংশগ্রহণ কেন জরুরি বলে আপনি মনে করেন -

D. বিবিধ

১. পরিবারের সকলের আপনার প্রতি ব্যবহার কেমন – ভালো/খারাপ/খুব সম্মান করে

২. পরিবারের কোন বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে -

৩. i. ইসলাম ধর্মে তিন তালাক প্রথা আছে জানেন – হ্যাঁ/না

ii. ভারত সরকার 2018 সালে তিন তালাক প্রথা আইন করে বন্ধ করেছে আপনি কি জানেন – হ্যাঁ/না

iii. তিন তালাক প্রথা বন্ধ করা কি ভাল হয়েছে – হ্যাঁ/না

৪. i. সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলি আপনারা পেয়েছেন – হ্যাঁ/না

ii. সরকারি প্রকল্পগুলি দাঁড়া উপকৃত হয়েছেন – হ্যাঁ/না

৫. i. অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীরা আপনাদের থেকে এগিয়ে আছে – হ্যাঁ/না

ii. কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে -

iii. সেই সব সুযোগ-সুবিধা পেতে আপনাদের প্রতিবন্ধকতা কোথায় –

৬. নিজস্ব মতামত

পরিশিষ্ট - ২

তালাক প্রাপ্ত নারী দোকানে কাজ করে নিজের ভরণপোষন করছে

অঙ্গনয়ারি কর্মীর সাক্ষাৎকার

বিড়ি শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে

মানিকচক এন. বি. হাই মাদ্রাসায় ব্লক থেকে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রোগ্রাম

মানিকচক এন. বি. হাই মাদ্রাসায় ব্লক থেকে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রোগ্রাম

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপাদান সমূহঃ .

প্রকাশিত সরকারি রিপোর্ট ও দলিল সমূহঃ

Bengal legislative council proceedings, vol. IV, dated 01.09.1922.

Beverly H., *Report on the Census of Bengal*, Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat Press, 1872.

Census of India 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011.

Election Result 2014, www/ndtv.com/election/article-2014/election- result—2014-61-women elected to Lok Sabha-525990, retrived on 30.05.2023

General Report of the Public Instruction, Bengal, 1875-76, 1884-85.

GOI (Mandal Commission), *Report of Backward Class Commission*, New Delhi, Part-I, Vol-I, 1980.

GOI, Mehta Ashoka, *Committee on Panchayati Raj Institution*, New Delhi, Dept of Rural Development, 1978.

GOI, Ministry of Education, *Report of the National Committee on Women's Education*, New Delhi, Manager of Publication, 1959.

GOI, Ministry of Education, *Report of the Secondary Education Commission (1952-1953)*, New Delhi, 1952.

GOI, Ministry of Minority Affairs, *Report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities*, New Delhi, Alknanda Advertising Pvt. Ltd., 2007.

GOI, *National Policy on Education 1986*, New Delhi, Ministry of Human Resource Development, Dept of Education, May 1986.

GOI, *Report of the Committee to Look into the Cause for Lack of Public Support Parti1cularly in Rural Areas for Girls Education and to Enlist Public*

Cooperation, New Delhi, Ministry of Education, Publication No. 736, 1965.

GOI, *Social Economic and Educational Status of the Muslim Community of India,* New Delhi, Prime Minister's High Level Committee Cabinet Secretariat, 2006.

GOI, *The Constitution Seventy Third Amendment Act 1992 on the Panchayat*, New Delhi, Ministry of Rural Development, 2003.

GOI, *The Constitution Seventy Third Amendment Act 1992 on the Panchayat*, New Delhi, Ministry of Rural Development, 2003.

GOI, *The Report of the University Commission,* Delhi, Manager of Publications civil lines, 1963.

GOI, *Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India*, New Delhi, Social Welfare Department, 1974.

Government of British India, *Woods Dispatch Report*, 1954.

Govt. of West Bengal, *Election Report*, Chief Electoral Officer and Ex-officio Secretary Home (C&E) Department.

Govt. of West Bengal, No.67, Dated 17.08.1947.

GOWB, Directorate of Madrasah Education, WB, *Annual Report for 2011-2012, Minority Affairs and Madrasah Education Department,* WB, Kolkata, Bikash Bhavan, 2012.

GOWB, *District Human Development Report Malda*, Kolkata, Development and Planning Department, 2007

Madrasah Board of Education, *Report of the Madrasah Education Committee*, West Bengal, 2002.

Ministry of Education, *Report of the India Education Commission*, New Delhi, 1964-66.

Sarva Shiksha Abhiyan, *Frame Work for Implementation, Para I. 4, p.2 and (OM NO. F.-29/2005)* F. F. 3 dated 19.08.2005 Norms for Interventions under SSA, New Delhi, 2005.

গেজেটিয়ার ও অন্যান্য দলিল সমূহঃ

Ali Syed Ameer, *Muhammedan Education and Muhammedan Society, Presidential Address Delivered at the Muhammeda Educational Conference of 1899,* Calcutta, 1900.

Hunter W. W., *Stastical Account of Bengal,* Vol.VI, Noakhali, New Delhi, Govt. of India, 1973, p.79.

Lambourne G E, *Bengal District Gazetter, Malda,* Esa. B. A., 1918, p.26.

Mitra A(ed), *District Census Hand Book, Malda*, PCLXXXII, West Bengal, 1951.

Sengupta J C, *West Bengal District Gazetter, Malda*, Calcutta, Esa. B.A., 1969.

Singh J. and Singh P. B., *Dimension and Implication of Urbanization in the Least Develop Countries,* paper presented at the International Conference on Urban and Regional Change in Developing Countries, Kharagpur, 11-15 Decmber 1981.

প্রকাশিত (অসরকারি) দলিল সমূহ (বাংলা):

দুর্গাকিংকর ভট্টাচার্য শতবার্ষিকী সংকলন, *সত্যেরে লও সহজে (১৯১৪-২০১৪),* মালদা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, *মালদহ,* কলকাতা, ১৯৫৪।

ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব, *ফিরে দেখাঃ বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম ৫ বছর,* কলকাতা, এস পি কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম খণ্ড, ২০১৬।

ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব, *ফিরে দেখাঃ বামফ্রন্ট সরকারের শেষ ১০ বছর,* কলকাতা, এস পি কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় খণ্ড, ২০১৭।

মালদা জেলা কমিটি, সি. পি. আই (এম), *আলোর পথিক মানিক ঝা,* ২০০১।

মালদা জেলা পরিষদ, *স্মরণে বিমল দাস,* সি. পি. আই, ২০০২।

স্মরণে প্রভাত আচার্য, *নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন,* মালদা শাখা, ২০১৩।

পত্র পত্রিকাঃ

ইসলাম প্রচারক, ১৯০৯।

ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ন- পৌষ ১৩১০,পৃ.৪১৮।

দৈনিক বসুমতী, ২৫ ফাল্গুন, ১৩৭২।

দৈনিক বসুমতী, ২৫ ফাল্গুন, ১৩৭২।

ভারতবর্ষ, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২০।

মালদহ সমাচার পত্রিকা, ৬ নভেম্বর ২০১৩।

মালদা টাউন হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক) ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব স্মরণিকা।

মিহির ও সুধাকর, ১৪ আশ্বিন, ১৩১১।

*রূপান্তরের পথে,*২০১৩।

স্মরণিকাঃ আইহো গার্লস স্কুল সুবর্ণজয়ন্তী, ১৯৮৩।

স্মরণিকাঃ আইহো গার্লস স্কুল সুবর্ণজয়ন্তী, ১৯৮৩।

স্মরণিকাঃ জালালিয়া গার্লস স্কুল প্ল্যাটিনাম জুবিলি, বিবি জয়নাবের স্মৃতিচারণ, ১৯৯৪।

স্মরণিকাঃ জালালিয়া গার্লস স্কুল প্ল্যাটিনাম জুবিলি, বিবি জয়নাবের স্মৃতিচারণ, ১৯৯৪।

The Musalman, 26.04.1907

The Musalman, 29.06.1921.

Hindusthan Standard, 19 July 1947.

সহায়ক গ্রন্থাবলী (বাংলা)

আলি খান ইউসুফজাই নৌসের, *বঙ্গীয় মুসলমান,* কলকাতা, হিন্দুপ্রেস, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ।

আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,* দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

আহমেদ তাহেরুদ্দিন, *স্ত্রী শিক্ষা,* সওগাত, কার্ত্তিক ১৩৩৪।

ওদুদ কাজী আব্দুল, *বাংলার জাগরণ,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৬।

কাদির আব্দুল(সাঃ), *বেগম রোকেয়াঃ অবরোধবাসিনী,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।

খাতুন কাশেমা, *নারীর কথা,* সওগাত, আষাঢ় ১৩৩৩।

খাতুন নুরুন্নেসা, *নারী জাতির শিক্ষা,* সওগাত, জৈষ্ট্য ১৩২৬।

খান ইয়াসিন (সম্পাঃ), নারীঃ সমসাময়িক চোকে, কলকাতা, এস. এন. এন্টারপ্রাইজ, ২০১৫।

খান ইয়াসিন (সম্পাঃ), সমকালীন ভাবনায় নারী, কলকাতা, এডুকেশন ফোরাম, ২০১৫।

গনি ওসমান, *ইসলাম ও নারী সমাজ,* কলিকাতা, ২০১২।

ঘোষ তুষার কান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা,* কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০২০।

ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারাঃ প্রাক বৈদিক যুগ হতে স্বাধীনতার কাল অবধি,* কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০২০।

ঘোষ প্রদ্যোত, *বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯),* কলকাতা, ১৪১৩।

ঘোষ বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০,* ৫ম খণ্ড, কলকাতা, পাঠভবন, ১৯৬৮।

ঘোষ বিনয়, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১০৮৪।

চক্রবর্তী সুধীর কুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের প্রেক্ষিতে মালদহ,* মালদা, প্রথম প্রকাশনী, ১৯৯৯।

জোয়ারদার মানস, *শিক্ষা ও সমাজ গতি এবং দুর্গতি,* কলকাতা, বিসংবাদ প্রকাশনী, ২০০৭।

দাস শর্মিষ্ঠা, অগ্নিযুগের বঙ্গনারী (১৯০০-১৯৩০ এর দশক), কলকাতা, লাকী পাবলিশার্স, ২০২০।

দে অমলেন্দু, ভারতের মুসলিম রাজনীতির গতি-প্রকৃতি, কলকাতা, রক্তকরবী, ২০০৭।

নাসরীন সৈয়দ তানভীর, তিন তালাক, মুসলিম নারী, আরো কিছু প্রবন্ধ, কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ২০১৭।

বন্দোপাধ্যায় কল্যাণী, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ: নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান,* কলকাতা, মিত্রম, ২০০৯।

বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণী, নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়েঃ অন্ধকারে আলর দিশা, কলকাতা, নারায়ণ প্রিন্টিং, ২০২০।

বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণ ও চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ, ভারতের ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িকতার অভিঘাত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০২৩।

বাগল যোগেশচন্দ্র, *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬,* কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৭।

বালা শচীন্দ্রনাথ ও গোস্বামী ঋতব্রত (সম্পাঃ), *মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২২।

ভট্টাচার্য মলয় শঙ্কর (সম্পাঃ), *মালদহ চর্চা,* কলকাতা, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ২০১১।

মিশ্র সমর কুমার, *মালদহ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৭।

মিশ্র সমর কুমার, *স্বাধীনোত্তর কালে মালদা জেলার রাজনীতি ও নির্বাচন,* কলকাতা, অক্ষর বিন্যাস, ২০২১।

মুখোপাধ্যায় কনক, *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা,* পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৫।

মুখোপাধ্যায় জীবন, *আধুনিক ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস,* কলকাতা, ২০১১।

মুর্শিদ গোলাম, নারী:*আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী,* কলকাতা, নয়া উদ্যোগ ২০১৪।

মুসবি শিরিন, *মুঘল ভারিতে নারী শিক্ষা, ইতিহাসে নারীঃ শিক্ষা,* পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, বেথুন কলেজ, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১।

মুহাম্মাদ শেহনেওয়াজ আব্দুল কাদের, *ইসলামে যেভাবে নারীর পর্দাপালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে,* যুগান্তর পত্রিকা, ২৮ জানুয়ারী, ২০২০, অনলাইন সংস্করণ।

মোল্লা নাসিরুদ্দিন, *ইসলাম ধর্মে তালাক প্রথাঃ তত্ত্ব ও বাস্তব,* কলকাতা, লেজার টেক অ্যান্ড পি এস জি পাবলিকেশন, ২০১২।

রফিক আব্দুল, *নারী শিক্ষা বিস্তারে পথিকৃৎ ফয়েজুন্নেসা,* খোঁজ, নববর্ষ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

রফিকউল্লাহ, *হাদীস শরীফ,* হরফ, ১৯৯৭।

রসিদ আব্দুল, *আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ৎ,* শিক্ষা, চৈত্র ১৩৩৩।

রহমান সামসুর, বাঙালী মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ২০১৬।

রাকিব আব্দুর, *ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান,* কলকাতা, মল্লিকব্রাদারস, ২০০৫।

রায় বিনয়ভূষণ, *অন্তঃপুরের স্ত্রী শিক্ষা,* কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৮, পৃ.১৩-১৪।

সরকার চণ্ডী প্রসাদ, *বাঙালি মুসলমান (১৮৬৩-১৯৪৭),* কলকাতা, মিত্রম, ২০০৭।

সাহিত্যিক ফাল্গুন, ১৩১১, *নারী শিক্ষা সমিতির সভানেত্রীর ভাষণ।*

সিদ্দিকী এম কে এ, *সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা সমস্যা,* কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, নভেম্বর ১৯৯৯।

সুরা নিসা, আল কোরান, উদ্ধৃত, কানিজ সাইয়েদা মুস্তাফা, *ইসলামে নারীর অধিকার,* কলকাতা, বাণী প্রকাশ, ১৯৮৮।

সেন রঞ্জিত, দাশ সুস্নাত, দাস আশীস কুমার (সম্পাঃ), আধুনিক ভারতঃ স্বদেশ ও সমকাল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০২২।

সোম সুস্মিতা, *মালদহঃ জাতি, সম্প্রদায় ও কুটির শিল্প,* কলকাতা, সোপান, ২০১১,

সোম সুস্মিতা, *মালদহঃ ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি,* কলকাতা, সোপান, ২০১৬।

সোম সুস্মিতা, *মালদা রাজ্য-রাজনীতি, অর্থ-সমাজনীতি,* কলকাতা, সোপান, ২০১৮।

হক মফিদুল, নারীমুক্তির পথিকৃৎ, কলকাতা, কথা, ২০০৮।

হক শেখ সাইদুল, মুসলিম মৌলবাদ ও মুসলিম জনমানস, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০তম বর্ধমান জেলা মেলা।

হাসান মইনুল, *মুসলিম সমাজ এবং এই সময়,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

হোসেন আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭),* কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৬।

হোসেন কাজী মোতাহের, *বাঙালী মুসলমানের দৈন্য,* সওগাত, মাঘ ১৩৩৭।

সহায়ক গ্রন্থাবলী (ইংরেজি)

A Shariff, National sample Survey Organization (NSSO), 43rd Round, 1987-88, quoted in Sebastian Vempery, *Minorities in Contemporary India*, New Delhi, Kanishka, 2003.

Abedi Zakia, *Indian Muslim: Social Economic and Educational Status,* Delhi, Arise Publishers, 2011.

Agarwal S P and Agarwal J C, *Women Education in India*, New Delhi, Concept Publishing Co.,1994.

Agarwal Sushila, *Status of Women*, Jaipur, Print Well Publishers, 1988.

Ahmed A.G., *The Religion of Islam*, 1945.

Ahmed Aqil, *Mohammedan Law*, Allahbad, Central Law Agency,23rd Ed, 2004.

Ahmed Imtiaz(ed.), *Family, Kinship and Marriage among Muslims in India*, New Delhi, Manohar Publications 1976.

Ahmed Naseem, *Liberation of Muslim Women, Delhi*, Kalpaz Publication, 2001.

Ahmed Naseem, *Women in Islam,* New Delhi, APH Publishing Corporation, 2003.

Ahmed Naseem, *Women in Islam*, New Delhi, APH Publishing Corporation, 2003

Ahmed Rafiuddin, *The bengal Muslims (1871-1906) A Quest for identity,* New Delhi, OUP, 1981.

Ahmed Sufia, *Muslim Community in Bengal 1884-1922*, Dacca, Oxford University Press, 1974.

Al Alusi Mahmud b Abdullah, *Ruh-al-Mani fi Tafsir Al-Quran*, Baghdad, 1854.

Al Qur’an.

Alam Dr. Jafar, *Islamic Education, Theory and Practice*, New Delhi, Publisher and Distributer, 1991.

Al-ASH'ARI, *PURDAH and the Status of Women in Islam,* New Delhi, Mohit Publication, 1999.

Al-Hakim al Nisaburi Muhammad, *al Mustadrak*, USA, Seller Inventory, Vol.4, 1917.

Ali Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an,* 4:19 (translated in English), New Delhi, Royal Publishers and Distributors, 2009.

Ali Abid, *Memoirs of Gour and Pandua,* Calcutta, Bengal Secretariate Book Depot, 1924.

Ali Amir, *Women in Islam*, London, University of London Press, 1912.

Ali Mohammad Mohar, *History of Muslims in Bengal: A Survey of Administrative Society and Culture*, Riyad, Dept. of Culture & Publications, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic Society, 1985.

Ali Syed Ameer, *Muhammedan Education and Muhammedan Society, Presidential Address Delivered at the Muhammeda Educational Conference of 1899,* Calcutta, 1900.

Ali Syed Anwar, *The Spirit of Islam: A History of Evolution and Ideals of Islam,* Delhi, B. I. Publications, 1978.

Altekar A. S, *The Position of Women in Hindu Civilization*, Delhi, Reprint, 1962.

Azim Saukath, *Muslim Women Emerging Identity*, New Delhi, Rawat Publication, 1997.

Bagchi Jasodhara & Dutta Gupta Sarmistha(eds), *The Changing Status of Women in West Bengal, 1970-2000,* New Delhi, Sage Publication, 2005.

Beverly H., *Report on the Census of Bengal*, Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat Press, 1872.

Bhatty Zarina , *Purdah to Piccadilly : A Muslim Women Struggle for Identity*, New Delhi, Sage Publication, 2016.

Billington Mary Francies, *Women in Islam*, London, Chapman & Hall, 1859.

Biswal Tapan (ed.), *Laws Institutions and Women Right in India*, New Delhi, Viva Books, 2006.

Buch Nirmala, *Women's Experience in New Panchayats: The Emerging Leadership of Rural Women*, New Delhi, Center for Women's Development Studies, Occasional Paper, No.35, 2000.

Carrol Lucy, *The Muslim Women's Right to Divorce*, Manushi, No. 38, 1987.

Chadra Bipan, *History of Modern India*, New Delhi, Orient Blackswan, 2020.

Chakravarti Debanjana, *Women in Decision Making in Rural Governance in West Bengal: Challenges in the Path of Political Empowerment and Development (1990-2015)*, Jadavpur University, Department of International Relations, 2020.

Chanda Anuradha, Sarkar Mahua and Chattopadhyay Kunal (Eds), *Women in History*, Kolkata, Progressive Publishers, 2003.

Chaturvedi Archana(ed), *Encyclopedia of Muslim Women: Muslim Women and Society*, New Delhi, Commonwealth Publishers, 2003.

Choudhury Jayasri, *Political Participation of Women in West Bengal: A Case Study*, Calcutta University, Dept. of Political Science, 1993.

Choudhury Raveena, *Women in Muslim Society: A Case Study of Bhaderwah Tehsil*, University of Jammu , Dept. of Sociology, 2016.

Dey Amalendu, *Roots of Separatism in 19th Century Bengal*, Calcutta, Ratan Prokashan, 1974.

Dey Parth Sarathi, *Contribution of Kanyashree Prakalpa Towards Empowerment of Girl Child and Young Women: A Case Study of North 24 Parganas and Malda Districts of West Bengal*, RBU, Dept. of Political Science, 2015.

Diwan, *Muslim Law in Modern India*, Faridabad, Allahabad Law Agency, 2005.

Dutta Prabhat & Sen Panchali, *Women in Panchayat in West Bengal: An Exploratory Study*, SIPRD, West Bengal, Kalyani, Kolkata, Dasgupta & Co., 2003.

Engineer A. A., *Islam, Women and Gender Justice* , New Delhi, Gyan Publishing House, 2013.

Engineer A. A., *Muslims and India*, New Delhi, Gyan Publishing House, 2006.

Engineer A.A., *The Qur'an, Women and Modern Society*, New Delhi, Sterling Publishers Pvt Ltd, 2005.

Engineer A.A., *The Rights of Women in Islam*, New Delhi, Sterling Publishers Pvt Ltd, 2008.

Engineer Ashgar Ali, *Muslim Minority Continuity and Change*, New Delhi, Gyan Publishing House, 2009.

Farooqi Ifta Rashid, *Position of Women in ISLAM*, New Delhi, Adam Publishers & Distributers, 2011.

Forbes Geraldine Hancock, *Woman in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiography*, New Delhi, Chronicle Books, 2005.

Forbes Geraldine, *Women in Modern India*, The New Cambridge History of India, Cambridge, Cambridge University Press, Vol. 2, 1996.

Fyzee A .A .A, *Islamic Law in the Modern World*, in Hussain. Z. (ed.), *Islamic Values in the Modern World*, New Delhi, Crescent Printing Works.

Fyzee A.A.A, *Out Lines of Mohammadan Law*, New Delhi, Oxford University Press, 1964.

Gazi Abdur Rajjak, *The Status of Muslim Women in West Bengal*, Calcutta University, Dept. of Geography, 2015.

Gerth H. H. & Mill C. Wrigth (eds.), *Essays in Sociology*, New York, Oxford University Press.

Ghosh Jayasri, *Political Participation of Women in West Bengal: A Case study*, Calcutta, Progressive Publishers, 2000.

Ghosh Supartha, *Democracy at the Grassroots: A Study of the Role of Women in Panchayats of Gazole and Bamongola Blocks in Malda Districts*, Raiganj University, Dept. of Political Science, 2020.

Gibraltar, *The Massage of the Quran,* Muhammmad Asad, London, E.J. Brill Publishers, 1980.

Hamilton Alexander, *A New Account of the East Indies*, Madried, 1727.

Hasan & Menon, *In A Minority, Delhi,* Oxford University Press, 2004.

Hasan Zoya, Menon Ritu, *Unequal Citizens: A Study of Muslim Women in India*, Delhi, Oxford University Press.

Hashia Haseen(ed.), *Muslim Women in India since Independence*, New Delhi, Genuine Publication & Media pvt. Ltd., 1998.

Hossain Md. Intekhab, *Socio-Economic status of OBC Muslims: A Sociological Study From Some Districts of West Bengal*, Vidyasagar University, Dept. of Sociology, 2014.

Hossain Najmul, *Muslim Non-Muslim Differentials in Education, Employment and Fertility in Malda District, West Bengal*, Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.

Hunter W. W, *The Indian Musalman*, Dhaka, khoshroz Publication Limited, 1975.

Hunter W. W., *A Statistical Account of Bengal (Malda)*, West Bengal, N. L. Publishers, 1986.

Hunter W. W., *Stastical Account of Bengal,* Vol.VI, Noakhali, New Delhi, Govt. of India, 1973, p.79.

Husain Sabiha, *The Changing Half: A Study of Indian Muslim Women*, New Delhi, Classical Publishing Company, 1998.

Hust Evelin, *Womens Political Representation and Empowerment in India: A million Indiras Now?*, New Delhi, Monohar, 2004.

Ikramullah Shaista, *from Purda to parliament*, London, Cresset Publishers, 1963.

Ikramullah Shaista, *Behind the Veil*, Karachi, Oxford University Press, 1992.

Imran Muhammad, *Ideal Women in Islam*, London, Islamic Publishers Ltd., 1981.

Jabeen Rifat, *Panchayati Raj Institutions and Women's Empowerment: a critical Study of Local Governments in Burdhaman District (West Bengal),* Alighar Muslim University, Advanced Centre for Women Studies, 2017.

Jahangir K.N., *Muslim Women in West Bengal*, Kolkata, Minerva Publication, 1991.

Jain Shashi, *Status and Role Perceptions of Middle Class Women*, New Delhi, Puja Publishers, 1988.

Jawad Haifa, *The Rights of Women in Islam*, New York, St. Martin's Press, 1998.

Jayapalan N, *History of Education in India,* New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 2005.

Jayaraj Nirmala, *Women and Society,* Madurai, lady Doak College, 2001.

Joshi Savita Thakur, *Women and Development : The Changing Scenario*, New Delhi, Mittal Publications, 1999.

Kapur Promila, *Marriage and Working Women in India*, Delhi, Vikas Publication, 1970.

Kazi Seema, *Muslim Women in India*, *London*, Minority Rights Group International, 1999.

Keay F E, *A History of Education in India and Pakistan,*New Delhi, Oxford University Press, 1879.

Khan Qamaruddin, *Status of Women in Islam*, New Delhi, Sterling Publishers, 1990.

Khurshid Fouzia, *Education and The Changing Status of Muslim Women: A Case Study of Srinagar District (Jammu and Kashmir)*, Unpublished Thesis in Aligarh Muslim University, 2013.

Levy Reuven, *The Social Structure of Islam*, Cambridge, Cambridge University Press, 1967.

M. Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, London, 1961.

Mahmood Tahir, *Muslim Law in India*, New Delhi, Universal Law Publishing Co. 1982.

Majumdar Vina(ed.), *Symbols of Power*, Bombay, Allied, 1978.

Maleka Quazi, *A Critical Study of Education and Status of Muslim Women in Aurangabad City*, Aurangabad, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Dept. of Education, 1994.

Mandal baum Paul, *Dowry death in India*, Commonwealth,(oct,8).

Mandal Keshab Chandra, *Empowerment of women and Panchyati Raj : Experiences from West Bengal*, Kolkata, Levant Books, 2010.

Mariam Allana, *Muslim Women and Islamic Traditions: Studies in Modernization*, New Delhi, Kanishka Publishers and Distributors, 2000.

Md. Ali Azam, *Life of Maulavi Abdul Karim*, Calcutta, Author, 1939.

Md. Moinuddin, *Understanding Muslims Situation in West Bengal, Some Reflections on Socio Economic and Political Status*, Germany, Lap Lambert Academy Publishing, 2011.

Menon Indu, *Status of Muslim Women in India*, New Delhi, Uppal Publication, 1981.

Menon Latika, *Women Empowerment and Challenge of Change*, New Delhi, Kanishka Publishers, 1998.

Mishkat, Mazhar- e Haq, *Kitab-ul-Ilm*, Vol.1, H.No.20

Mittal Mukta, *An Evaluation of Feminism Today*, New Delhi, Arise Publishing and Distributors, 2012.

Mohammed Bakhtawar Batoolsh, *The Right to Education & Status of Muslim Women*, Surat, VNSGU, Dept. of Law, 2019.

Moinuddin S. A. H., *Divorce and Muslim Women*, New Delhi, Rawat Publication, 2000.

Mondal Sekh Rahim, *Dynamics of Muslim Society*, New Delhi, Inter India Publication, 1994.

Mondal Sekh Rahim, *Educational Status of Muslim : Problems, Prospects and Priorities*, New Delhi, Inter India Publication, 1997.

Mondal Sekh Rahim, *Rural Muslim Women: Role and Status*, New Delhi, Northern Book Centre, 2005.

Mukherjee Ila, *Social Structure of North Indian Women, 1526-1707*, Agra, Shivalal Agarwala and Co., 1972.

Murshid Gulam, *Reluctant and Debutant: Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905,* Rajshahi, Rajshahi University Press, 1983.

Murshid Tazeen M, *The Sacred and The Seculer: Bengal Muslim Discourses 1871-1977,* New Delhi, OUP, 1995.

Nainar Vahida, *Muslim Women's Views on Personal Laws*, Bombay, women's Research and Action Group, 2000.

Nanda B.R.(ed.), *Indian Women from Past to Modernity*, New Delhi, Vikas Publication House, 1976.

Naseef Dr. Abdullah-o, *Encyclopedia of Seerah*, London, Seerah Foundation, Vol. III, 1983.

Natarajam Samitha Rani, *Policies, Programmes and Commissions on Women*, New Delhi, Jananda Prakashan, 2017.

Phillips Anne(ed), *Feminism and Politics*, New York, Oxford University Press, 1998.

Pickthal M. M., *Cultural Side of Islam*, Delhi, Kitab Bhavan, 1927.

Qureshi Muniruddin, *Women in Islam*, New Delhi, Reference Press, 2003.

Rahim Abdur, *The Principles of Mohammadan Jurisprudence*, Lahore Ed, 1958.

Rashid Syed Khalid, *Muslim Law*, 5th Ed. revised by Bharatya. V.P. 1959.

Rawat Hemant, *Women and Education*, New Delhi, Sports Publication, 2011.

Reddy C. Raghunatha, *Changing Status of Educated Working Women*, Delhi, B. R. Publishing Corporation, 1986.

Rennell James, *Memoir of A Map of Hindusthan Or The Mogul Empire*, London, M Brown Publisher, 1788.

Roulet Margulrite, *Dowry and Prestige in North India*, Contributions to Indian Sociology (New Series), 30(1), pp.89-106.

Roy Bharati(ed), *Women in India: Colonial and Post-Colonial Periods*, New Delhi, Sage Publication, Vol.IX(3), 1995.

Roy Raka, *Fields of Protest: Women's Movements in India*, New Delhi, Kali for Women, 2000.

Roy Shibani, *Status of Muslim Women in North India: A Study in Dynamics of Change*, New Delhi, B. R. Publishers Corporation, 1979.

Sachchidnanda and Sinha, *Women's Rights: Myth and Reality*, Jaipur, Printwell Publishers, 1984.

Saha Gandhari (Eds), *Child Marriage : The Root of Social Meladies*, Kolkata, Levant Books, 2017.

Samiya Mufti Tabassum, *Status of Muslim Women in India : Law Relating to Marriage, Divorce and Maintenance,* New Delhi, Regal Publications, 2013.

Sarkar Ashim Kumar, *Nationalism, Communalism and Partition in Bengal: Malda, 1905-1953*, Kolkata, 2013.

Sarkar Mohua, *Visible Histories Disappearing Women : Producing Muslim Womenhood in late Colonial Bengal*, New Delhi, Duke University Press, 2008.

Sarkar Sumit and Sarkar Tanika (eds), *Women and Social Reform in Modern India: A Reader*, Vol: II, Ranikhet Uttarakhand, Permanent Black, 2007.

Shaban Abdul (eds), *Lives of Muslims in India Politics Exclusion and Violence*, New Delhi, Routledge, 2012.

Sharif Abusaleh, *India: Human Development Report: A Profile of Indian States in 1990s*, New Delhi, Oxford University Press, 1999.

Sharma R. N., *History of Education in India*, New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 2003.

Sharma Usha and Sharma B N (ed), *Women Education in Modern India*, New Delhi, Commonwealth Publishers, 1995.

Sheikh M. H. Kidwai, *Women under different Social and Religious Laws*, New Delhi, Light and Life Publishers, 1964.

Shustery A. M. A., *Out Lines of Islamic Culture*, Vol. II, Philosophical and Technologycal Aspects, Bangalore, The Bangalore Press, 1938.

Siddiqi Zakia A., Zuberi Anwar. J., *Muslim Women- Problems and Prospects*, New Delhi, MD Publications Pvt Ltd, 1993.

Siddiqui Firdouse Azmat, *The Struggle for Identity : Muslim Women in the United Provinces*, New Delhi, Foundation Books, 2014 .

Siddiqui M.K.A(ed.), *Muslims in Free India their Profile and Problems*, New Delhi, Institution of Objective Studies, 1998.

Siddiqui M.M., *Women in Islam*, Delhi, 1993.

Singh Alka, *Women in Muslim Personal Law,* New Delhi, Rawat Publications, 1992.

Sinha R.K., *Muslim Law,* Allahabad, Central Law Agency, 1999.

Sinha Raghuveer, *Social Change in India*, New Delhi, 1978.

Sisodia Yatindra Singh(ed), *Functioning of Panchayat Raj System*, Jaipur, Rawat Publication, 2005.

Srinivas M.N., *Some Reflections on Dowry,* New Delhi, Oxford University Press, 1964.

Subbama Mallabi, *Islam and Women*, New Delhi, Sterling Publishers, 1988.

Sunan Ibn Majah, *Kitab-ul-Adab,* vol. 3, H. No. 3670.

Sunan Ibn Majah, *Kitab-ul-Adab,* Vol.3, H.No.3670.

Swarnika Pallavi, *Women Education in the Post Independence Era*, Univers International Journal of Interdisciplinary Research, ISSN(0)-2582-6417, Vol.1, issue 5, Oct.2020, pp.74-79.

Tabassum M. Samiya, *Status of Muslim Women in India: Law Relating to Marriage, Divorce and Maintenance,* New Delhi, Regal Publications, 2013.

Talukdar (Das) Sarmila, *Education and Empowerment of Muslim Women in West Bengal,* University of Kalyani, Dept of Education, 2015.

Thakur R.N, *Plight of the Minorities : Problems and Grievances in their Education,* New Delhi, Gyan Publishing House, 1999.

Tyabji F.B., *Muslim Law: The Personal Law of Muslims in India and Pakistan*, Bombay, N.M. Tripathy Publication, 1968.

Umari M.S. Jalaluddin, *Women and Islam* (translated by Dr. Parvez Mandviwala), New Delhi, Markazi Maktab Islami Publishers, 2017.

Yadav Neelam, *Education for Women*, New Delhi, Reference Press, 2003.

Yang Anand A., *The Agrarian Origins of Crime: A study of Riots in Saran District, India, 1886-1920*, pp.289-306.

Zahid Naghma, *Political Participation of Muslim Women: A case Study of Delhi*, New Delhi, Jamia Millia Islamia University, Dept of Political Science, 2001.

Zia-us-Salam, *Nikah Halala : Sleeping with a Stranger*, New Delhi, Blumsbery, 2020.

Zollingar J.G. and Smock A.C(eds), *Women : Roles and Status in Eight Countries*, New York, Wily Inter Science Publications, 1977.

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী (ইংরেজী)

জার্নালঃ

Ahmed Furkan, *Understanding Talaque*, Journal of ILI, vol. 45, 2012.

Biswas Md Zinarul Hoque, *Socio-Economic Conditions of Muslims of West Bengal : An Enquiry to their Social Exclusion*, Dept of Sociology, Aligarh Muslim University.

Biswas Santu, *Work Participation Rate of Women in West Bengal*, IMPACT: IJRHAL, Vol.6, Issue.8, ISSN(P): 2347 4564, Aug 2018.

Chatterjee Pujasree, *Social and Economic Status of Tribal Women in India - The Challenges and the Road Ahead*, International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies(IJIMS), Vol. 2, No. 2, PP - 55-60, 2014.

Chetna and Rai Avinash, *Analysing the Passivity and Feminist Consciousness of: Colonial Bengal's Muslim Women*, International Research Journal of Social Sciences, Vol. 4(10),P - 47-50, October 2015.

Fauzi Mohammad, *Women's Political Rights in Islamic Law Perapective*, Sawwa, Vol. 10, No.1, October 2014.

Hammed Tariq, *The Muslims of India: Policies and Practices*, Journal of Political Studies, Vol.20, No.2, 2013.

Hasan Farha, *Educational Status of Muslim Women in Birbhum District of West Bengal*, Review of research, Vol.7, Issue.8, 2018.

Hazra Moumita, *An Overview of Educational Status of Muslim Women in India,* International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities, Vol.3, Issue.6, 2018.

Hoque Md. Zaharul, *Muslim Education in Murshidabad District of West Bengal: Problems and Solution*, IJHSS, Vol.II, Issue.VI, May 2016.

Hossain Md Intekhab, *Socio-Economic and Educational Status of Muslim women : A Comparative Outlook*, Journal of Education and Practice, Vol. - 4, No - 10, 2013.

Hossain Saika, *Reading Between the Lines: The Writings of the Bengali Muslim Women in Colonial Bengal*, Prathidhwani- the Echo,Vol.VII, Issue.I, July 2018.

Hussain N. Bhat F. A. and Khurshid F., *Gender Disparity and Policies of Inclusion: A Case Study of women's Education in Jammu and Kashmir,* Research World, Vol.2, No,3, July 2011.

Hussain Nazmul & Kirmani Maryam, *Gender Differeces: A Case Study of Malda District of West Bengal, India*, Pakistan Journal of Women's Studies: Alam-e-Niswan, Vol.17, No.2, ISSN: 1024 1256, 2010.

Hussain. A. O, *Muslim in West Bengal: Trend of Population growth and Education status, Islam and Muslim societies*, A Social Science Journal vol. 5 no. 1.

Islam Md. Safikul & Siddiqui Lubna, *Assessing the Educational Status of Muslim Women in West Bengal: A Case Study of Malda District,* Khoj- A Peer Reviewed International Journal of Geography, Vol.3, 2016.

Jana Pratap Kumar, *Trends of Elementary Education among the Muslim Girls in West Bengal, Islam and Muslim Societies*, A Social Science Journal, Vol.8, No.2, 2015.

Jenkins Laura Dudley, *Competing Inequalities : The Struggle Over Reserved Legislative Seats for Women in India,* International Review of Social History 44, PP - 53-75, 1999.

Jones Justin, *Acting upon Our Religion, Muslim Women's Movements and the Remodeling of Islamic Practice in India,* Modern Asian Studies, 55, PP - 40-74, 2021.

K. Subhalakshmi & Venthan D. Vezha, *A Study on Muslim Women Participation in Politics in India,* International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol.120, No.5, 2018, p.4737-4750.

Kundu Suman Kumar & Chakraborty Ananya, *An Emperical Analysis of Women Empowerment within Muslim Community in Murshidabad District of West Bengal, India,* Research on Humanities and Social Sciences, Vol.2, No.6, 2012.

Md. Mainuddin, *Socio-Economic Conditions and Political Representation of Indian Muslims: A Study of West Bengal*, Journal of Arts, Science & Commerce, Vol.II, 2011.

Molla Kamruzzaman and Bera Sardindu, *Status of Muslim Education in India: Problems and Concerns,* AMIERJ, ISSN- 2278 5655, Jan 2018.

Mukhopadhyay Haimanti, *The Role of Education in the Empowerment of Women in a District of West Bengal, India : Reflection on a Survey of Women,* Journal of International Women Studies, vol. 10(2), PP - 217-225, 2008.

Ramadhan Diastama Anggita, *Affecting Factor for Muslim Women to Achieve their Political Rights in Muslim Majority Country*, Administrative Law & Governance Journal, Vol.3, Issue.4, November 2020.

Saha Styajit, *Educational Status of Muslim Women in West Bengal: A Case Study of Chapra Block in Nadia District*, NSOU-OPEN Journal, Vol.3, No.1, January 2020.

Sarkar Raju, *Recent Status of Education, Employment and Empowerment of Women in West Bengal,* International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. - 7, Issue - 1, January 2017.

Sassen Sskia, *Towards Sociology of Information Technology*, Current Sociology, vol.50, Issue 3, May 2002, from https://doi.org/10.1177.

Sen Shamita, *Towards Feminist Politics? The Indian Women's Movement in Historical Prspective, Policy Research Report on Gender and Development*, Working paper Series, No.9, The World Bank Development Research Group, April 2000.

Siddiqui F. A. and Hussain N., Literacy and Socio-Economic Marginalization of Muslim Population in Malda District, West Bengal, India, Arab World Geographer, Vol.12, No.1-2, 2009, pp.62-75.

Sing Hoshiar, *Constitutional Base for Panchayati Raj in India: The 73rd Amendment Act*, Asian Survey, Vol.34, No.9, Sep 1994, pp.818-827.

Srinivasan N., *Village Government in India, Association for Asian Studies,* The Far Eastern Quarterly, Vol.15, No.2, 1956, pp.201-213.

Swarnika Pallavi, *Women Education in the Post Independence Era*, Univers International Journal of Interdisciplinary Research, ISSN(0)-2582-6417, Vol.1, issue 5, Oct.2020, pp.74-79.

Tabassum Bijapur M., *Muslim Women in Indian Politics,* IJRTI, Vol.8, Issue.3, ISSN: 2456 3315, 2023.

Wester mark F., *The Position of Women in Early Civilization*, The American Journal of Sociology, Vol. X(3), 1904, p.8.

Yunus Dr. Saba & Gupta Dr. Manorama, *Role of Indian Muslim Women in Politics,* Budapest (Hungery), Law, Education, Bussiness and Corporate Social Responsibilities, Sep 2017.

ওয়েবসাইটঃ

En.wikipedia.org/wiki/cast-system-among-south-Asian-Muslim, retrived on 11.10.1023.

http://www.guideone.com/metapage/ frq /mulah10.htm. retrived on 20.06.2023.

https://doi.org/10.1177 retrived on 21.10.2023.

https://maldagov.in retrived on 12.02.2023.

https://www.education.gov.in, Retrived on 18.07.2022,

https://www.millioncontent.com, Retrived on 19.07.2022

https://www.org/en/globalissues/women, Retrived on 16.07.2022

https://www.pria.org, retrived on 12.02.2023.

https://www.wbbme.org Retrived on 15.02.2023.

www.newworldencyclopedia.org

www.science.jrank.org

www.sndt.digitaluniversity.ac.in Retrived on 15.07.2022.